BIBHUTI BHUSHAN AND HIS NOVEL PATHER PANCHALI—A CRITICAL STUDY

ABSTRACT

Thesis Submitted for the Degree of

Doctor of Philosophy

IN

BENGALI

BY

GOUTAM MUKHERJEE
M. A.

Under the Supervision of

DR. T.B. CHAKRABORTY
M. A. Ph. D.

DEPARTMENT OF MODERN INDIAN LANGUAGES
ALIGARH MUSLIM UNIVERSITY
ALIGARH-202002 (INDIA)

2000

Maulana Azad Library
Acc. No. T-5393
Aligarh Muslim University

গবেষণা-পত্রের সংক্ষিপ্তসার

বাংলা কথাসাহিত্যের ইতিহাসে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় এক স্বতন্ত্র রূপলোকের স্রষ্টা । বিশশতকের তৃতীয় দশকে বাংলা সাহিত্যে বিভূতিভূষণের প্রবেশ । যখন জীবন বিভিন্ন সমস্যার ভারে জর্জরিত , উদ্ভ্রান্ত , তখন সকল উত্তেজনা ও উদ্ভ্রান্তির মাঝখানে নির্জন তপোবনে নিভৃতে বসে বিভূতিভূষণ নিজের বীণায় , নিজের সুরে গান গেয়ে উঠলেন ।

বিশ শতকের তৃতীয় দশক । জীবন সমুদ্র যখন বিভিন্ন তরঙ্গের আঘাতে বিক্ষুব্ধ , পাশ্চাত্য সভ্যতার চঞ্চল বাতাসে যখন বাঙালীর মন চঞ্চল হয়ে উঠেছে , পুরানো পৃথিবীর ভাবধারায় যখন পরিবর্তন দেখা দিতে লেগেছে ; বিভূতিভূষণ যখন বাংলা , সাহিত্যে আবির্ভূত হলেন , তখন একদিকে কল্লোল , কালিকলম, প্রগতী গোষ্ঠীর লেখকেরা যুদ্ধোত্তর ভাব ও ভাবনাকে রূপ দিতে সচেষ্ট সেই সঙ্গে দেখা দিয়েছিল মার্ক্সের বৈপ্লবিক সাম্যনীতি ও ফ্রয়েডের যুগান্তকারী যৌনতত্ত্ব , অন্যদিকে রবীন্দ্রনাথ জীবন সায়াহ্নে পৌঁছেও বসন্তের মাধবী মঞ্জরীতে সাহিত্য মালঞ্চকে ভরিয়ে তুলেছেন বিচিত্র সৃষ্টিসম্ভারে । কল্লোল গোষ্ঠীর লেখকেরা

রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে নতুন সাহিত্য ভুবন নির্মাণে ব্যস্ত । সেই সময় বিভূতিভূষণ সমসাময়িকদের সঙ্গে সুর না মিলিয়ে আপন ঈশ্বরদত্ত মৌলিক প্রতিভার পরশমণির পরশে গড়ে তুললেন কথা সাহিত্যের এক অভিনব স্বর্ণসৌধ । 'বিভূতিভূষণ' নিয়ে এলেন এক শান্ত , নির্লিপ্ত নিসর্গ চেতনার নির্জন অবকাশ । শরৎচন্দ্রোত্তর বাংলা কথাসাহিত্যের ধারায় বিভূতিভূষণ অবশ্যই এক মুল্যবান অধ্যায়ের সংযোজক । শরৎচন্দ্রের পর যে তিন বন্দ্যোপাধ্যায় (তারাশঙ্কর , বিভূতিভূষণ ও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়) বাঙালী মানসকে প্রায় শরৎচন্দ্রের মতোই আকর্ষিত করতে পেরেছেন তাঁদের মধ্যে বিভূতিভূষণ অন্যতম । তারাশঙ্করের রচনায় বিশাল মানবতা বোধ , আঞ্চলিকতা , গোষ্ঠীচেতনা -- এক কথায় দেশ জিজ্ঞাসামুখর হয়ে উঠল । মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনায় বিজ্ঞান জিজ্ঞাসা আর বিভূতিভূষণ উন্মুখ হলেন বিশ্ব রহস্য জিজ্ঞাসায় । বিশ্বপ্রকৃতি , বিশ্বপ্রপঞ্চের মায়াজাল উদ্‌ঘাটনে তিনি নিমগ্ন হলেন । প্রকৃতি বিভূতি সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপাদান হলেও একমাত্র উপাদান নয় । প্রকৃতির রূপে যেমন তিনি মুগ্ধ হয়েছেন , তেমনি মানব জীবনের প্রতি অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা ও ভালবাসার দৃষ্টান্ত রেখেছেন । প্রকৃতির অন্তর রহস্যকে তিনি যেমন জানবার চেষ্টা করেছেন , তেমনি তাঁর সাহিত্যে মানব জীবনের বিচিত্র তথা বিবিধ প্রকৃতির

কথাও সোচ্চার হয়ে উঠেছে । বাংলা কথাসাহিত্যের জগতে বিভূতিভূষণ মৌলিক প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন । তাঁর স্টাইল তাঁর নিজস্ব । শব্দ সম্পদ ও রচনা কৌশলও তাঁর নিজস্ব । "প্রত্যহের পৃথিবী , ম্লান বিবর্ণ ধুলিকণা , বাণীহীন মূক গাছপালা , আর ব্যথানম্র নীলাভ্রের সুদূর বিস্তার তাই এই পটভূমিকায় দাড়িয়ে । তার বাইরের জীবনের অযুত বিক্ষোভ , সফেন সমুদ্র আর উচ্চকিত কলরব । বিভূতিভূষণ ধ্যানস্থ , আত্মলীন, বাংলার সবুজ শ্যামরসে তন্দ্রাতুর "। বিভূতিভূষণ আমাদের পরিচিত জগৎ থেকেই কাহিনীর উপাদান সংগ্রহ করেছেন । কিন্তু তাঁর প্রতিভার এমনিই এক মৌলিকত্ব আছে যাতে পরিচিত জগৎ নতুনত্বের ব্যঞ্জনায় উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে ।

' পথের পাঁচালী ' বিভূতিভূষণের প্রথম উপন্যাস । প্রথম উপন্যাসেই তিনি জনপ্রিয়তার তুঙ্গে পৌছে গেছেন । প্রথমলগ্নে এরূপ সিদ্ধি সাহিত্যের ইতিহাসে খুব বেশী চোখে পড়েনা । শুধু জনপ্রিয়তাই নয় , পথের পাঁচালী বিভূতিভূষণের অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপন্যাস । বিভূতিভূষণের পরবর্তী উপন্যাসগুলিতেও এই উপন্যাসের উপাদান বৈশিষ্ট্যের পরিচয় পাওয়া যায় । আমার গবেষণা কর্ম উক্ত গ্রন্থটিকে কেন্দ্র করে । 'পথের পাঁচালী'র আলোচনা ও বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে বিভূতিভূষণের অন্যান্য উল্লেখযোগ্য উপন্যাস যেমন অপরাজিত , আরণ্যক , দৃষ্টিপ্রদীপ প্রভৃতির কিছু

কিছু আলোচনা করা হয়েছে । মূল গবেষণা-পত্রে যেসব বিষয়গুলির আলোচনা করা হয়েছে তার সারমর্ম তুলে ধরছি এখানে :-

প্রকৃতি আমার বিশল্যকরণী

বিভূতিসাহিত্যে প্রকৃতির অসাধারণ ভূমিকা আছে । বস্তুতঃ বিভূতিভূষণের মত প্রকৃতিকে এতখানি গুরুত্ব আর কোন বাংলা কথাসাহিত্যিক দেন নি । বঙ্কিমচন্দ্র প্রকৃতিচেতনার দিক দিয়ে বিভূতিভূষণের পূর্বসূরী (কথাসাহিত্যে) রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতিচেতনা অতুলনীয় । কিন্তু উপন্যাসে তিনি প্রকৃতির তেমন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা দেন নি । শরৎচন্দ্রের উপন্যাসে কোথাও কোথাও নিসর্গ চিত্র ফুটে উঠলেও তিনি প্রধানতঃ সমাজকেন্দ্রিক লেখক । বিশ-শতকের তৃতীয় দশক , যখন জীবন সমুদ্র বিভিন্ন সমস্যায় সফেন তখন সেই বিক্ষুব্ধ মুহূর্তে কর্মকোলাহল থেকে দূরে নির্জন তপোবনে বিভূতিভূষণ প্রকৃতির ধ্যানে মগ্ন হলেন ।

পথের পাঁচালীর প্রকৃতি প্রধানতঃ গ্রাম্য প্রকৃতি । অতিপরিচিত বাংলার 'পাড়াগাঁ'কেও এখানে ' অজানা রাস্তায় নূতন করে ' দেখতে পাই । উপন্যাসটিতে অতি সাধারণ ফল-ফুল, গাছ-পালা নতুনত্বে উদ্ভাসিত ' হঠাৎ আলোর ঝলকানিতে ' মন

মাতায় । সূক্ষ্ম এই গ্রন্থে বিভূতি-প্রকৃতির অন্য দুটি রূপের পরিচয় পাওয়া যায় ---

১. রুদ্র প্রকৃতি ২. শিব প্রকৃতি বা স্নিগ্ধ প্রকৃতি ।

বিভূতিভূষণকে গ্রাম্য প্রকৃতি ও গ্রাম্যজীবন যতখানি আকর্ষিত করেছিল , নগর বা নগরের মানুষ তেমন করে তাঁকে টানেনি । তবে একথাও সত্য যে বিভূতিভূষণের পল্লীজীবন একেবারে নির্মল নিষ্কলুষ নয় । বিভূতিভূষণ প্রকৃতিকে দেখেছেন কখনও শিশুর মুগ্ধদৃষ্টিতে আবার কখনও এক পরিণত বা শিল্পীর প্রগাঢ় প্রজ্ঞা দৃষ্টিতে । মুগ্ধতার পথ বেয়ে তাঁর প্রকৃতি চেতনার বিকাশ আধ্যাত্মিকতার মহত্তর পথে ।

কালের যাত্রার ধ্বনি ,
হেথা নয় হেথা নয় অন্য কোথা অন্য কোনখানে

বিভূতিভূষণের কালচেতনা কোন একটি বিশেষ যুগের নয় । কালচেতনায় তিনি যতটা দার্শনিক , ততটা সমাজমনস্ক নন । 'পথের পাঁচালী'তে কাল 'প্রবাহপ্রতিম' । বিভূতিভূষণ তাঁর সমসময়ের অর্থনৈতিক , রাজনৈতিক অথবা সামাজিক সঙ্কটের চিত্র আঁকেন নি , মহাকালের অনিঃশেষ প্রবাহের প্রেক্ষাপটে মানবজীবনের পথচলার ও ক্রমাভিব্যক্তির পরিচয় দিয়েছেন ।

বিশেষ করে অপু নামে একজন মানুষ শৈশব কৈশোর-যৌবনের পথ হেঁটে কি কি অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করল তারই পরিচয় পাওয়া যায় 'পথের পাঁচালী' 'অপরাজিত' গ্রন্থে ।

সীমার মাঝে অসীম তুমি

'পথের পাঁচালী'তে ভূমি ও ভূমার পরিচয় পাওয়া যায় । একদিকে বৃহৎ বিশ্বের হাতছানি অন্যদিকে সীমার মায়া বা টান । একদিকে দুর্গা সর্বজয়া প্রভৃতির গণ্ডীবদ্ধ জীবনাচরণ , অপরদিকে অপুর মহাবিশ্বের মহাপথের প্রতি টান । খণ্ডের সঙ্গে পূর্ণের , বিশেষের মধ্যে নির্বিশেষের , নিকটের মধ্যে সুদূরের আর্তি অপুর জীবনের পথের পাঁচালী ।

শিশু বিশ্ব : শিশু মন

অপু দুর্গার মধ্যে শিশুমনের স্বাভাবিক বৃত্তিগুলি পূর্ণাকারে প্রকাশ পেয়েছে । শিশুমনস্তত্ত্বের জ্ঞান লেখকের মধ্যে কত গভীর ছিল তারই দৃষ্টান্ত পথের পাঁচালী । অপুর মধ্যে এক স্বপ্নমুগ্ধ বিশ্বরহস্য জিজ্ঞাসু শিশুচিত্তের ও দুর্গার মধ্যে এক সাধারণ চঞ্চল শিশুচিত্তের পরিচয় পাওয়া যাবে ।

সমাজতত্ত্ব : সমাজচেতনা

বিভূতিভূষণ সমাজকে উপেক্ষা করেননি । তিনি সমাজকে দেখেছেন এক ভিন্ন দৃষ্টিতে । বিভূতিমনে তাঁর সমসময়ের সামাজিক সমস্যাগুলি তেমনভাবে রং ধরাতে পারেনি । 'পথের পাঁচালী' উপন্যাসের সমাজ প্রধানত পল্লীসমাজ । এখানে বাংলার পল্লীমানুষের ভাষাহীন বেদনা রূপ পেয়েছে । নির্মম কৌলীন্য প্রথার বিষময় প্রভাবে হিন্দু নারী ইন্দির ঠাকরুণের ব্যর্থ জীবনের করুণ কাহিনী , কুসংস্কারাচ্ছন্ন পল্লী মানুষের সঙ্কীর্ণ মন প্রভৃতির মাধ্যমে বিভূতিভূষণের সমাজচেতনার পরিচয় পাওয়া যেতে পারে ।

স্বদেশপ্রীতি : স্বদেশ চেতনা

বিভূতিভূষণের দেশভক্তি উচ্ছ্বাসহীন । 'পথের পাঁচালী' উপন্যাসে অপুর দেশভক্তি যতটা আন্তরিক ততটাই অনাড়ম্বর । নিশ্চিন্দিপুরের প্রতি আকর্ষণ ও আত্মিকটান তার স্বদেশানুরাগ ধরা পড়েছে ।

মৃত্যু চেতনা

'পথের পাঁচালী' 'অপরাজিত' উপন্যাসে বিভূতিভূষণের যে

মৃত্যুচেতনার পরিচয় পাওয়া যায় তা ভয়ংকর নয় , বরং মৃত্যু মোহন মূর্তিতেই প্রকাশিত । মৃত্যু এখানে করুণরসে ভারাতুর নয় বরং যতি জীবনের প্রসারণের উপাদান ।

মানবপ্রীতি : মানবসঙ্গম

প্রকৃতিই বিভূতি সাহিত্যের একমাত্র উপাদান নয় । প্রকৃতি যদি তাঁর সাহিত্যের বিশল্যকরণী তাহলে সেই বিশল্যকরণীর প্রয়োজন মানুষেরই জন্য । বিভূতি কথাসাহিত্যে প্রকৃতির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে একথা সত্য , কিন্তু মানুষই তাঁর কথাসাহিত্যে প্রাণ । 'পথের পাঁচালী' উপন্যাসের অলঙ্কার প্রকৃতি , আত্মা হল মানুষ । গ্রন্থটির আদ্যন্ত জুড়ে আছে মানব জীবনের সুখ-দুঃখ , আশা-নিরাশা , চাওয়া-পাওয়ার কথা । বিভূতিভূষণের প্রতিটি গ্রন্থের মানবপ্রীতির অমিট স্বাক্ষর আছে । 'আরণ্যক'এ প্রকৃতির অসামান্য ভূমিকা সত্ত্বেও এখানে মানবজীবন মহত্তর গৌরবে গৌরবান্বিত । 'পথের পাঁচালী'র প্রতিটি পৃষ্ঠা মানবপ্রীতির রঙে রঙীন । ভাগ্যবঞ্চিতা আশ্রিতা নারী ইন্দির ঠাকরুণের রক্তরঞ্জিত জীবন কাহিনী , দারিদ্রের কশাঘাতে জর্জরিত সংসারকে কোনরকমে সামলে রাখার জন্য সর্বজয়ার কঠোর

তপস্যা ও প্রচেষ্টা , হরিহরের ঔদাসীন্যের অন্তরালে সন্তানদের জন্য ভালবাসা ও চিন্তাভাবনা এসব বিভূতিভূষণের মানবদরদী মনেরই পরিচয় দেয় ।

মাতৃমন : বাৎসল্য প্রেম

বিভূতিভূষণের অন্তরে এক চিরশিশু ছিল । শিশুর অনাবিল সারল্য , আত্মভোলা ভাব তাঁর চরিত্রের সহজাত ধর্ম । এই শিশুচিত্ত তাঁকে বাৎসল্য প্রেমের পথে অনুপ্রেরিত করেছে । পথের পাচাঁলী উপন্যাসে সর্বজয়া--হরিহরের মধ্যে বাৎসল্য প্রেমের মধুর প্রকাশ ঘটেছে । অপু ও সর্বজয়ার বাৎসল্য প্রেমের মধুর মুহূর্তগুলি সত্যই উপভোগ্য । মাতৃমনের বিবিধ দিকগুলিও এখানে যথাযথরূপে প্রকাশ পেয়েছে । সর্বজয়ার চরিত্রের সকল সঙ্কীর্ণতার উপরে মাতৃমহিমার অম্লান জ্যোতি উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে।

নারীমন : নারীমনস্তত্ত্ব

পথের পাঁচালী উপন্যাসে নারীমনস্তত্ত্বের পরিচয় নরনারীর প্রেমসম্পর্কের প্রাপ্তি ও অপ্রাপ্তিজনীত যে তীব্রতর অন্তর্দ্বন্দ্বের

পরিচয় পাওয়া যায় , বিভূতিভূষণে হয়ত তা নেই । কিন্তু তিনি নারীমনের সাধ ও সাধনার কথা তাঁর সাহিত্যে বলতে ভুলে গেছেন একথা বলা অযৌক্তিক । সর্বজয়া , দুর্গা প্রভৃতি নারীচরিত্রের অন্তর্লোকে যাঁরা প্রবেশ করতে পারবেন তাঁরাই ভালভাবে বুঝতে পারবেন যে বিভূতিভূষণ নারীমনস্তত্ত্ব সম্পর্কে উৎসাহী ও সজাগ ছিলেন ।

ভাষা শিল্পী : বিভূতিভূষণ

বিভূতিভূষণের ভাষার প্রধান গুণ স্বচ্ছতা । তাঁর ভাষা কোথাও কাব্যগুণে সমৃদ্ধ , আবার কোথাও নিরাভরণ । অশিক্ষিতের ভাষাকে তিনি ভদ্রতার মুখোশ পরিয়ে মার্জিত করেন নি ।

ভাইবোন : প্রীতির পাঁচালী

'পথের পাঁচালী' উপন্যাসটি ভাই এর প্রতি বোনের এবং বোনের প্রতি ভাই এর অনুরাগের রঙে রঙীন । দুর্গার প্রতি অপুর এবং অপুর প্রতি দুর্গার অকৃত্রিম গভীর ভালবাসার কথায় গ্রন্থটি

পরিপূর্ণ ·। রবীন্দ্রনাথ ভাই এর উপর দিদির অকৃত্রিম টানের কথা বলেছেন 'দিদি' গল্পে । বিভূতিভূষণ শুধু বোনের টানটাই দেখান নি , বোনের প্রতি ভাই এরও মন কেমনের ভাবের কথা বলেছেন ।

বিভূতিমন দর্শন ও আধ্যাত্মিক চেতনা

বিভূতিভূষণ দার্শনিক বা অধ্যাত্মসাধক না হলেও তাঁর জীবনানুভূতি তাঁকে দার্শনিক ও অধ্যাত্মসাধকের সম্মান দিয়েছে । তিনি প্রকৃতির ধ্যান কল্পনায় তাঁর ঈশ্বরকে খুঁজে পেয়েছেন এবং জীবন সম্পর্কে বিশিষ্ট ধারনার মধ্যে তাঁর দার্শনিক সত্তার প্রকাশ ঘটেছে । 'পথের পাঁচালী'তে অপুর যে দর্শন-চেতনার উন্মেষ 'অপরাজিত'তে তারই পরিণতি । প্রকৃতির ব্যাখ্যার মধ্যে , জীবনানুভূতির ব্যাপকতা তথা বিশিষ্টতার মধ্য দিয়ে অপুর ভেতরকার দার্শনিক মানুষটি প্রকাশ পেয়েছে ।

রোমান্টিকতা বাস্তবতা : দ্বান্দিক দর্শন

'পথের পাঁচালী' উপন্যাসে রোমান্টিক মন ও বাস্তবতার ঝড় ঝাপটায় বিচলিত বাস্তব মন এই দুই এর দ্বন্দ্ব পরম উপভোগ্য হয়ে

উঠেছে । আদর্শবাদ ও বাস্তববাদের কখনও মিলন আবার কখনও বিরোধ গ্রন্থটিতে একাধারে প্রকাশ পেয়েছে । সর্বজয়ার বাস্তবপ্রবণ ব্যক্তিত্ব ও অপুর রোমান্টিক দৃষ্টিভঙ্গির আকর্ষনীয় দিকগুলি ফুটিয়ে তুলেছেন লেখক ।

আশ্রিতার পাঁচালী

মানুষ সম্পর্কে বিভূতিভূষণের আগ্রহ কতখানি ছিল তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত 'পথের পাঁচালী' ও 'অপরাজিত' গ্রন্থের কয়েকটি আশ্রিতা নারীর ব্যথাহত জীবনের প্রতি দৃষ্টিপাতে । এই আশ্রিতার তালিকায় যাঁর নাম সর্বাগ্রে তিনি হলেন ইন্দির ঠাকরুণ । হরিহরের সংসারে ইন্দির ঠাকরুণ গলগ্রহ, অন্ততঃ সর্বজয়ার কাছে । 'অপরাজিত' উপন্যাসে সর্বজয়াও এক আশ্রিতা রমণী রূপেই দেখা দিয়েছে । জীবন সায়াহ্নের সর্বজয়া তার যৌবনের ক্ষাত্রতেজ হারিয়ে অসহায়ভাবে তরুলতার মত অ'বলম্বন চেয়েছে । ইন্দির ঠাকরুণের আশ্রিতার জীবন করুণ রসের উদ্রেক করলেও , তা ট্রাজিক রসে মনকে রিক্ত করে দেয় না , কিন্তু সর্বজয়ার আশ্রিত জীবনের পাঁচালী ট্রাজেডিরই পরিচায়ক ।

পথের পাঁচালী ও লোকসংস্কৃতি

'পথের পাঁচালী' উপন্যাসে লোকায়ত জীবনধারা ও লোক ঐতিহ্যের স্পর্শ পাতায় পাতায় লক্ষ্য করা যায় । এখানে লোকসংস্কৃতির বিভিন্ন উপাদান ছবির ক্যানভাসে ধরা পড়ে । ছড়া , ধাঁধা , ব্রতকথা , রূপকথা , কিংবদন্তী লোক-উৎসব , প্রবাদ-প্রবচন প্রভৃতির অসংখ্য দৃষ্টান্ত ছড়িয়ে আছে গ্রন্থটিতে ।

চিত্রানুসঙ্গ

'পথের পাঁচালী' উপন্যাসে চিত্রের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে । লেখক খণ্ড খণ্ড চিত্রের মাধ্যমে মানবজীবনের আচার ব্যবহার ও চারিত্রক বৈশিষ্ট্যকে আশ্চর্য কুশলতার সঙ্গে ফুটিয়ে তুলেছেন । বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে চিত্রের ভূমিকা থাকলেও বিভূতিভূষণের মত তার এত গুরুত্ব আছে বলে মনে হয় না । বঙ্কিমচন্দ্রের চিত্রগুলি তাঁর উপন্যাসদেহের অলঙ্কার , বিভূতিভূষণের উপন্যাসে ব্যবহৃত চিত্রগুলি চিত্র হয়েও যেন চিত্র নয় ; সেগুলি চিত্রের নির্জীবত্ব কাটিয়ে সজীবত্বে উদ্ভাসিত । বিভূতিভূষণের পথের পাঁচালী উপন্যাসে চিত্রগুলি উপন্যাসের

জীবনের প্রয়োজনে ব্যবহৃত , এগুলি উপন্যাসের আত্মা ।

সখ্যভাব : সখ্যপ্রীতি

বিভূতিভূষণের উপন্যাসে সখ্যরসের ছবি অবশ্যই পাওয়া যায় । পথের পাচাঁলী , অপরাজিত উপন্যাসে সখ্যরসের ধারাটি সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ পেয়েছে । বিভূতিভূষণের প্রেমের দৃষ্টিও সখার দৃষ্টি । লীলা অপুর হৃদয়সংযোগের মূল কারণ সখ্যভাবের অনুকূল না প্রণয় , তা বলা কঠিন । যুবক - যুবতীর মধ্যেই শুধু বিভূতিভূষণের সখ্যরস প্রবাহিত নয় , শিশু-বৃদ্ধের মধ্যেও এর ধারাটি নির্বাধে নিঃসঙ্কোচে দেখা দিয়েছে । নরোত্তম বাবাজী ও অপুর মধ্যে অকুণ্ঠ সখ্যপ্রীতির দৃষ্টান্ত পাওয়া যাবে । বয়সের দুরত্ব তাদের মাঝখানে বাধা হয়ে দাঁড়ায়নি ।

পথের পাঁচালী ও দৃষ্টিপ্রদীপ : তুলনামূলক আলোচনা

ডঃ সুকুমার সেন পথের পাঁচালী ও অপরাজিত এবং পথের পাঁচালী ও দৃষ্টিপ্রদীপের তুলনামুলক আলোচনা করেছেন দৃষ্টিপ্রদীপের ভূমিকায় (বিভূতি রচনাবলী দ্রষ্টব্য) বর্তমান

অধ্যায়টিতে আমি সুকুমার সেনের মন্তব্যটির যুক্তিযুক্ততা আলোচনার প্রেক্ষাপটে তাঁর বিপরীত ধারণাকেই প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছি ।

পথের পাঁচালী উপন্যাসের বিভিন্ন চরিত্রাবলী

অধ্যায়টিতে'পথের পাঁচালী' উপন্যাসের কয়েকটি চরিত্রের (অপু , দুর্গা , হরিহর , সর্বজয়া) আলোচনা করে কিছু নতুন তত্ত্ব প্রতিষ্ঠা করার প্রয়াস করেছি । সর্বজয়ার মধ্যে দেখতে পেয়েছি এক আদর্শ গৃহিনীকে , হরিহরের মধ্যে পেয়েছি সর্বজনীন পিতৃহৃদয় , দুর্গার মধ্যে দেখতে পাই এক চঞ্চলপ্রাণ শিশুচিত্ত , আদর্শবাদ ও বাস্তববাদের যুগল মিলন ও প্রকৃতি প্রীতির অনলঙ্কৃত দিকটির , অপুর মধ্যে শিশুমনের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যগুলির ও পরিণত অপুর দার্শনিকতা , সৌন্দর্যবোধ , পথিকবৃত্তি , বিশ্ববোধ প্রভৃতি দিকগুলিকে তুলে ধরার প্রয়াস করেছি ।

বাংলা কথাসাহিত্যের ইতিহাসে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রধানতম অবদান এই যে তিনি এক সতন্ত্র ধারার স্রষ্টা । শুধুমাত্র প্রকৃতির ক্ষেত্রেই নয় অন্যান্য আঙ্গিকের দিক

দিয়েও তাঁর প্রতিভার মৌলিকতাকে স্বীকার করতেই হয় । বিভূতিভূষণ উচ্চ অনুভূতির অধিকারি ছিলেন না -- এ অভিযোগ অমূলক । জীবন সম্পর্কে বিভূতিভূষণের অনুভূতি গভীর ছিল এবং তাঁর দৃষ্টিভঙ্গিও ছিল তাঁর নিজস্ব । বিভূতিভূষণের পথের পাঁচালী ' কালের কপোলতলে শুভ্র সমুজ্জ্বল ' তাজমহলের মতই চির অমরতার গর্বে গর্বিত " বাংলা উপন্যাসের সবচেয়ে ছোট একটা তালিকা করলেও 'পথের পাঁচালী' কে বাদ দেওয়া অসম্ভব । দশখানার মধ্যে একখানা তো বটেই । পাঁচখানার মধ্যেও একখানা । 'পথের পাঁচালী' এর ভেতরকার আসল মানুষটিকে স্মরণাতীত করবে । দেশ যখন আমাদের অনেকের নাম ভুলে যাবে তখন তাঁর নাম উজ্জ্বল আখরে লিখিত থাকবে অগণিত পাঠকের চিত্তপটে ।" মহাকালের সোনার তরী শুধু বিভূতিভূষণের সৃষ্টিকেই গ্রহণ করেনি , স্রষ্টাকেও গৌরবান্বিত আসন দিয়েছে ।

আধুনিক ভারতীয় ভাষা বিভাগ , **শ্রী গৌতম মুখার্জ্জী**
আলিগড় মুস্লিম বিশ্ববিদ্যালয় ,
আলিগড় ।

BIBHUTI BHUSHAN AND HIS NOVEL PATHER PANCHALI—A CRITICAL STUDY

THESIS

Submitted for the Degree of

Doctor of Philosophy

IN

BENGALI

BY

GOUTAM MUKHERJEE
M. A.

Under the Supervision of

DR. T.B. CHAKRABORTY
M. A. Ph. D.

DEPARTMENT OF MODERN INDIAN LANGUAGES
ALIGARH MUSLIM UNIVERSITY
ALIGARH-202002 (INDIA)

2000

T5393

Department of Modern Indian Languages
(TELUGU, MALAYALAM, TAMIL, BENGALI, MARATHI & PUNJABI)
Aligarh Muslim University, Aligarh –202 002

Ref. No..... /MIL. *Dated* 2.2.2000

CERTIFICATE

This is to certify that the thesis entitled "**BIBHUTI BHUSHAN AND HIS NOVEL PATHER PANCHALI- A CRITICAL STUDY**" submitted for the award of Ph.D. degree in Bengali to the Department of Modern Indian Languages, Aligarh Muslim University, Aligarh has been completed by Mr. Gautam Mukherjee under my supervision.

It is original in nature and I have permitted the candidate to submit it for the award of Ph.D. degree. He fulfills all the rules, regulations and the ordinance of this university.

Forwarded
7-2-2000
CHAIRMAN
Department of
Modern Indian Languages
A.M.U., ALIGARH

DR. T.B. CHAKRABORTY
(Supervisor)

Dated:
Feb. 2, 2000
Modern Indian Languages
Aligarh Muslim University
Aligarh - 202 002, U.P.

বিভূতিভূষণের উপন্যাস

' পথের পাঁচালী ' - বিশ্লেষণ

পর্যবেক্ষণ , তত্ত্ব-তথ্য

ও

তুলনামূলক আলোচনা

শ্রী গৌতম মুখার্জ্জী , এম.এ.

গবেষণা পরিচালক : ড. তিমির বরণ চক্রবর্তী

আলিগড় মুস্লিম বিশ্ববিদ্যালয়ের

পি . এইচ . ডি . ডিগ্রির জন্য উপস্থাপিত

গবেষণা - পত্র

২০০০

: বিষয় সূচী :

	বিষয়	পৃষ্ঠা
(ক)	কথামুখ	১
(খ)	প্রারম্ভিক ভূমিকা	১১
(গ)	আলোচনার প্রেক্ষাপটে	২৫
এক	: প্রকৃতি আমার বিশল্যকরনী	৩২
দুই	: কালের যাত্রা	৬০
তিন	: সীমার মাঝে অসীম তুমি	৭৭
চার	: শিশুবিশ্ব : শিশুমন	৯২
পাঁচ	: সমাজতত্ত্ব : সমাজচেতনা	১০৮
ছয়	: স্বদেশ প্রীতি : স্বদেশ চেতনা	১২০
সাত	: মৃত্যু চেতনা	১২৮
আট	: মানবপ্রীতি : মানব সঙ্গম	১৩৩
নয়	: মাতৃমন : বাৎসল্য প্রেম	১৪৮

দশ	:	নারী মনস্তত্ত্ব	১৫৬
এগারো	:	ভাষা শিল্পী বিভূতিভূষণ	১৬১
বারো	:	ভাই-বোন : প্রীতির পাঁচালী	১৭১
তেরো	:	বিভূতি মন : দর্শণ ও আধ্যাত্মিক চেতনা	১৮১
চোদ্দ	:	রোমান্টিকতা , বাস্তবতা : দ্বান্দ্বিক দর্শন	১৯৪
পনেরো	:	আশ্রিতার পাঁচালী	১৯৭
ষোল	:	পথের পাঁচালী ও লোকসংস্কৃতি	২০৩
সতেরো	:	চিত্রানুষঙ্গ	২১৭
আঠারো	:	সখ্যভাব : সখ্য প্রীতি	২২২
উনিশ	:	পথের পাঁচালী ও দৃষ্টিপ্রদীপ : তুলনামূলক আলোচনা	২২৬
কুড়ি	:	পথের পাঁচালী উপন্যাসের বিভিন্ন চরিত্রাবলী	২৪১

(ঘ) উপসংহার : ২৬২
(ঙ) পরিশিষ্ট : ২৭৬
(চ) সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী : ২৮২
(ছ) সূত্র নির্দেশিকা : ২৮৬

কথামুখ

বিক্রমাদিত্যের রাজসভায় নবরত্নের যে সম্মানীয় আসন ছিল আমার মনের সাহিত্যানুরাগের সভায় বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় তেমনি নবরত্নের মতই এক উজ্জ্বল রত্নরূপে করে আছেন গৌরবান্বিত আসন অধিকার ।

বিশ শতকের তৃতীয় দশকে বাংলা সাহিত্যে বিভূতিভূষণের প্রবেশ । সেই সময় , যখন 'নতুন প্রেসিডেন্টের কাছে' প্রয়োজন ছিল 'কড়া লাইনের, খাড়া লাইনের রচনা'-'তীরের মতো তীক্ষ্ণ', 'বিদ্যুতের রেখার মতো', ন্যুরেলজিয়ার ব্যথার মতো', 'খোঁচাওয়ালা গথিক গীর্জের ছাঁদের' রচনা তখন 'অমিত রায়ের – পাশাপাশি বিভূতিভূষণ'! যেন 'বর্শার পাশে ফুলের মত', 'খোঁচাওয়ালা গথিক গীর্জে' তিনি তুললেন না । কিন্তু 'সেই পুরানো মন্দিরে মণ্ডপেই ফুলে একটা, নতুন সুবাস কোথা থেকে ভেসে এল ।' ' বিভূতিভূষণের ' পথের পাঁচালী ' বাঙালী হৃদয়কে

জ্যোৎস্না - শর্বরীর আলোক - স্নানে সিক্ত করল ।

' পথের পাঁচালী ' ও ' অপরাজিত ' উপন্যাস দুটিকে যদি মানব জীবনের অন্তহীন পথচলার ইতিবৃত্ত রূপে ধরা যায় , তবে বলি যে উক্ত গ্রন্থের ভাবসমুদ্রের তলদেশ পরিক্রমা করে যে মূল্যবান মণি-মাণিক্যের সন্ধান পেয়েছি , তা দুনয়ন ভরে দেখার মত ।

' পথের পাঁচালী ' র পথটা ' অপু ' নামে একটি মানুষেরই পথ নয় , সমস্ত মানব জীবনের সঙ্গে তার সম্পর্ক আছে । ' পথের পাঁচালী ' থেকে এ পথের বিস্তার ' অপরাজিত ' পর্যন্ত এবং সেখান থেকে , আরো , আরো অনেক আগে ।

বহুমানুষের জন্ম-মৃত্যু , হাসি-কান্না , সুখ-দুঃখের নীরব সাক্ষীরূপে আজও দাঁড়িয়ে আছে সে পথ । ' হাজার বছর ধরে পথ হাঁটিতেছি আমি পৃথিবীর পথে ' একথা শুধু অপুর ক্ষেত্রেই নয় সমস্ত মানুষের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য ।

' পথের পাঁচালী ' বহু চর্চিত ও বহু আলোচিত উপন্যাস । সুতরাং নতুন করে কিছু আলোচনা করা সাহস কি দুঃসাহস তা সুধীজন নির্ণয় করবেন । তবে একথা বলা

অন্যায় নয় যে ' পথের পাঁচালী ' বহু আলোচিত হলেও সেসব আলোচনা একটি বিশেষ ধাঁচের , যেমন প্রকৃতি চেতনা , মানব চেতনা ও কিছু কিছু কালচেতনা বিষয়ে । বলা বাহুল্য , এসব আলোচনাও পর্যাপ্ত নয় । যতটুকু নামমাত্র বা সাদামাটা আলোচনা আজ পর্যন্ত হয়েছে , তাও ঠিক গবেষণামূলক নয় । গবেষণামুলক আলোচনা না করলে বিভূতি সাহিত্যের , শুধু বিভূতি সাহিত্যেরই কেন , অন্য যে কোন লেখকের সাহিত্যেরই প্রকৃত মূল্যায়ন করা হয় না ।

" ' পথের পাঁচালী ' ও ' অপরাজিত ' দুইখণ্ড বিভূতিভূষণের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ । এই দুই খন্ডে বিভক্ত বৃহৎ উপন্যাস একটি কল্পনাপ্রবণ অধ্যাত্মদৃষ্টি সম্পন্ন জীবনের ক্রমাভি ব্যক্তির মহাকাব্য নামে অভিহিত হইতে পারে । ইহার মৌলিকতা ও সরস নবীনত্বা বঙ্গসাহিত্যের গতানুগতিকতার মধ্যে এক পরম বিস্ময়াবহ আবির্ভাব ।"

স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ' পথের পাঁচালী ' সম্বন্ধে বলতে গিয়ে বলেছেন

" .... ' পথের পাঁচালী ' র আখ্যানটা অত্যন্ত দেশী । কাছের জিনিষেরও অনেক পরিচয় বাকী থাকে । যেখানে

আজন্মকাল আছি , সেখানেও সব মানুষের সব জায়গায় প্রবেশ ঘটে না । ' পথের পাঁচালী ' যে বাংলা পাড়াগাঁয়ের কথা সেও অজানা রাস্তায় নতুন করে দেখতে হয় । ..... বইখানা দাঁড়িয়ে আছে আপন সত্যের জোরে ।" ' এই সত্যের জোর ' ব্যাপারটি নিয়ে গভীর তথা সংবেদনা—মুলক আলোচনার প্রয়োজন আছে । এই ' সত্যের জোর ' ব্যাপারটিকে তত্ত্বপূর্ণ ভাষায় সুন্দর করে ব্যাখ্যা করেছেন বিভূতি সাহিত্য সমালোচক অধ্যাপক তিমির বরণ চক্রবর্তী । বর্তমান আলোচনার প্রেক্ষাপটে অধ্যাপক চক্রবর্তীর মন্তব্যটি উল্লেখ যোগ্য।তাঁর ভাষায় বলা যায় :

" শিল্পই হোক আর সাহিত্যই হোক সবই হলো শিল্পী বা সাহিত্যিকের মানস চেতনার বিকাশ । শিল্পীর মানস চেতনা রূপায়িত হয় তার শিল্প নৈপুন্যে , আর সাহিত্যিকের মানসচেতনা বিকসিত হয় তার অসাধারন সাহিত্য রূপায়ণে । শিল্পী , কবি , সাহিত্যিক বা আর যেই হোকনা কেন তারা সকলেই মানুষ । মানসিক ভাবধারায় তারা সকলেই অবগাহিত । এই ভাবধারার আবার বিভিন্ন

প্রকাশ । এই প্রকাশ আবার স্থান-কাল-পাত্র-পরিবেশ তথা ধ্যান-জ্ঞান-চিন্তা এবং হৃদয়যুক্ত । আর এই সব কিছু নিয়েই যে সম্পূর্ণ প্রকাশ , তাকেই এক কথায় সামগ্রিক প্রকাশ বলা যেতে পারে । এই প্রকাশ যখন অংশ বিশেষের তখন তা হয় আংশিক ; যখন হয় সমগ্র বিষয়ের , তখন তা হয়ে উঠে সামগ্রিক । অংশকে বাদ দিয়ে সমগ্র নয় , আবার সমগ্রকে জানতে হলে অংশের খোঁজ করতেই হয় । একে অপরের পরিপূরক ।" তিনি আরো বলেছেন , - " সৃজন ক্ষমতার খণ্ড খণ্ড প্রকাশেও সৃষ্টির আনন্দ থাকে আবার যেখানে , সৃষ্টির পূর্ণ প্রকাশ সেখানেও এই আনন্দ পূর্ণানন্দ হয়ে ওঠে । স্রষ্টার মানস চেতনাই যে কোন সৃষ্টির মূল বীজস্বরূপ । সৃষ্টির মূলস্বরূপ এই বীজকেই স্রষ্টা তার মানস চেতনা দিয়ে সচেতন করে তোলে ; আর এই সচেতনতাই বাণীর রূপে ' সৃষ্টি ' হয়ে ফুটে ওঠে । এই সৃষ্টি যতখানি প্রকৃষ্ট , স্রষ্টার সৃজন ক্ষমতাও ঠিক ততখানি উৎকৃষ্ট ।"

খুব সত্যকথা । বিভূতি-মানস চেতনার এই ' উৎকৃষ্ট ' ফসল ' পথের পাঁচালী ' দাঁড়িয়ে আছে সত্য-সুন্দরের বাণীর ' জোরে '। আর তাই জোর দিয়েই বলা যায় যে ,

বিভূতিভূষণের ' মননশীলতার সবচেয়ে সার্থক ও সুন্দর রূপটি ফুটে উঠেছে ' 'পথের পাঁচালী ' তে ।

আমার গবেষণা কর্মের পথ পরিক্রমা অথবা বিস্তারিত আলোচনাও তাই উক্ত গ্রন্থখানিকে কেন্দ্র করে । কেননা , সাহিত্য-স্রষ্টা বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ' সাহিত্য - প্রতিভার ' পরিপূর্ণ বিকাশের কেন্দ্রবিন্দু যে ' পথের পাঁচালী ' সে বিষয়ে হয়তো কোন সন্দেহ নেই । কথা সাহিত্যিক বিভূতিভূষণের বিরাট ' প্রতিভার অনেকটাই ' এই গ্রন্থে ধরা পড়েছে । " তাঁর সৃজনক্ষমতার বহুমুখী ধারা তথা মনন-শীলতার সার্থক ও সুন্দর রূপটি যে এই গ্রন্থে ফুটে উঠেছে " , তা বোধ হয় ' জোর দিয়েই বলা যায় '। এই মন্তব্যের প্রেক্ষাপটে তাই ' পথের পাঁচালী ' র সার্বিক শ্রেষ্ঠত্বকে প্রমাণ করবার চেষ্টা করেছি । স্বাভাবিক কারণেই আলোচ্য উপন্যাসের চুল-চেরা বিশ্লেষণ করে , তত্ত্ব-তথ্যের বিচার ধারায় পরিস্ফুট করে এবং যুক্তি-তর্ক -- সমাধানের মাধ্যমে আমার পূর্বোক্ত মন্তব্যের স্বপক্ষে সিদ্ধান্তে পৌঁছনোর চেষ্টা করেছি । প্রাসঙ্গিক আলোচনার প্রেক্ষাপটে বিভূতিভূষণের অন্যান্য উল্লেখযোগ্য উপন্যাস , যথা

' অপরাজিত ' ' দৃষ্টিপ্রদীপ ' ' আরণ্যক ' প্রভৃতি উপন্যাসের সঙ্গে ' পথের পাঁচালী ' র তুলনামূলক আলোচনা করে ' পথের পাঁচালী ' র সার্বিক শ্রেষ্ঠত্বের মূল্যায়ণ করার চেষ্টা করেছি । ' তর্পনে ' র বিষয়বস্তু যদি হয় ' পথের পাঁচালী ' , তাহলে সেই ' তর্পন ' এর বিভিন্ন সামগ্রী , যথা , গঙ্গাজল , যব , তিল , ফুল ইত্যাদি হলো বিভূতিভূষণের অন্যান্য উল্লেখযোগ্য রচনাবলী । বলা বাহুল্য , তর্পন ক্রিয়ার সমাধানে বাদ পড়েনি কেউ । ' পথের পাঁচালী ' কে আলোকিত করতে গিয়ে , অন্ধকারে রাখিনি বিভূতি সাহিত্যের অন্যান্য রচনাবলীর মহামূল্যবান দিকগুলিকে । বিভূতিভূষণ , তাঁর রচনা বৈশিষ্ট্য এবং বিশেষ করে ' পথের পাঁচালী ' কে নিয়ে এরূপ গবেষণাপূর্ণ আলোচনা এর আগে হয়েছে বলে মনে হয় না । এ ব্যাপারে তাই আমার বর্তমান গবেষণা-কর্ম নতুনত্ব তথা মৌলিকতার দাবি রাখতে পারে বলেই আমার বিশ্বাস ।

গবেষণা কর্মে উৎসাহ , প্রেরণা ও সাহায্য পেয়েছি অনেকেরই । তাদের মধ্যে স্মরণীকায় যাঁরা প্রত্যুষলগ্নের দাবিদার , তাঁদের মধ্যে প্রথমেই স্মরণীয় আমার বর্তমান

গবেষণা কর্মের নির্দেশক এবং পরিচালক আলিগড় মুস্লিম বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক প্রধান , ড. তিমির বরণ চক্রবর্তীর নাম , যাঁর প্রেরণা ও উপদেশ , স্নেহে ও সাহায্যে আমার গবেষণা কর্ম সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়েছে । তাঁকে নিয়ে যত বলা হোক না কেন কমই বলা হবে । প্রসঙ্গক্রমে আর একটি নাম উল্লেখযোগ্য , তিনি হলেন কাকিমা মায়া চক্রবর্তী , যিনি দিয়েছেন অপত্য স্নেহ , ভালবাসা এবং গবেষণা কর্মের প্রেরণা ।

যাঁরা আমার গবেষণা কর্মের মূল প্রেরক , যাঁরা দীপ ও ধূপের মত দানে ও দাক্ষিন্যে ভরে দিয়েছে তাঁরা হলেন আমার বাবা ও মা । মা-বাবার ঋণ অপরিশোধ্য সুতরাং কৃতজ্ঞতার ঋণ পরিশোধের ধৃষ্টতা রাখার কথাই আসেনা , শুধু বলি তাঁদের প্রেরনা অকূল সমুদ্রে ধ্রুবতারার মত দিক নির্দেশিকা ।

আমার আপনজন , যাদের উৎসাহ ও উদ্দীপনায় আমি গবেষণা কর্মের সাফল্যের পথে অগ্রসর হয়েছি , তারা হলো , দাদা-বৌদিরা , দিদি-জামাইবাবু , ছোটভাইরা , ভাগ্নী-ভাইপোরা , পিসেমশায়-পিসীমারা । এছাড়াও আমার

এই গবেষণা কর্মে বিভিন্ন বিষয়ে বিভিন্ন ভাবে যাঁরা সাহায্যের হাত বাড়িয়েছেন তাঁরা হলেন ' বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ ' , কলকাতা এর অরুণা চট্টোপাধ্যায় ও অরুণ বসু , কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ' কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক শ্রী অশোক বসু ' , উত্তরপাড়া ' জয়কৃষ্ণ গ্রন্থাগারের ' গ্রন্থগারিকা ও অন্যান্য সদস্যগণ , জাতীয় গ্রন্থাগারের কর্মীবৃন্দ । ধানবাদের লিণ্ডসে ক্লাব থেকেও প্রভূত সাহায্য পেয়েছি । এছাড়া ঘাটশীলা কলেজের বাংলাভাষা ও সাহিত্যের বিভাগীয় প্রধান , অধ্যাপক সুবোধ সিং সর্দ্দার , আমার নিকট আত্মীয় দেবুকাকা ও মনু পিশে । এদের অবদান অবশ্যই স্বীকার্য । প্রসঙ্গক্রমে শৌভিক ভাদুড়ী , কম্পুপ্রিন্ট , হীরাপুর , ধানবাদ , এরও নাম উল্লেখ করতে হয় । তাঁর অক্লান্ত কর্মপ্রচেষ্টায় বর্তমান গবেষণা-কর্মের মুদ্রণ কর্ম যে সার্বিক সুন্দর হয়েছে সেকথা উল্লেখ করতেই হয় । গবেষণা কর্মের জন্য যে সব স্থানের সর্বেক্ষণ করতে হয়েছে তার মধ্যে কলকাতা বিভিন্ন গ্রন্থাগার ও বিভূতিভূষণের প্রিয়স্থান ঘাটশিলা । ঘাটশিলার ফুলডুংরী পাহাড় , বিভূতিভূষণের বাসস্থান " গৌরীকুঞ্জ " যেখানে

তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছিলেন । এই গৌরীকুঞ্জের সামনে তাঁর স্মৃতি সৌধ-সংরক্ষিত আছে । এই স্মৃতিসৌধ তাঁর স্ত্রী , রমা বন্দ্যোপাধ্যায় (কল্যানীদেবী) স্বামীর প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালবাসার অমর অভিজ্ঞান রেখেছেন । ' অপুর পথ ' যেখান দিয়ে গৌরীকুঞ্জে যাওয়া যায় , ' বিভূতি সংস্কৃতি ভবন ' প্রভৃতি বিভূতি স্মৃতি বিজড়িত অন্যান্য দর্শনীয় স্থান ।

আধুনিক ভারতীয় ভাষা বিভাগ ,
আলিগড় মুস্লিম বিশ্ববিদ্যালয় ,
আলিগড় ।

শ্রী গৌতম মুখার্জ্জী

জানুয়ারি, ২০০৩

প্রারম্ভিক ভূমিকা

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় এক স্মরনীয় নাম । নিঃসন্দেহে বলতে পারা যায় যে শরৎচন্দ্রোত্তর বাংলা কথা-সাহিত্যধারায় তিনি এক মূল্যবান অধ্যায়ের সংযোজক । সাহিত্যের আঙিনায় বিভূতিভূষণের আবির্ভাব অনেকটা ধূমকেতুর মতই আকস্মিক এবং জাদুকরের মতই চমৎকার । ধূমকেতুর মত এই জন্য যে , সাহিত্যাসরে তাঁর প্রবেশের কোন পূর্ব সূচনা অথবা পূর্ব সাধনা ছিল না । আবার জাদুকরের মত এই জন্য যে , মঞ্চে প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গেই তিনি পাঠকের মন জয় করে নিয়েছেন এবং পাঠক হৃদয়ে চিরকালের জন্য নিজের নাম মুদ্রিত করে রেখেছেন ।

সাহিত্য সভায় বিভূতিভূষণের প্রবেশ বিশ শতকের তৃতীয় দশকে । বিভিন্ন প্রতিকূলতা এবং অনুকূলতার বাতাসে সাহিত্য ও সমাজ জীবন তখন উত্তেজিত । সে সময়টা ছিল ভাঙ্গনের কাল , রূপান্তরের কাল । সে রূপান্তর পুরানো ঐতিহ্য , বিশ্বাস ও মনন থেকে নব অনুভূতির

জগতে । " বিশ শতকের দ্বিতীয় দশকে একদিকে দেশব্যাপি গভীর হতাশা অপর দিকে নৈতিক ও সমাজ জীবনের মূল্যহীনতা তৎকালীন বাঙালিকে অনিবার্যরকমে বাস্তববাদী করে তোলে । সেই সঙ্গে ফ্রয়েড , হাভলক্ , এলিস , ক্রাফ্ট্ , এবিং প্রভৃতি যৌনমনস্তাত্তিকদের চিন্তাভাবনায় ভাবিত তরুন সম্প্রদায়ের উত্তেজনা ও বিদ্রোহতাকেই আরও উগ্র , অস্থির ও অনমনীয় করে তুলল। যুদ্ধোত্তর বাঙলা সাহিত্য যাকে আমরা আধুনিক সাহিত্য বলি , তার এই বিরাট ভূখণ্ড জুড়ে তখন এক তীব্র , সৎ অবিশ্বাসের মনোভাব — এক কথায় যাকে বলা যায় সব কিছুর ওপরেই সংশয় , অনাস্থা "।[১]

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর মানুষের ভাবজীবন ও বর্হিজীবনের এতদিনকার প্রশান্তির প্রাসাদে প্রবল বিক্ষোভ দেখা দিল । শিল্পবিপ্লবের ফলে ঘটল যন্ত্রের প্রসার আর তারই ফলে পল্লী আশ্রয়ী বাঙালি জীবিকার প্রয়োজনে শহরের পথে পা বাড়াল । যুদ্ধ , দুর্ভিক্ষ , অর্থনৈতিক-মন্দা প্রভৃতি ঘটনাগুলি বিশ্বের হৃদস্পন্দন বাড়িয়ে দিল । সাগরপারের চঞ্চল বাতাস তখন মধ্যবিত্ত বাঙালির অলস মনকে চঞ্চল করে তুলছে । নতুন আলোয় নতুন করে

যাচাই করার তাগিদ দেখা দিল আমাদের পুরানো ধর্মবিশ্বাস , সংস্কার ও নীতিবোধের । এই জীবন, জিজ্ঞাসা যখন প্রকাশের জন্য উন্মুখ , তখন তাকে রূপ দিতে এগিয়ে এলেন ' কল্লোল ' , ' কালিকলম ' , ' প্রগতি ' , গোষ্ঠীর লেখকরা । নতুন যুগ সৃষ্টির তাগিদে তাঁরা সনাতন ঐতিহ্যের প্রতিমূর্তি রবীন্দ্রনাথকেও সরাসরি আক্রমন করতে লাগলেন । সেই সঙ্গে দেখা দিল মার্কসীয় সাম্যনীতি ও ফ্রয়েডীয় যৌনমনস্তত্ত্ব । সে যুগটা ছিল সংশয় , অনাস্থা ও অস্থিরতার যুগ । এই সংশয় — মুহূর্তে বিভূতিভূষণ এলেন স্বস্তির নিঃশ্বাস নিয়ে ।

' পথের পাঁচালী ' র আবির্ভাব লগ্নটির পরিচয় দিতে গিয়ে শ্রদ্ধেয় সমালোচক গোপাল হালদার যে কথা বলেছেন , তা বিভূতিভূষণের আবির্ভাব লগ্নেরও পরিচায়ক । বিভূতি-আবির্ভাবের প্রসঙ্গে গোপাল হালদারের নিম্নলিখিত মন্তব্য উদ্ধৃত করা সমীচীন বিবেচনা করি :

" ' গল্পগুচ্ছে ' র যুগ ছাড়িয়ে যখন রবীন্দ্রনাথ ' সবুজ পত্রে ' র যুগ পেরিয়ে যাচ্ছেন, ' রামের সুমতি ' ' বিন্দুর ছেলে ' র ভূমিকা শেষ করে শরৎচন্দ্র যখন তাঁর ' পল্লী সমাজের ' যুগের মধ্যপথে , তখন প্রথম মহাযুদ্ধের পরবর্তী

নিরাবরনাতাকে স্বাগত করে বাঙলা সাহিত্যে উপস্থিত হলেন , প্রথমে শৈলজানন্দ পরে ' কল্লোল ' , ' কালিকলমের ' লেখকেরা । বাস্তববাদ মানে অবশ্য নিরাবরনতাবাদ নয় । কিন্তু বাঙালী লেখকের চোখে শরৎচন্দ্র , শৈলজানন্দের দৃষ্টি অনুসরণ করে ফিরল বাস্তবের দিকেই ।

রোমান্স এ এসেছিল তাদের অশ্রদ্ধা , তাই রবীন্দ্রনাথের প্রতিও তারা সেদিন বিমুখ ।অবশ্য তার অর্থ রোমান্সের প্রতি বিমুখতা নয়;— একটা বর্ণচোরা রোমান্স পিপাসাই ছিল তারও মূল। কিন্তু চোখ অন্যদিকে ফিরলেও তাঁদের দৃষ্টি স্বচ্ছ হয়নি । তাঁরা বাস্তবকে দেখেছিলেন পাশ্চাত্য সাহিত্যের ধার করা ধারালো দৃষ্টিতে । তাই সেই পুঁথিপড়া বাস্তবকে তাঁরা পাশ্চাত্য ধারায় খুঁজছিলেন এবং বাঙলা দেশের শহরে , বস্তিতে , খনির অপরিচিত অস্পষ্টতায় ; কদাচিৎ অস্পষ্ট পল্লীসমাজে । যে বাঙলার শতকরা ৯০ ভাগ জীবন পল্লী কেন্দ্রিক সেখানে এ প্রয়াসও নিশ্চয়ই শতকরা ততো ভাগই ছিল মূল্যহীন । কিন্তু মূল্যহীন নয় , তাদের আরও উদ্ভট ভাবনা ও অবাস্তব চরিত্র পরিকল্পনায় । বাংলা কথা সাহিত্যের মোড় বাস্তবের দিকে ঘুরতে না

ঘুরতেই অবাস্তবের চোরাবালিতে আটকে গেল । তার কারণ এই যে , ইংরেজ আমলের বাঙালি মধ্যবিত্তের জীবন যাত্রার মূলেই ছিল না মাটি"। [২]

এই খণ্ড বিশ্বাস ও নিরাশ চেতনার পট ভূমিকায় বিশ্বাস ও আশার আলোর প্রদীপ হাতে উপস্থিত হলেন বিভূতিভূষণ । বিভিন্ন দ্বন্দ্ব সমস্যা ও সংশয় জিজ্ঞাসায় মানুষের মন যখন উদ্ভ্রান্ত তখন স্বপ্নমুগ্ধ বিভূতিভূষণ কর্ম কোলাহল থেকে দূরে শান্ত নির্জন পরিবেশে সাহিত্য সাধনায় নিমগ্ন হলেন । তৎকালীন আলোড়ন মুখর , সমস্যা-সঙ্কুল ঘটনাগুলি বিভূতি মনে তেমন ভাবে নাড়া দেয়নি । আসলে তিনি ছিলেন শান্তরসের সাধক। শান্ত শুচিস্মিত জীবনের অনুসন্ধানেই তিনি আজীবন নিমগ্ন ছিলেন । *

সমস্যা-সঙ্কুল নগর জীবন নয় , ' ছায়া সুনিবিড় শান্তির নীড় ছোট ছোট গ্রামগুলি ' ও মর্মর মুখরিত

---

* বিভূতিভূষণের সাহিত্যে জীবনের তীব্র আলোড়নের দিকটা ততটা প্রকাশ পায়নি। প্রেম-চেতনাতে বিভূতিভূষণ তীব্রতার পরিচয় দেন নি । তাঁর প্রেমে প্রখরতা নেই , পঞ্চম রাগের ঝংকার নেই , শুচিতা বোধ আছে , স্নিগ্ধতা আছে ।

অরণ্য-প্রকৃতিই তাঁর শ্রেষ্ঠ উপন্যাসের ভিত্তিভূমি । তাঁর সাধনাস্থল কল্লোলের কোলাহল মুখর লোকালয় নয় , শান্ত স্নিগ্ধ তপোবন । সেখানে প্রকৃতি দেবীর সঙ্গে সাধকের গোপন আলাপন চলে , যেখানে মানুষ ও প্রকৃতি এক হয়ে যায় নিবিড় আত্মীয়তার বন্ধনে । এই তপোবনের সাধনাই সাধককে এনে দিল সিদ্ধি , কণ্ঠে পরাল বিজয় মাল্য । বিষয় বৈচিত্র্যে , প্রকরনের স্বাতন্ত্র্যে , প্রকৃতির সঙ্গে মানব মনের সম্পর্ক আবিষ্কারে তিনি সৃষ্টি করলেন এক নিজস্ব বিশ্ব , — যে বিশ্ব আপন গাম্ভীর্যে , নিজের মহিমার দীপ্তিতে উজ্জ্বল ও স্বতন্ত্র ।

প্রাক্ বিভূতি পর্বের বাংলা কথা সাহিত্যের জগতে তিন প্রিয় ও প্রদীপ্ত প্রতিভা সম্পন্ন কথাসাহিত্যিক , যথাক্রমে বঙ্কিমচন্দ্র , রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্র । এই তিন স্মরনীয় তথা শক্তিশালী কথা-সাহিত্যিকদের অবদানে বাংলা সাহিত্য ভাণ্ডার নানাভাবে সমৃদ্ধ হয়েছে । বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিভা পরশে বাংলা উপন্যাস যৌবনশক্তি লাভ করল । তিনি উপন্যাসভারতীর প্রত্যাশিত আকাঙক্ষা পূর্ণ করলেন । ইতিহাস , রোমান্স , স্বদেশ প্রেম ও গার্হস্থ্য জীবনের পট ভূমিকায় তিনি তাঁর কথা সাহিত্যের জগৎ নির্মাণ করলেন ।

বঙ্কিমচন্দ্র বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক ঔপন্যাসিক এবং সামাজিক উপন্যাসের স্রষ্টা । বঙ্কিমচন্দ্রের পূর্বে বাংলা উপন্যাসের সূচনা হয়েছিল কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রই বাংলা সাহিত্যের প্রথম সার্থক ঔপন্যাসিক ও অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিল্পী ।

রমেশ চন্দ্র দত্ত ইতিহাসের পটভূমিকায় উপন্যাস রচনা করলেন , তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায় রোমান্সের রঙিন চশমা খুলে দিয়ে সাদা চোখে জীবনের দিকে দৃষ্টিপাত করলেন ।

রবীন্দ্রনাথ প্রথমদিকে বঙ্কিমচন্দ্রকে অনুসরণ করলেও পরে নিজস্ব পথ খুঁজে পেলেন। যুগান্তর আনলেন তিনি বাংলা উপন্যাসে। ইতিহাসের পথ বেয়ে ঔপন্যাসিক রবীন্দ্রনাথের মুক্তি ঘটল জটিল মনোবিশ্লেষণের জগতে । *

ঘটনা বহুলতার দিক থেকে দৃষ্টি সরিয়ে নিয়ে তিনি গোপন মনোরাজ্যের পরিচয় দিতেই ব্যস্ত , ঘটনার ভীড়ে

---

* রবীন্দ্রনাথ বাংলা কথা সাহিত্যে সর্ব্বপ্রথম আনুবীক্ষনিক দৃষ্টিতে মনোরাজ্যের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিষয়ের বর্ণনা করেছেন । তাঁর "চোখের বালি " প্রথম পূর্ণ আকারে প্রকাশিত মণ স্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ মূলক উপন্যাস ।

ঔপন্যাসিক রবীন্দ্রনাথ হারিয়ে যান নি , বঙ্কিমচন্দ্রের মত ঘটনার পক্ষীরাজে আরোহন করে রবীন্দ্র নায়ক নায়িকারা ভ্রমন করে না , তারা উপন্যাস মঞ্চে উপস্থিত হয়ে তাদের ' আঁতের কথাই ' শুনিয়ে যায় । রবীন্দ্র-উপন্যাস রবীন্দ্র মনোভূমির ফসল হলেও মর্ত মৃত্তিকার সঙ্গে তার সহজ যোগ আছে ।

প্রভাত মুখোপাধ্যায় পল্লীজীবনের সহজ ঘরোয়া কাহিনীর রূপকার । তত্ত্ব অপেক্ষা রসই তাঁর অধিক কাম্য ।

রবীন্দ্র প্রতিভার ' বিচিত্র ঐশ্বর্য্য ' এবং প্রভাতকুমারের ' প্রসন্ন মাধুর্যের ' মাঝখানে শরৎচন্দ্র উপস্থিত হলেন শরৎচন্দ্রিকার দীপ্তি নিয়ে । বাংলা সাহিত্যের আঙিনায় শরৎচন্দ্রের আবির্ভাব ধূমকেতুর মত আকস্মিক হলেও , স্থায়িত্বে ও জনপ্রিয়তায় তিনি এখনো বাংলা কথা সাহিত্যাকাশের অচঞ্চল ধ্রুবতারা । দরদী কথাশিল্পী নারী জীবনের অরন্তুদ আর্তনাদকেই পাঠক সমাজে প্রচার করলেন । যে সব ভাগ্য বঞ্চিতা নারী পুরুষ শাসিত সমাজের এককোনে বসে নীরবে চোখের জল ফেলে চলেছে , সেই সব অবলারাই ' শরৎ সাহিত্যে ' মুখ খোলার , ব্যথা জানাবার সুযোগ পেয়েছে । মানব জীবনের

অশ্রু বেদনার রূপকার শরৎচন্দ্র ' সাধারণ মেয়ের ' পক্ষই অবলম্বন করেছেন ।

বঙ্কিমচন্দ্র , রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের মধ্যে *idealism* এর ত্রিমূর্তি লক্ষ্য করা যায়। বঙ্কিম চন্দ্রের মধ্যে যে কবি কল্পনার পরিচয় পাওয়া যায় , তা বাস্তব লোকের পাশ কেটে রসের সন্ধানে তৎপর , রবীন্দ্রনাথের মধ্যে বাস্তবতা যেন কবি কল্পনার রঙে রঙিন ও ঐশ্বর্যমণ্ডিত , শরৎচন্দ্রের মধ্যে বাস্তবতা আরও জটিল হয়ে দেখা দিয়েছে । গভীর অনুভূতির প্রাবল্যে তিনি অনেক ঘটনাকে অতিরঞ্জিত করে ফেলেছেন ।

শরৎচন্দ্রের পর যে তিনজন কথা শিল্পী যথার্থ মৌলিকতার পরিচয় দিয়েছেন এবং যাঁরা বাঙালি মানসকে শরৎচন্দ্রের মতই আকর্ষণ করেছেন তাঁরা হলেন — বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় , তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় । শরৎচন্দ্রোত্তর বাংলা কথা সাহিত্যের ক্রমবিকাশ ও ক্রমমানের ক্ষেত্রে এই ত্রয়ী বন্দ্যোপাধ্যায় বিশেষ ভাবে স্মরণীয় । উক্তপ্রসঙ্গে শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক ড. অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের মন্তব্যটি স্মরণ করা যেতে পারে।" অচিন্ত্য কুমারের বিচিত্র বিষয়বস্তু , অন্নদাশঙ্করের

মননপ্রধান তত্ত্বকথা, বুদ্ধদেবের কাব্যধর্মী রোমান্টিক কাহিনী , শৈলজানন্দের বাস্তব মানুষের জীবনচিত্র , জগদীশ গুপ্তের কঠোর বাস্তবতার নির্মম আধিপত্য , প্রেমেন্দ্র মিত্রের মধ্যবিত্ত ও নিম্ন মধ্যবিত্ত সমাজের দুঃখদুর্ভর ও নৈরাশ্য ব্যঞ্জক দিনলিপি — বাংলা উপন্যাসের গঠনে এর মূল্যও বিশেষভাবে স্মরণীয় । কিন্তু সমগ্র বাঙালী-মানসকে যাঁরা শরৎচন্দ্রের মতোই নাড়া দিয়েছেন তাঁরা হলেন বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ও মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় "।[৩] এই ত্রয়ী বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতিভাকর্ষনে বাংলা কথা সাহিত্যের ক্ষেত্রে সোনার ফসল ফলেছে । তারাশঙ্করের রচনায় বিশাল মানবতা বোধ , সমসাময়িক দেশকাল জীবন্ত হয়ে উঠল । সেই সঙ্গে প্রকাশিত হল অস্তায়মান অভিজাত সভ্যতার শেষ রক্তরাগ ও বণিক সভ্যতার স্ফীত অহংকার । তারাশঙ্করের অভিজ্ঞতা যেমন বিশাল ছিল তেমনি বৃহত্তর তাঁর উপন্যাসের পটভূমি । বীরভূমের প্রকৃতি সমস্ত ঐশ্বর্য্য , বিস্তার ও বৈচিত্র্য নিয়ে তাঁর কথা সাহিত্যে ফুটে উঠল । তারাশঙ্করের আঞ্চলিক উপন্যাস আঞ্চলিকতার গণ্ডিকে ছাড়িয়ে বিশ্বজনীন হয়ে উঠেছে ।

সমাজতন্ত্রবাদী মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাসে বামমার্গীয় চিন্তাধারায় স্বচ্ছ সাবলীল রূপ ফুটে উঠল । ফ্রয়েডীয় মনোবিকলন তত্ত্বকে তিনি সাহিত্যে রূপ দিলেন। একদিকে তিনি পদ্মাতীরবর্তী সাধারন মানুষের বাস্তবনিষ্ঠ জীবন কাহিনী শুনিয়েছেন অন্যদিকে " মানুষের কাম পিপাসার এক জীবন্তমূর্তি এঁকে তিনি আদিম পৃথিবীর অন্ধকারে ফিরে গেছেন "।[৪] কিন্তু বিভূতিভূষণ আমাদের এক অন্য জগতের স্বাদ দিলেন। " পরিচিত বিবর্ণ দেশকালের অন্তরে অপূর্ব কল্পলোকের রসবস্তু লুকিয়ে আছে , কঠোর বাস্তবের মধ্যেই একটি রূপলোকের স্বপ্ন মাধুরী নিহিত রয়েছে "।[৫] বিভূতিভূষণ সেই রূপলোককেই রূপায়িত করলেন । তিনি সত্যই এক আশ্চর্য্য রূপজগতের অধিবাসী । " রবীন্দ্রনাথের বিশ্বাকাশ সঞ্চারী আলোক প্লাবন এবং শরৎচন্দ্রের শ্যামা মৃত্তিকার অশ্রু মুখর ঝিল্লিধ্বনি "।[৬] এর বাইরের জগৎটাকে তিনি তুলে ধরলেন আমাদের চোখের সামনে। হৃদয়ের অতলান্ত রহস্যের অনুসন্ধান না করে , প্রকৃতির সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হয়ে তিনি তাঁর মধ্যস্থিত কবিমনের সাধ মেটালেন । " প্রত্যহের পৃথিবী , ম্লান বিবর্ণ ধূলিকণা , বাণীহীন মূক গাছপালা , আর ব্যথানম্র নীলাভ্রের

সুদূর বিস্তার এই পটভূমিকায় কটি মানুষ দাঁড়িয়ে আছে । তার বাইরের জীবনের অযুত বিক্ষোভ , সফেন সমুদ্র আর উচ্চকিত কলরব । বিভূতিভূষণ ধ্যানস্থ , আত্মলীন বাংলার সবুজ শ্যামরসে তন্দ্রাতুর "।[৭] সমসাময়িক দুই বন্দ্যোপাধ্যায়ের তুলনায় বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বৈশিষ্ট্য কোথায় ? বিভূতিভূষণ আমাদের পরিচিত জগৎ থেকেই তাঁর কাহিনীর উপাদান সংগ্রহ করেছেন । কিন্তু পরিচয়ের মধ্যে একটা অপরিচয়ের রহস্য রোমাঞ্চকর পরিবেশ সৃষ্টি করেছেন , যাতে আমাদের পুরাতন জগৎটা নতুনত্বের ব্যঞ্জনায় উদ্ভাসিত হয়ে উঠল ।— এখানেই তাঁর অনন্যতা বা অরিজিন্যালিটি ।

বাংলা কথা সাহিত্যের জগতে বিভূতিভূষণ অবশ্যই মৌলিক প্রতিভার স্বাক্ষর রেখে গেছেন । তিনি এক নতুন " স্টাইল " এর প্রবর্তক । তাঁর শব্দসম্পদ ও রচনা সৌষ্ঠব অতুলনীয় এবং একান্তই নিজস্ব । রস সৃষ্টি ও রসবিচার উভয় ক্ষেত্রেই তিনি অসাধারণ কৃতিত্বের অধিকারী । তাঁর ভাষা পাঠক মনের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত হয়ে যায়। সমালোচকের ভাষায় বলা যায় : " বিভূতিভূষণের সাহিত্যের মধ্যে এমনি এক জাদুর স্পর্শ আছে , যার দ্বারা

পাঠক মন সততই আনন্দিত , উল্লসিত তথা গুঞ্জরিত হয়ে ওঠে "। [৮] বিভূতভূষণের সাহিত্যে পল্লী প্রকৃতি তথা পল্লীজীবন যথার্থ রূপ পেয়েছে। জনৈক সমালোচক বলেছেন : " সামান্য সাধারণ মানুষ বিভূতিভূষণ বংশ কৌলিন্য বা শিক্ষাদীক্ষা কোন দিক দিয়াই আভিজাত্যের লেশ মাত্র নাই , বহুদিন ধরিয়া সাহিত্য আসরে প্রস্তুতি নাই , ছাপার অক্ষরে যেদিন উপন্যাস রূপ পাইল , সেই দিনই পরিপূর্ণ গোটা শিল্পরূপ ফুটিয়া উঠিল । ' বিচিত্রায় ' যখন প্রতিমাসে ' পথের পাঁচালী ' প্রকাশিত হইতে লাগিল অথবা ' প্রবাসী ' পত্রিকায় যখন ' অপরাজিত ' প্রকাশিত হইতেছিল , তখনকার কৌতূহল মুখর বাল্য স্মৃতি যাহার মনে আছে তিনি বিভূতিভূষণের মূল্য বুঝিবেন ..... হঠাৎ দেখা গেল , পল্লী বাংলার শান্ত স্নিগ্ধ ইছামতী নদীটি আবিল নাগরিক জীবনকে শুচিস্নাত করিয়া বহিয়া চলিয়াছে ভাঙ্গা চায়ের দোকানেই যেন আষাঢ়ের ঘাটে নৌকা লাগিয়াছে । বন-কলমী , ভাঁটফুল , বৈঁচিঝোপ , আশশ্যাওড়ার বন নাগরিক উদ্যান বাটিকাকে ঢাকিয়া ফেলিয়াছে এবং যন্ত্র মুখর মনস্তাত্ত্বিক দ্বন্দ্বে বিষণ্ণ সমস্যা-পীড়িত , উৎকট ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য পরিপূর্ণ জটিল

মানুষের স্থলে সাধারণ মানুষগুলি প্রীতি—নিষিক্ত আনন্দ বেদনার পটভূমিকায় আবির্ভূত হইয়াছে "। প্রকৃতি ও মানুষই বিভূতি সাহিত্যের উপজীব্য। কবির পিপাসা যখন জেগেছে তখন কবি বিভূতিভূষণ বিশ্ব—প্রকৃতির সৌন্দর্য , বিশ্ব চরাচরের সৌন্দর্য শুষে নিয়েছেন , ঔপন্যাসিক বিভূতিভূষণ মাটির কাছাকাছি মানুষের বুকের স্পন্দন অনুভব করেছেন । বাঙালীর জন্য ও বাংলা সাহিত্যের জন্য বিভূতিভূষণ যা করে গেলেন , সেজন্য বাংলার মানুষ ও বাংলার পাঠক সমাজ তাঁকে চিরকাল স্মরণ করবে । বনফুলের মত প্রকৃতির কোলে বিভূতিভূষণের দ্বিতীয় জন্মের প্রত্যাশায় থেকে আমরাও বলতে পারি " উন্মুখ উৎসুক উৎকর্ণ হয়ে রইলাম তবু যদি তোমার সাড়া পাই । দক্ষিণ হাওয়ার মৃদু কোমল স্পর্শে , বিহ্বলতায় , ঘণশ্যাম শোভায় , বৈঁচি — ঘেঁটু — বেতবনের অনাবিল অজস্রতায় , রৌদ্রালোকিত প্রান্তরের মহিমায় , জ্যোৎস্না—স্নাত পর্বতের স্বপ্নলোকে , অরণ্যের গহন জটিলতায় , আকাশলগ্ন মেঘ — সমারোহে কোথায় তুমি আসবে কে জানে । প্রত্যাশা করে রইলাম তবু "। [১] বিশ্বে কবিতার মৃত্যু নেই , মৃত্যু নেই কীর্তিমানের ।

আলোচনার প্রেক্ষাপটে

বিভূতি কথা সাহিত্য :- লক্ষনীয় বৈশিষ্ট্য ।

(ক) বিভূতিভূষণের , উপন্যাস যেন জীবনের ' উপরিতলের ফেনপুঞ্জ ' সহজ , সরল স্বচ্ছতোয়া তটিনীর মতই তার গতি । তীব্র মনস্তাত্ত্বিক দ্বন্দ্বের চিত্র তাঁর উপন্যাসে নেই বললেই হয় । তাঁর কথা সাহিত্য তার অনাসক্ত চিত্তের জলছবি , রাজহাঁসের মত পুকুরের উপরের সৌন্দর্য নিরীক্ষণ করে তিনি সন্তুষ্ট , ডুবুরীর মত সিন্ধু সেচন করে মুক্তা সংগ্রহে তিনি আগ্রহী নন । তাঁর সাহিত্যে জীবনের সমস্যা থেকেও যেন নেই ; দারিদ্র্য আছে , কিন্তু তাতে তীব্রতা নেই । মনস্তত্ত্ব বর্ণনায় বিভূতিভূষণের মন ও মেজাজে শান্ত স্নিগ্ধ ইছামতীর ধীর-স্থিরতা লক্ষ্য করা যায় , " ইছামতী নদীর মত তাঁর কাহিনী ধীরমন্থরভাবে বইতে থাকে , ক্বচিত তাতে বিপরীত ভাবের দ্বন্দ্ব ওঠে, তারপর সে প্রবাহ নিরুদ্বেগেই বয়ে

যায় "।[১০]

পূর্বোক্ত সমালোচনার সত্যাসত্য যা-ই হোকনা , উক্ত সমালোচনার অর্থ এই নয় যে বিভূতি উপন্যাসে ভাববার কথা কিছু নেই । বিভূতিভূষণ ' গানের ভিতর দিয়ে ' ' ভুবন ' কে দেখেছিলেন , তাই জীবনের উপর দিকটা তাঁকে যতটা আকর্ষণ করেছিল , রক্ত মাংসের শরীরটা ততটা করেনি । অপুর অভাবী শৈশবে যন্ত্রনা নেই , ' টেন্সন ' নেই , নেই হীনতা বোধ , হরিহরের বয়স্ক মনেও দারিদ্রের তীব্রতা অনুভব করার শক্তি নেই , যুগল প্রসাদ , ধাওতাল সাহু , রাজু পাঁড়ে , ধাতুরিয়া , মঞ্চি , ভানুমতি , সকলেই প্রকৃতির মত সরল ও সুন্দর । বিভূতি প্রেমে নেই প্রখর দহণ , এ প্রেম নিকষিত হেম — ' কাম গন্ধ নাহি তায় '।

(খ) বিভূতিভূষণের গল্প-উপন্যাস যেন কবির কলমে লেখা । কবির চোখে বিভূতিভূষণ জীবনকে দেখেছেন , তাই তার গল্প উপন্যাসে কবিত্বের ছড়াছড়ি , একটা স্বপ্নময় দেশের আবেষ্টন , তাই প্রকৃতির এত বাহার । তাঁর কথাসাহিত্য যেন গীতি কবিতার ফ্রেমে আঁটা — এক অপূর্ব ছন্দ ও সুর নিয়ন্ত্রিত শিল্প প্রতিমা , তাঁর ভাষা -- কবির ভাষা ।

(গ) বিভূতিভূষণের উপন্যাসগুলিতে একটানা কাহিনীর অভাব আছে । এক একদিনের ঘটনা দিন-লিপির শৈলীতে গাঁথা হয়েছে । একটা নতুন শৈলীর পরিচয় অবশ্যই পাওয়া যায় , যদিও উপন্যাস বিচারে এটা একটা ত্রুটির বিষয় । কিন্তু এই ত্রুটি ঢাকা পড়েছে লেখকের প্রতিভা শক্তির গুণে । একদিনের ঘটনার সঙ্গে অন্যদিনের ঘটনার যোগ সূত্রে ফাঁক আছে অথচ ফাঁকগুলি রসহানী করেনা , একটানা কাহিনীর অভাব থেকেও যেন নেই ।

(ঘ) সমুদ্র মন্থনে যেমন অমৃতলাভ হয়েছে তেমনি স্মৃতি রোমন্থনে বিভূতি সাহিত্যের উৎপত্তি হয়েছে একথা বলা চলে । তাঁর শ্রেষ্ঠ উপন্যাসের জন্ম স্মৃতির ঘরে । হারিয়ে গেছে মধুর শৈশব , হারিয়ে গেছে কত আপন জন । কিন্তু যারা সাঁঝ সকালে প্রাণের দীপে আলো জ্বালিয়ে দিয়েছিল , দিনের আলো থাকতে তাদের স্মৃতি পূজো কি হবে না ? বিভূতিভূষণ বর্তমানের কূলে দাঁড়িয়ে যেন অতীতের উদ্দেশ্যে অর্ঘ্য নিবেদন করলেন । বিভূতি উপন্যাসে স্মৃতিরস অন্তর প্রদেশেও প্রবাহিত । শুধু তিনিই নন , তাঁর উপন্যাসের চরিত্ররাও স্মৃতি রোমন্থন করে অতীতের হারিয়ে যাওয়া ঘটনার স্বাদ নেয় ।

(ঙ) বিভূতিভূষণের উপন্যাসে রূপকথার একটা আমেজ আছে । তাঁর উপন্যাসে স্বপ্নলোকের ধোঁয়াটে রঙ ও রহস্য রোমাঞ্চ পরিবেশ লক্ষ্য করা যায় । অপুর বেঙ্গমা-বেঙ্গমীর দেশ , আরণ্যকের জীণ—পরী মনকে রূপকথার দেশে আহ্বান করে ।

(চ) জীবনের কাহিনীকে বিভূতিভূষণ কয়েকটি খন্ডে বিন্যাস করেছেন । ' পথের পাঁচালী ' উপন্যাসটি তিনি তিনটি পর্বে ভাগ করেছেন ।

(ছ) বিভূতি উপন্যাসে অলৌকিক দৃষ্টি—সম্পন্ন নায়ক চরিত্র দেখতে পাওয়া যায় । এই নায়কদের দুটো চোখ ছাড়াও যেন অতিরিক্ত একটা চোখ আছে । সেই অতিরিক্ত চোখের দৃষ্টি দিয়ে তারা সাধারণের চেয়ে অনেক কিছু বেশী দেখে । ' পথের পাঁচালী ' ' অপরাজিতে ' র অপু ' দৃষ্টি প্রদীপের জিতু ' ' আরণ্যকে ' র সত্যচরণ , ইছামতীর ' ভবানী ' এই দৃষ্টি শক্তির অধিকারী । এই অনৈসর্গিক শক্তির সাহায্যে তারা পরিচিত জগৎটার বুকে এক অন্য জগতের জীবণীশক্তি যেন আবিষ্কার করে ।

(জ) বিভূতি উপন্যাসে নারীর তুলনায় পুরুষেরা অধিক বৈচিত্র্যময় বলেই মনে হয় । বঙ্কিমচন্দ্র , রবীন্দ্রনাথ ,

শরৎচন্দ্রের কথা সাহিত্যে নারী চরিত্রের যে বিশেষ এক সার্বিক ভূমিকা বা গুরুত্ব আছে , বিভূতিভূষণের নারী চরিত্রের মধ্যে তা দেখা যায় না । তবে সে জন্য বিভূতিভূষণের নারীচরিত্রেরা হীন বা ছোট নয় , কিন্তু তারা পুরুষ চরিত্রকে ছাড়িয়ে যেতে পারেনি । ' পথের পাঁচালী ' , ' অপরাজিত ' উপন্যাসে অপুর প্রাধান্য সর্বাধিক , ' আরণ্যকে ' সত্যচরণের , ' দৃষ্টি প্রদীপে ' জিতুর । রবীন্দ্রনাথ বলেছেন " বঙ্গ সাহিত্যে পুরুষেরা মহাদেবের ন্যায় নিশ্চলভাবে ধূলিশয়ান এবং রমনী তাহারই বক্ষের উপর জাগ্রত জীবন্ত ভাবে বিরাজমান "। [১১]

রবীন্দ্রনাথের উক্ত মন্তব্যটি বিভূতি উপন্যাস সম্পর্কে বোধ হয় খাটে না । বিভূতি কথা সাহিত্যের পুরুষ চরিত্রের আর একটা লক্ষনীয় দিক হল তার পুরুষ চরিত্রের উদাসীনতা , ভবঘুরে মনোবৃত্তি।

(ঝ) পরলোক সম্পর্কে বিভূতিভূষণের এক নিজস্ব ধারনা ছিল, যা তাঁর উপন্যাসে প্রকাশ পেয়েছে । ' দৃষ্টি প্রদীপ ' এ জিতুর দৃষ্টি প্রদীপের আলোয় পরলোকের অনেক অজানা রহস্য উন্মোচিত হয়েছে, ' দেবযান ' এ পরলোক অনুসন্ধিৎসু , বিভূতিমন আরও ব্যাপক ভাবে প্রকাশ

পেয়েছে ।

(ঞ) উত্তম পুরুষের সাহায্যে কাহিনী বর্ণনা বিভূতিভূষণের কথা সাহিত্যের আর একটি অন্যতম প্রধান লক্ষণ । বঙ্কিমচন্দ্রের ' ইন্দিরা ' রবীন্দ্রনাথের ' ঘরে বাইরে ' শরৎচন্দ্রের ' শ্রীকান্ত ' উপন্যাসে এবং সতীনাথ ভাদুড়ীর ' জাগরী ' উপন্যাসে বিশেষ ভাবে এই রীতি লক্ষ্য করা যায় ।

(ট) দারিদ্র্যের চিত্র বিভূতি উপন্যাসের বিস্তৃত ভূখণ্ড ঘিরে প্রকাশ পেয়েছে । বিভূতিভূষণ দারিদ্র্যের মধ্যে মানুষ হয়েছিলেন তাই অভাবী মানুষের ছবি তাঁর সাহিত্যে স্বাভাবিক ভাবেই ফুটে উঠেছে । দারিদ্র্য কখনো বেদনাদায়ক (' অশনি সংকেত ') , আবার কখনো পীড়াদায়ক নয় , অভাব থেকেও যেন নেই , (' পথের পাঁচালী ') প্রভৃতি।

(ঠ) প্রেম সম্পর্কে বিভূতিভূষণের ধারনা অন্যান্য লেখকের চেয়ে পৃথক । তাঁর সাহিত্যে প্রেম দেহজ কামনামুক্ত । বাসনার রক্তরাগে এ প্রেম ফুটে ওঠেনি , গৃহশ্রীর মধ্যেই বিভূতি সাহিত্যে প্রেমের প্রকাশ । রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যে প্রেমের মধ্যে যে একটা পবিত্র ভাব লক্ষ্য করা যায় , বিভূতি সাহিত্যেও ঠিক তেমনি এক

শুচিশুভ্র প্রেমের কথাই ব্যক্ত হয়েছে । এক কথায় বলা যায় যে বিভূতিভূষণ তাঁর কথা সাহিত্যে যে প্রেমের কাহিনীর পরিচয় দিয়েছেন তাতে প্রবল উত্তেজনা নেই , স্থিরতা ও স্নিগ্ধতা আছে ।

এক

' প্রকৃতি আমার বিশল্যকরণী '

ঊনবিংশ শতাব্দী সুপ্তিকালের সমাপ্তি ঘোষনার কাল । বাংলা তথা ভারতবর্ষের মানুষ এখন থেকে নতুন নতুন জিজ্ঞাসা ও সম্ভাবনার সাগর সঙ্গমে উপস্থিত হোল । মনপাখীকে আর খাঁচার ভেতরে বন্দী করে রাখা গেল না , পাখী উড়তে চাইল ডানা মেলে উন্মুক্ত আকাশে । পাশ্চাত্য সংস্কৃতির সংস্পর্শে আসার পর আমাদের সমাজ ও ভাবজীবনে আলোড়ন সৃষ্টি হল । অন্যান্য বিষয় ভাবনার সঙ্গে রোমান্টিক প্রকৃতি চেতনার উন্মেষ ঘটল । বাংলা সাহিত্যে এর আগে (আদি মধ্যযুগে) প্রকৃতি এসেছে বারমাস্যার গতানুগতিক পথে । ঊনবিংশ শতাব্দীতে ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যের প্রতিষ্ঠা হওয়ার পর প্রকৃতি এক স্বতন্ত্র শক্তিরূপে সাহিত্যে প্রকাশিত হল । বাংলা গীতি কবিতার জগতে ' ভোরের পাখী ' বিহারীলাল চক্রবর্তীর ' নিসর্গ দর্শন ' কাব্যে জড় প্রকৃতির প্রাণময় সত্তা প্রকাশ পেল। রবীন্দ্রনাথ

রোমান্টিক প্রকৃতি চেতনার আলোছায়ায় যাত্রা আরম্ভ করলেন । কাব্য , কবিতা ছোট গল্প , নাটক রচনার মধ্য দিয়ে এই বিরাট প্রতিভা প্রকৃতিকে বিচিত্রভাবে সাজালেন । জীবনানন্দের মধ্যে দেখলাম প্রকৃতির মগ্ন ভাবনা ।

বাংলা কথাসাহিত্যের জগতে প্রকৃতি ভাবনার দিক দিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র , বিভূতিভূষণের অগ্রদূত । তাঁর ' আনন্দমঠ ' ' দেবী চৌধুরাণী ' তে প্রকৃতি চেতনার পরিচয় পাওয়া গেলেও , সেখানে প্রকৃতির স্বতন্ত্র সত্তা নেই । ' কপালকুণ্ডলা ' য় প্রকৃতি স্বতন্ত্র সত্তা রূপে প্রকাশ পেয়েছে । এখানে মানবসত্তা ও প্রকৃতি সত্তা মিলে মিশে একাকার হয়ে গেছে । কপালকুণ্ডলায় প্রকৃতির সৌন্দর্য রূপ অপেক্ষা রহস্য রূপটাই প্রাধান্য লাভ করেছে । সেখানে প্রকৃতির মোহিনী মূর্ত্তি নয় , ভৈরবী মূর্ত্তিই অধিক প্রকট । যদিও কপালকুণ্ডলা চরিত্রে প্রকৃতির মোহিনীরূপ ও কাপালিক চরিত্রে প্রকৃতির ভয়ালরূপ প্রকাশ পেয়েছে , তবুও উপন্যাসটির ট্রাজিক পরিণতির দিকে লক্ষ্য রেখে সব মিলে বলা যায় যে সেখানে প্রকৃতির ভয়াল রূপটাই আধিপত্য বিস্তার করেছে । রবীন্দ্রনাথের কাব্য কবিতা ছাড়া গদ্য রচনাতেও প্রকৃতির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে । কিন্তু

রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসে তাৎপর্যময় নিসর্গ চিত্র থাকলেও সেখানে প্রকৃতির আত্মিক সত্তার বিশেষ স্বকীয়তা নেই । রবীন্দ্রনাথ তাঁর উপন্যাসে প্রকৃতির উল্লেখযোগ্য ভূমিকা দেন নি , যেমন দিয়েছেন কাব্য কবিতায় , ছোট গল্পে । তাঁর উপন্যাসের মূল বিষয়ের সঙ্গে প্রকৃতির গূঢ় যোগ নেই । বস্তুতঃ বিভূতিভূষণের মতো এতখানি গুরুত্ব দিয়ে প্রকৃতিকে আর কেউ এঁকেছেন বলে মনে হয় না । বিভূতি কথা সাহিত্যে প্রকৃতির যে মুগ্ধরূপ দেখা যায় , পরবর্তী বাংলা কথা সাহিত্যে তা আর বিশেষ পাওয়া যায় নি। বিভূতিভূষণের প্রকৃতি প্রেমিক সত্তার পরিচয় দিতে গিয়ে তাঁর ছাত্র বিশ্বনাথ পাল বলেছেন : " তাঁর নিজের মুখেই শুনেছি প্রকৃতির প্রতি তাঁর এই যে ভালবাসা তা আবাল্য । তাঁর ছোট বেলায় ছোট্ট একটা কঞ্চি নিয়ে তাঁদের গ্রামের প্রান্ত দিয়ে বয়ে যাওয়া ইছামতীর পাড় দিয়ে তিনি ঘুরে বেড়াতেন । বেড়াতে বেড়াতে মনে মনে গল্পও রচনা করতেন । ইছামতীর টলটলে কালো জল , বন ধুঁধুল , ধল-চিতে আর সাঁই বাবলার বন তাঁকে যেন হাতছানি দিয়ে ডাকত । তেমনি ডাকত বাঁশবন , ঝোপঝাড় আর আম কাঁঠালের বাগান । বড় হয়েও তিনি এর মায়াময় পরিবেশ

থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া তো দূরের কথা , আরও বেশী করে জড়িয়ে পড়েছেন । আরও বেশী করে ভালবেসে ফেলেছেন । নদীর ওপারের দিগন্ত বিস্তৃত মাঠ , সভাইপুর , মণিগ্রামের ছায়াঘেরা বনবীথি তাঁর কবি মনে এক অনির্বচনীয় আনন্দের সঞ্চার করত । সূর্যাস্তের ম্লানরশ্মি যখন ওপারের গাছগাছালি আর মেঘের আড়ালে ধীরে ধীরে ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়ে আসত তখন মুগ্ধনেত্রে নির্বাক বিস্ময়ে তিনি সেদিকে চেয়ে থাকতেন । এমনকি শীতের দিনেও ইছামতীর ওপর দিয়ে নৌকোয় করে বেড়াতে বেড়াতে পাঁচপোতা , মোল্লাহাটি পার হয়ে তিনি চলে যেতেন মড়িঘাটা পর্য্যন্ত । জ্যোৎস্না পুলকিত রাতে দুপাশের বনভূমির শোভা উপভোগ করতেন দুচোখ ভরে "।[১২]

তিনি আরও বলেছেন : " ক্লাসে বসেও দেখেছি প্রকৃতিরাণীর প্রতি বিভূতি বাবুর কতখানি মমত্ববোধ । ক্লাসে ঢুকে তিনি যদি দেখতেন জানালা কোন কারণে বন্ধ আছে তাহলে তিনি যেতেন ভীষণ রেগে । অমনি বলে উঠতেন — ' দে শীগগির জানালা খুলে দে । ' শীতকালে হু-হু করা কনকনে উত্তুরে বাতাসের জন্য যদি কেউ বলে উঠত — ' স্যার, বড্ড শীত , জানালা খুলে দিলে আরও শীত

করবে ।' অমনি স্যার আরও রেগে গিয়ে বলে উঠতেন --- ' ফেঁসোআটি কলাই ' উড়ুবি তা জানালা খোলার মর্ম কি বুঝবি ? খোলা জানালা দিয়ে একবার চেয়ে দ্যাখ প্রকৃতি তোদের জন্য কি অফুরন্ত সৌন্দর্যের ভাণ্ডার সাজিয়ে রেখেছে ।" [১৩]

প্রকৃতি বিভূতি সাহিত্যের বিশল্যকরণী , মানুষের মৃত মূর্চ্ছিত চেতনাকে জাগ্রত করার ঔষধ :

" প্রকৃতির নিরাবরণ মুক্তরূপের স্পর্শে এই অনুভূতি খোলে । সুপ্ত আত্মা জাগ্রত হয় চৈত্র দুপুরের অলস নিমফুলের গন্ধে , জ্যোৎস্নাভরা মাঠে আকন্দফুলের বনে , পাখীর বেলা যাওয়া উদাস গানে , মাঠের দূর পারে সূর্যাস্তের ছবিতে , ঝরা পাতার রাশির সোঁদা সোঁদা শুকনা শুকনা সুবাসে । প্রকৃতি তাই আমার বড় বিশল্যকরণী।[১৪] ' পথের পাঁচালী 'র পল্লীপ্রকৃতির স্নিগ্ধ মনোরম রূপ , ' আরণ্যক 'এর সরস্বতী কুণ্ডীর রূপসী প্রকৃতি বিভূতিভূষণকে ক্ষণে ক্ষণে মুগ্ধ করে উদ্দেশ্যহীন পথে অজানা রাজ্যে আহ্বান করে ।

বিভূতিভূষণের গল্প-উপন্যাস প্রকৃতির রসে সঞ্জীবিত । বাংলা কথা সাহিত্যে বিভূতিভূষণ ' মহীদাস আরণ্যক ' অরণ্য ভাবের কথাকার । নিসর্গই তাঁর ঘর ।

কবিশেখর কালিদাস রায়ের ভাষায় : " সত্য সত্যই বিভূতি প্রকৃতির মাধুর্য্যে , সৌন্দর্য্যে ও ঐশ্বর্যে মুগ্ধ । বন-জঙ্গলই তার আসল ঘর "।[১৫] শশিভূষন দাশগুপ্ত তাঁর ' রূপানুরাগ ' প্রবন্ধে বিভূতিভূষণের প্রকৃতি প্রেমিক সত্তার সুন্দর পরিচয় দিয়েছেন । * কল্লোলের কোলাহল মুখর প্রাঙ্গণ থেকে শান্তি ও সান্ত্বনা লাভের মানসে বিভূতিভূষণ প্রকৃতির কোলে আশ্রয় নিলেন : " সাহিত্যের এই ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ অশান্ত অঙ্গন থেকে দূরে সরে গিয়ে গ্রাম্যপ্রকৃতির শান্ত নির্জনতায় মানুষের ভালবাসায় স্নাত হয়ে তুলসী মঞ্চের সামনে বসে স্নিগ্ধ প্রদীপের আলোয় বিভূতিভূষণ ধ্যানমুগ্ধ থেকেছেন প্রকৃতি পূজোয় "।[১৬]

' কল্লোল ' গোষ্ঠীর নবনির্মিত আধুনিক জটিল জীবনের পথে পা না বাড়িয়ে প্রকৃতির অনায়াস দাক্ষিন্য লাভ করে তিনি সত্যই ধন্য হলেন । প্রকৃতি প্রেম বিভূতিভূষণকে বাংলা কথা সাহিত্যে স্বতন্ত্র মর্যাদা দিয়েছে ।

---

* ' রাজাভাতখাওয়া ' অঞ্চলের প্রতি বিভূতিভূষণের কি গভীর আকর্ষণ ছিল , অধ্যাপক শশিভূষণ দাসগুপ্তের ' রূপানুরাগ ' প্রবন্ধটি পড়লেই তা বোঝা যায় ।

সমালোচকের ভাষায় বলা যায় ,- " প্রকৃতি প্রেম বিভূতিভূষণকে সম্পূর্ণ এক স্বতন্ত্র জাতের সাহিত্যিক রূপে গড়ে তুলেছে "।[১৭]

বিভূতিভূষণের প্রথম গল্প ' উপেক্ষিতা ' বিভূতি প্রকৃতি প্রেমের পূর্বরাগ , পরবর্তী গল্প উপন্যাসে তা অনুরাগে পরিণতি লাভ করেছে। ' উপেক্ষিতা ' গল্পের নায়ক বিমল সমুদ্রের ধারে বসে তার পূর্ব জীবনের কথা মনে করে । বাংলা দেশের জল , মাটি , গাছপালার কথা আর " প্রথম যৌবনের একটা বিস্মৃত প্রায় ঝাপসা ছবি বড় স্পষ্ট , হয়ে চলে এলো । পঁচিশ বছর পূর্বের এমনি এক সন্ধ্যায় দূর বাংলা দেশের এক নিভৃত পল্লীগ্রামের জীর্ণ শান বাঁধানো পুকুরের ঘাট বেয়ে উঠছে আর্দ্র বসনা তরুনী এক পল্লী-বধূ ..... "।[১৮]

" আরব সমুদ্রের জলে এমন করুণ সূর্যাস্ত কখনও হয়নি "।[১৯]

' পথের পাঁচালী ' উপন্যাসের বীজস্বরূপ ' পুঁইমাচা ' গল্পটিতে বিভূতিভূষণ মানব মনের সঙ্গে প্রকৃতি জীবনের সম্পর্ককে আশ্চর্য কুশলতার সঙ্গে ফুটিয়ে তুলেছেন। মৃতা ' ক্ষেন্তি ' পুঁই লতার মধ্যে যেন পুনর্জীবিত হয়েছে ।

" সেই লোভী মেয়েটির লোভের স্মৃতি পাতায় পাতায় শিরায় শিরায় জড়াইয়া তাহার কত সাধের নিজের হাতে পোঁতা পুঁই গাছটি মাচা জুড়িয়া বাড়িয়া উঠিয়াছে .... বর্ষার জল ও কার্তিক মাসের শিশির লইয়া কচিকচি সবুজ ডগাগুলি মাচাতে সব ধরে নাই , মাচা হইতে বাহির হইয়া দুলিতেছে । ..... সুপুষ্ট , নধর , প্রবর্দ্ধমান জীবনের লাবণ্যে ভরপুর "।[২০]

' পথের পাঁচালি ' উপন্যাসে প্রকৃতির যে রূপ দেখা যায় , তা গ্রাম্য প্রকৃতির রূপ। পল্লীর প্রতি বিভূতিভূষণের স্বাভাবিক টান ছিল , পল্লী প্রকৃতি তথা পল্লী জীবনের প্রতি তাঁর সংস্কারগত আকর্ষণ ছিল। বাংলার গ্রাম তাঁর হৃদয়কে মুগ্ধ করেছিল । মনকে আশ্চর্য ভাবে সম্মোহিত করেছিল : " নগরের জীবনের বিচিত্ররূপ তাঁর দৃষ্টিতে ক্ষণিক মোহাবেশ এনেছিল , কিন্তু বাংলার গ্রামই হৃদয় হরণ করেছিল"।[২১] বাংলার গ্রামেই যে সৌন্দর্যের অমরাবতী লুকিয়ে আছে, তা আমাদের চোখে এতদিন পড়েনি । বিভূতিভূষণ তৃতীয় নেত্রের দৃষ্টি দিয়ে আমাদের চির পরিচিত গ্রাম্য প্রকৃতিকে দেখলেন ও দেখালেন । আমরা অবাক হয়ে দেখলাম আমাদের চির পরিচিত গ্রাম্য প্রকৃতির এত বাহার এলো

আজ কোথা থেকে ? মাঠের ঝোপঝাড় , উলুখড় , বন-তুলসী , সোঁদাল , কুলগাছ , কলমীলতা আজ কোন রাজার ঐশ্বর্য্য নিয়ে উপস্থিত হল ? পাখীর ডাক আজ কোন স্বপ্নলোকের বার্তা নিয়ে এলো ? এ যেন

" বহুদিন ধরে , বহু দেশ ঘুরে ,
দেখিতে গিয়াছি পর্বতমালা ,
দেখিতে গিয়াছি সিন্ধু ,
দেখা হয় নাই চক্ষু মেলিয়া —
ঘর হতে দূরে দুই পা ফেলিয়া
একটি ধানের শিষের উপর
একটি শিশির বিন্দু । "

' পথের পাঁচালী ' উপন্যাসের প্রকৃতি যেন পল্লীর গৃহের পাশে অবস্থিত পানা ভরা পুকুর , তা যেমন সাদামাটা তেমনি পরিচিত । পুরীর কুলহারা সমুদ্রের মত অথবা সুদূর কাশ্মীরের পার্বত্য প্রকৃতির মত এ প্রকৃতি নয় । এ প্রকৃতিতে নেই বিলাসী ধনীর উদ্যানে সযত্নরোপিত গোলাপ , গন্ধরাজ , রজনীগন্ধা , চামেলী চাঁপা হাসনা হানার নাগরিক বাহার , আছে পল্লী ভূমির অনাবিল পরিবেশে বিভিন্ন রকমের বন , উপবন , ঝোপঝাড় থেকে সংগ্রহ করা

কুরুচি , শাল , মহুয়া , আকন্দ , কাশ , ভাঁট ফুলের শোভা ও সৌরভ ।

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ' পথের পাঁচালী ' উপন্যাসের উচ্চ প্রশংসা করে বলেছিলেন : ' পথের পাঁচালী ' যে বাংলা পাড়াগাঁয়ের কথা সেও অজানা রাস্তায় নতুন করে দেখতে হয় "।[২২] কবিগুরুর উক্তিটি একেবারেই খাঁটি । বাংলার পল্লী প্রকৃতি ' পথের পাঁচালী ' উপন্যাসে পাপড়ীর মত নিজেকে মেলে ধরেছে । দিলিপ কুমার রায়ের ভাষায় :

" গ্রামের জীবনকে কবি হৃদয় দিয়ে ভালবেসেছেন । গ্রামের আনাচ কানাচ তাঁর পরিচিত । আর কী নিবিড় সে পরিচয় । গাছপালা লতাপাতা ফলফুল , ঝোপঝাপ তৃণশস্প প্রতিটির সূক্ষ্মতম আকৃতিটিও তাঁর চেনা । তাদের মৃদুতম হাসিটিও তাঁর রক্তে দোলা দেয় "।[২৩]

বাংলার গ্রামের ফলফুল , পাখীর ডাক , দরিদ্র-বেদনা , চাষবাস, যজমান বৃত্তি, গ্রামীন লোকাচার , লৌকিক বিশ্বাস , লোক-উৎসব , প্রবাদ-প্রবচন , ছড়া , বিভিন্ন দেবদেবীর পীঠস্থান , চন্ডীমণ্ডপ প্রভৃতি , পল্লীজীবনের সম্পদ স্বরূপের বাস্তব সম্মত পরিচয় দিয়েছেন । আলোচ্য গ্রন্থে গ্রাম জীবনের যে ছবি আঁকা হয়েছে , সে ছবি বাস্তব

জীবন থেকেই নেওয়া , এবং সেই পল্লী জীবন ধারায় আজও বিশেষ পরিবর্তন আসেনি । এখনও পল্লীর বৃদ্ধা ঠাকুমারা ইন্দির ঠাকরুণের মত নাতি নাতনিদের গল্প শোনায় , ছড়া বলে , সেখানে বৃদ্ধ ঠাকুর্দা অথবা বৃদ্ধা ঠাকুমার মন আজও অতীতের শত স্মৃতিতে ভরা , পল্লী জীবনের অতীত রহস্যের চাবিকাঠি তাদের হাতে আজও আছে । বিশেষ মুহূর্তে যখন সেই চাবিকাটির সাহায্যে তারা অতীতের দ্বার খুলে দেয় তখন রহস্যলোক থেকে বীরু ডাকাতের রোমাঞ্চকর অভিযানের পদধ্বনি শোনা যায় ।

চরিত্রগুলির মর্মমূলেও পল্লীর বৈশিষ্ট্য প্রতিফলিত । দুর্গা অপুকে তো আমরা গ্রামে গ্রামে দেখতে পাই । অপুর মত কৌতূহলী শিশুর অভাব নেই গ্রামে , দুর্গার মত গ্রাম্য বালিকা গ্রামে গ্রামে প্রতিদিন ঘুরে বেড়ায় । সত্যই "পল্লীচিত্রের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শিত হইয়াছে ' পথের পাঁচালী 'তে "।[২৪] বস্তুতঃ বাংলার গ্রাম জীবনের সবটাই তুলে ধরেছেন বিভূতিভূষণ এখানে , এক বিশিষ্ট সমালোচক সত্যই বলেছেন ---

" পথের পাঁচালীর প্রকৃতি সম্পূর্ণভাবে বাঙালীর নিজস্ব গ্রাম্য প্রকৃতি । বাংলার গ্রামে গ্রামে যে ধরনের দৃশ্য

চোখে পড়ে , এই উপন্যাসেও সেই দৃশ্যই দেখা যায় "।[২৫]

পল্লী প্রকৃতির প্রতি বিভূতিভূষণের টান যে কত গভীর ছিল , তাঁর দিন লিপিতে তার অসংখ্য প্রমান আছে : " গভীর রাত্রি পর্য্যন্ত বড় বাসার ছাদে বসে মেঘলা রাতে কত কথা মনে আসে — আবার যদি জন্মই হয় তবে যেন ঐ রকম দীন হীনের পর্ণকুটিরে অভাব অনটনের মধ্যে পল্লীর স্বচ্ছতায় গ্রাম্য নদী , গাছপালা নিবিড় মাটীর গন্ধ অপূর্ব সন্ধ্যা মোহভরা দুপুরের মধ্যেই হয় "।[২৬]

দিনলিপির অন্যত্র দেখা যায় : " পরদিন বড় বাসার ছাদে বসে বসে সন্ধ্যাবেলা ভাবছিলাম । কি গ্রামেই জন্মেছিলাম । এই তো আরা জেলা — ছাপরা জেলা ঘুরে এলাম । কোথায় সেই পরিপূর্ণ , সুন্দর স্নিগ্ধ শ্যামলতা , বাঁশবন , বনঝোপ । বড় ভালবাসি , তাদের বড় ভালবাসি আমি , বড় ভালবাসি । কেউ জানেনা কত ভালবাসি আমি আমার গ্রামকে — আমার ইচ্ছামতী নদীকে "—[২৭]

" আমারও মন আবার চঞ্চল হয়ে উঠেছে তখন যশোর জেলার এই ক্ষুদ্র পল্লী গ্রামটির জন্য । যত দেশ বিদেশেই বেড়াই , যত পাহাড় জঙ্গলের অপূর্ব দৃশ্যই দেখি না কেন , বাল্যের সেই লীলাভূমি সেই ইছামতীর তীরে

যেমন মনকে দোলা দেয় এমন কোথাও পেলাম না "।[২৮]

স্মৃতির এই পিছুটান ' পথের পাঁচালী ' তেও পাওয়া যায় । গ্রন্থের শেষদিকে অপুকে নিশ্চিন্দিপুর ডাক দেয় , ডাক দেয় সোনাডাঙ্গার মাঠ , শাঁখারী পুকুর , বাঁশবণ , সায়েবের ঘাট , ডাক দেয় বিশালাক্ষী দেবী , সোঁদালীবনের পাখী । আচার্য সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় বলেছেন :

" বিভূতিভূষণের চিত্ত আর অনুভূতি বিশ্ব-প্রপঞ্চের সঙ্গে , প্রকৃতির সঙ্গে , পৃথিবীর সঙ্গে , ভূমিশ্রীর সঙ্গে যেন ওতপ্রোত ভাবে জড়িয়ে ছিল , শিশুকাল থেকেই তিনি বাংলার পল্লীশ্রীর মধ্যে এমনভাবে মানুষ হয়েছিলেন যে সত্যই তিনি নিজের সত্তাকে , নিজের আত্মাকে, বনের মধ্যে গাছপালা , নদনদী , পাহাড় পর্বত , ঝরণা টিলার মধ্যে যেন ঢেলে দিয়েছেন "।[২৯]

' আম আঁটির ভেঁপু ' অংশে সাধারণ গ্রাম্য প্রকৃতি হয়ে উঠেছে স্বপ্ন-রঙের মায়াপুরী :

" মাঠের ঝোপঝাপ গুলো , উলুখড় বন-কলমী , সোঁদাল ও কুলগাছে ভরা । কলমীলতা সারা ঝোপগুলার মাথা বড় বড় সবুজ পাতা বিছাইয়া ঢাকিয়া দিয়াছে — ভিতরে স্নিগ্ধ ছায়া , ছোট গোয়ালে , নাটা কাঁটা , ও

নীল বন অপরাজিতা ফুল সূর্যের আলোর দিকে মুখ উঁচু করিয়া ফুটিয়া আছে , পড়ন্ত বেলার ছায়ায় স্নিগ্ধ বনভূমির শ্যামলতা , পাখীর ডাক , চারিধারে প্রকৃতির মুক্ত হাতে ছড়ানো ঐশ্বর্য্য রাজার মত ভান্ডার বিলাইয়া দান , কোথাও এতটুকু দারিদ্র্যের আশ্রয় খুঁজিবার চেষ্টা নাই , মধ্য বিত্তের কার্পন্য নাই । বেলা শেষের ইন্দ্রজালে মাঠ , নদী , বন মায়াময় "[৩০]

কবি সমালোচক বুদ্ধদেব বসু পথের পাঁচালীর পল্লী প্রকৃতির দিকটি বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন : " *Pather panchali (The Ballad of the Road) , an Idyll of Village life* "[৩১]

প্রকৃতি বর্ণনায় বিভূতিভূষণের এক নিজস্বতা আছে , যা অন্যের রচনায় মধ্যে খুব সুলভ নয় । দুটি শিশুচিত্তকে পল্লী প্রকৃতি কতখানি প্রভাবিত করেছে , কতখানি কাছে টেনেছে , পথের পাঁচালী উপন্যাসে তারই ছবি এঁকেছেন বিভূতিভূষণ : " কোন প্রকৃত পল্লীর অবিকৃত চিত্রাঙ্কন বিভূতি বাবুর মূল উদ্দেশ্য নহে , তিনি চাহিয়াছেন বাংলার বাঁশ-বনে-ঘেরা ঘন-শ্যামল পল্লীগ্রাম দুটি সদ্যজাগ্রত ,

গ্রহনশীল উপভোগসমর্থ শিশুচিত্তের উপর কি ছাপ ফেলে , কোন প্রতিক্রিয়া উৎপাদন করে , তাহাই আঁকিয়া দেখাইতে "।[৩২]

কিন্তু কি আশ্চর্য দুটি শিশু চোখের মুগ্ধ দৃষ্টিতে বাংলার পল্লী প্রকৃতি যে রূপে ফুটে উঠল , তা সর্বজনের হৃদয়ে সাড়া জাগাল । অপুর কবিদৃষ্টির সাহায্যে বিভূতিভূষণ প্রকৃতির প্রাণবন্ত রূপ আমাদের মুগ্ধ দৃষ্টির সামনে উন্মোচিত করলেন । অপু প্রকৃতির কাব্যকার , সত্যই সে " অর্ধেক মানব , অর্ধেক প্রকৃতি । তাঁর সর্বজন পরিচিত অপু অর্ধেক মানব অর্ধেক প্রকৃতি "।[৩৩]

দুর্গাও প্রকৃতি প্রিয় । সে তার পাড়ার সমবয়সী ছেলে মেয়ের সঙ্গে খেলাধূলা করেনা , কোথায় কোন ঝোঁপে বৈঁচি পেকেছে , কোন গাছে আমের গুটি বেঁধেছে , কোন বাঁশতলায় শেয়াকুল খেতে মিষ্টি , তা তার নখদর্পনে । চোখে মায়া অঞ্জন লাগিয়ে দুর্গা প্রকৃতিকে দেখেনি , বুনোফুল , লতা পাতা ছাড়া কোন 'নিগূঢ়তর উপহার' প্রকৃতি তাকে দেয়নি । তার কাছে প্রকৃতি দেবী অলঙ্কার সজ্জায় সজ্জিত হয়ে , বেনারসী শাড়ী পরে আসেনি ,

আটপৌরে পোষাকেই উপস্থিত হয়েছে । *

অপুর প্রকৃতি দর্শন কবি দার্শনিকের । বাইরের রূপটা দেখে সে সন্তুষ্ট নয় , অন্দর মহলে প্রবেশ করে সে তার সাধ মেটাতে চায় । অপু প্রকৃতির ইন্দ্রজালের অনুভূতি , মন ব্যাকুল করা হাতছানি আবিষ্কার করতে পারে । শান্ত , স্নিগ্ধ পল্লী-প্রকৃতি অপু তথা তার স্রষ্টার সামনে উপস্থিত হয়ে তাদের মুগ্ধ করেছে :

সমালোচকের ভাষায় :

" তাই তাঁর ভাষায় গ্রাম্য প্রকৃতির মুখরতা যেমন ছবির ক্যানভাসে বর্ণোজ্জ্বল হয়েছে "। [৩৪]

অন্য এক সমালোচকের ভাষায় : " স্বভাবতই পল্লী মানুষের সহজ সরল জীবন যাত্রা এবং পল্লী প্রকৃতি তাঁর হৃদয়ে আলোড়ন ও আবেদন যুগিয়েছে"। [৩৫] অপুর চোখ দিয়ে যখন আমডোর গ্রামখানি দেখা হয় তখন সে গ্রামখানি কত জীবন্তরূপ ফুটে ওঠে !-

" আমডোর ! ছোট্ট চাষাদের গাঁখানা-কেমন নামটি !

---

* দুর্গার প্রকৃতি চেতনায় ক বিত্ব নেই , সাদা চোখেই সে প্রকৃতিকে দেখেছে এবং সাধারণ ভাবেই প্রকৃতিকে বরণ করেছে ।

মেয়েরা উঠানে বিচালি কাটিতেছে , ছাগল বাঁধিতেছে , মুরগীকে ভাত খাওয়াইতেছে , বড়লোকেরা পাট শুকাইতেছে , বাঁশ কাটিতেছে — দেখিতে দেখিতে গাঁ পিছনে ছাড়িয়া একেবারে বাইরের মাঠ ..... বিলে জলে থৈ থৈ করিতেছে ..... উড়ি ধানের খেতে বক বসিয়া আছে ..... লাল ফুলের পাতা ও ফুটন্ত ফুলে জল দেখা যায় না "।[৩৬]

উক্ত চিত্রকল্পে পল্লী মানুষ ও পল্লী প্রকৃতি কত নিখুঁতভাবে ফুটে উঠেছে ; মনেই হয়না যে আমরা বই পড়ছি , মনেহয় যেন আমরা জীবন্তরূপ দেখছি ।

' অপরাজিত ' উপন্যাসে অপু প্রকৃতির সরস , সতেজরূপ দেখতে না পেয়ে অনেক সময় ব্যথাহত হয়ে পড়ে । মনসাপোতা গ্রামে নিশ্চিন্দিপুরের মায়া লোকের স্পর্শ না পেয়ে অখুশী হয় :

" তাহার মনে হইল গ্রামটাতে লোকের বাস একটু বেশী , একটু যেন বেশী ঠেসাঠেসি, ফাঁকা যায়গা বেশী নাই , গ্রামের মধ্যে বেশী বণজঙ্গলের বালাইও নাই "।[৩৭] অবশ্য অপরাজিত উপন্যাসের শেষ দিকে , যখন অপু নিশ্চিন্দিপুরে ফিরে এলো তখন নিশ্চিন্দিপুরের সরস

পরিবেশে অপু প্রকৃতির মোহনরূপকে আবার ফিরে পায় । কিন্তু শৈশবদৃষ্টি তখন হারিয়ে গেছে , এখন শুধু প্রকৃতি মুগ্ধতাই নেই, ব্যাখ্যারও প্রয়োজন হয়েছে । এখন থেকে অপুর প্রকৃতি-চেতনা মুগ্ধতার পথ বেয়ে আধ্যাত্মিক চিন্তনের পথে উন্নীত হয়েছে :

" আজকাল নির্জনে বসিলেই তাহার মনে হয় , এই পৃথিবীর একটা আধ্যাত্মিক রূপ আছে , এর ফুলফল আলোছায়ার মধ্যে জন্মগ্রহণ করার দরুন এবং শৈশব হইতে এর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের বন্ধনে আবদ্ধ থাকার দরুন এর প্রকৃত রূপটি আমাদের চোখে পড়ে না "।[৩৮]

" ..... আকাশের রং আর এক রকম — দূরের সে গহন হিরাকসের সমুদ্র ঈষৎ কৃষ্ণাভ হইয়া উঠিয়াছে — তার তলার সারা সবুজ মাঠটা , মাধবপুরের বাঁশবনটা কি অপূর্ব , অদ্ভুত , অপার্থিব ধরনের ছবি ফুটাইয়া তুলিয়াছে । ..... ও যেন পরিচিত পৃথিবীটা নয় , অন্য কোন অজানা জগতের কোনও অজ্ঞাত দেবলোকের .....।[৩৯] কেবল মুগ্ধমতি চির কিশোরের দৃষ্টিতেই বিভূতিভূষণ প্রকৃতিকে দেখেন নি , পরিনত মনেও উপলব্ধি করেছেন।

সাধারন বিচারে বিভূতি প্রকৃতির দুই রূপ —

গ্রাম্য-প্রকৃতি ও অরণ্য-প্রকৃতি । ' পথের পাঁচালী ' গ্রাম্য প্রকৃতির শ্রেষ্ঠ উদাহরণ , ' আরণ্যক ' অরণ্য প্রকৃতির ঐকতান । কিন্তু সূক্ষ্মতর বিচারে বিভূতি প্রকৃতির তিন রূপ (ক) প্রিয়া প্রকৃতি , (খ) রুদ্র প্রকৃতি , (গ) শিব প্রকৃতি ।

প্রিয়া প্রকৃতি কখনো মোহিনী কখনো বা মানিনী । মোহিনীরূপে সে তার কাঙ্ক্ষিত জনকে হাতছানি দিয়ে ডেকে এনে নিজের সৌন্দর্য দেখিয়ে প্রিয় মনকে নেশাগ্রস্ত করে তোলে , শতরূপে মুগ্ধকরে , নতুন দৃষ্টি জাগ্রত করে মনের আয়ু বাড়িয়ে দেয় । মানিনীরূপে তার বড় মান , অন্যের দিকে আকর্ষিত হলে তিনি অবজ্ঞা করে মুখ ফিরিয়ে নেন :

" আর কি ঈর্ষার স্বভাব প্রকৃতি রানীর । প্রকৃতিকে যখন চাহিব , তখন প্রকৃতিকে লইয়াই থাকিতে হইবে , অন্য কোন দিকে মন দিয়াছি যদি , অভিমানিনী কিছুতেই তাঁর অবগুন্ঠন খুলিবেন না "।[৪০] রুদ্ররূপে প্রকৃতি বড় ভীষণ , মারণী শক্তিসম্পন্ন । তখন সে মধ্যাহ্ন সূর্যের প্রখর তাপে সব পুড়িয়ে খাক্ করে দিতে চায় অথবা বজ্রাঘাতে দগ্ধ করে দেয় । তখন সে ধ্বংসের দেবতা রুদ্র নটরাজ , প্রলয় নৃত্যে ধ্বংসের আয়োজনে মেতে ওঠে । ' আরণ্যক ' এ প্রকৃতির

Maulana Azad Library
Acc. No.....
T- 5393

এই ভীষন রূপের প্রতিপত্তি দেখা যায় । ' পথের পাঁচালী ' র কিছু কিছু অংশে এই রুদ্র শক্তির তাণ্ডব লীলার পরিচয় পাওয়া যায় :

" দুই একদিনে ঘনীভূত বর্ষা নামিল । হু হু পূবে হাওয়া , খানাডোবা সব থৈ-থৈ করিতেছে — পথে ঘাটে এক হাঁটু জল , দিনরাত সোঁ সোঁ , বাঁশ বনে ঝড় বাধে — বাঁশের মাথা মাটিতে লুটাইয়া পড়ে — আকাশের কোথাও ফাঁক নাই — মাঝে মাঝে আগেকার চেয়ে অন্ধকার করিয়া আসে — কালো কালো মেঘের রাশ হু হু উড়িয়া পূব হইতে পশ্চিমে চলিয়াছে — দূর আকাশের কোথায় যেন দেবাসূরের মহাসংগ্রাম বাধিয়াছে , কোন্ কৌশলী সেনা নায়কের চালনায় , জলস্থল — আকাশ একাকারে ছাইয়া ফেলিয়া বিরাট দৈত্যসৈন্য , বাহিনীর পর বাহিনী , অক্ষৌহিনীর পর অক্ষৌহিনী , অদৃশ্য রথী মহারথীদের নায়কত্বে ঝড়ের বেগে অগ্রসর হইতেছে — প্রজ্বলন্ত অত্যুগ্র দেববজ্র আগুন উড়াইয়া চক্ষের নিমেষে বিশাল কৃষ্ণচমুর এদিক্-ওদিক্ পর্য্যন্ত ছিঁড়িয়া ফাঁড়িয়া এই ছিন্ন ভিন্ন করিয়া দিতেছে — এই আবার কোথা হইতে রক্তবীজের বংশ করাল কৃষ্ণছায়ায় পৃথিবী অন্তরীক্ষ অন্ধকার করিয়া ফিরিয়া

আসিতেছে "।[৪১]

" ঝড়ের গোঁ গোঁ শব্দ , অনেক রাত্রে ঝড় বাড়িল । বাহিরে কি ঝট্‌কা আসিল ! উপায় ! একবার বড় একটা দমকায় ভয় পাইয়া সে ঝড়ের গতিক বুঝিবার জন্য সন্তর্পণে দালানের দুয়ার খুলিয়া বাহিরের রোয়াকে মুখ বাড়াইল --------- বৃষ্টির ছাটে কাপড় চুল সব ভিজিয়া গেল — হু হু একটানা হাওয়ার শব্দে বৃষ্টিপতনের ঝড়ের শব্দ ঢাকিয়া গিয়াছে — বাহিরে কিছু দেখা যায় না — অন্ধকারে মেঘে আকাশে-বাতাসে গাছপালায় সব একাকার। ঝড় বৃষ্টির শব্দে আর কিছু শোনা যায় না "।[৪২]

একজন বিশিষ্ট সমালোচক বলেছেন : " বিভূতিভূষণ স্নিগ্ধ প্রকৃতির উপাসক । রুদ্র সব কিছুর দিক থেকে — রুদ্র প্রকৃতির দিক থেকেও — তিনি তাঁর দৃষ্টি সরিয়ে নিয়েছেন "।[৪৩]

একথা সর্বাংশে সত্য নয় বলেই মনে হয় , বিভূতিভূষণের প্রীতি ' প্রকৃতির খরাবর্তে ' না থাকলেও , তিনি রুদ্র প্রকৃতির দিক থেকে তাঁর দৃষ্টি সরিয়ে নিতে পারেন নি । ' আরণ্যক ' উপন্যাসে দেখা যায় যে উপন্যাসের প্রধান চরিত্র সত্যচরণ সরস্বতী কুন্ডীর সৌন্দর্যে যেমন মুগ্ধ হয় অন্যদিকে তেমনি অরণ্যের দাবানলের ভয়ঙ্কর রূপ দেখে

ভীত হয় । নিশ্চিন্দিপুরে প্রকৃতির সৌন্দর্যে অপু যেমন মোহিত হয় , তেমনি ঝড় বৃষ্টির দিনে ভয়ে দিদির বুকে আশ্রয় নেয় ।

বিভূতিভূষণের শিব প্রকৃতি সুন্দর মনোরম ও শান্ত । এ প্রকৃতি পদ্মার মত পাড় ভাঙ্গে না , পাড়ে শ্যাম সমারোহ জাগায় । এ যেন ইছামতী , এ প্রকৃতি স্নিগ্ধ শীতল চন্দ্রিকা , মধ্যাহ্ন সূর্য্যের প্রখরতা এতে নেই । এই প্রকৃতিকেই বিভূতিভূষণ ভালবাসেন । ' পথের পাঁচালী ' ' অপরাজিত ' ' আরণ্যক ' ' ইছামতী ' ' দৃষ্টিপ্রদীপ ' প্রভৃতি উপন্যাসের ও বিভিন্ন ছোটগল্পে প্রকৃতির এই নয়ন ভোলানো রূপ দেখে বিভূতি চিত্ত মুগ্ধ ও বিভোর । ' পথের পাঁচালী ' উপন্যাসে প্রকৃতির এই মনোরম রূপ বিভিন্ন স্থানে দেখতে পাই । " সোনাডাঙ্গা মাঠের বুক চিরিয়া উঁচু মাটির পথ । পথের দুধারে মাঠের মধ্যে শুধুই আকন্দফুলের বন , দীর্ঘ শ্বেতাভ ডাঁটাগুলি ফুলের ভারে নত হইয়া দূর্বা ঘাসের উপর লুটাইয়া পড়িয়াছে "।[৪৪]

পল্লী প্রকৃতি দর্শনে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে বিভূতিভূষণের দৃষ্টি ভঙ্গির পার্থক্য আছে। রবীন্দ্র সাহিত্যে প্রকৃতির অসাধারণত্বের কথা মনে রেখেও বলা যায় যে রবীন্দ্রনাথ

গ্রামের মানুষ ছিলেন না । পল্লীজীবনের সঙ্গে তাঁর নাড়ীর যোগ ছিল না । তিনি বাইরে থেকে অতিথির দৃষ্টিতে পল্লীজীবনকে দেখেছেন , ভেতর থেকে পল্লীবাসীর দৃষ্টিতে দেখেন নি । একথা বলা ভুল নয় । বিভূতিভূষণ গ্রাম্য পরিবেশে মানুষ হয়েছেন , সুতরাং পল্লী প্রকৃতি ও পল্লী জীবনের সঙ্গে তাঁর রক্তের সম্পর্ক । বিভূতিভূষণের দৃষ্টি তাই স্বচ্ছ ও খাঁটি । কারণ তিনি প্রথম থেকেই গ্রাম্য প্রকৃতির আত্মার আত্মীয় ।

সমালোচকের ভাষায় বলা যায় : " আগন্তুকের দৃষ্টি দিয়ে , পথিকের দৃষ্টি দিয়ে দেখেছেন রবীন্দ্রনাথ । বিভূতিভূষণ দেখেছেন পল্লীবাসীর দৃষ্টি দিয়ে । রবীন্দ্রনাথের দৃষ্ট বস্তুর মধ্যে কুয়াশার রহস্য বিরাজমান, বিভূতিভূষণের দৃষ্ট বস্তু নির্মল মধ্যাহ্নের দীপ্তিতে সুপ্রকট । তার প্রত্যেকটি মানুষ , গাছপালা , ঘরবাড়ী , নদী এবং নদীর ঘাট, দীঘি এবং পানা পুকুর সমস্ত সুপ্রকট "। [৪৫]

তার মানে এই নয় যে পল্লীপ্রকৃতি চেতনায় রবীন্দ্রনাথ কৃত্রিম । রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে বিভূতিভূষণের পল্লী প্রকৃতি চেতনায় মূল পার্থক্য এই যে রবীন্দ্রনাথ কবির চোখে পল্লী প্রকৃতিকে দেখেছেন , বিভূতিভূষণ দেখেছেন ঔপন্যাসিকের

চোখে । রবীন্দ্রনাথের পল্লীজগত হল ' সাবজেকটিভ ' বিভূতিভূষণের ' অবজেক্টিভ ' । রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতি মানব মনের সঙ্গে যুক্ত , বিভূতি-প্রকৃতি কখনও মানব মনের প্রকাশ মাধ্যম আবার কখনও মানুষ্য সম্পর্ক নিরপেক্ষ , স্বতন্ত্র । প্রকৃতি ভাবনায় রবীন্দ্রনাথ যতটা দার্শনিক ও পরিমার্জিত , বিভূতিভূষণ ততটা নন ।

আবার উভয়ের মধ্যে সাদৃশ্যও আছে । রবীন্দ্রনাথের শুভা মৃন্ময়ীর মত বিভূতিভূষণের দুর্গা প্রকৃতির দুহিতা , অপু তারাপদর মতই প্রকৃতির পুত্র ।

প্রকৃতি ভাবনায় বিভূতিভূষণের সঙ্গে ইংরেজ কবি ওয়ার্ডসওয়ার্থের মিল আছে । ওয়ার্ডসওয়ার্থ প্রকৃতির মধ্যে যেমন মৃতা লুসীর অদৃশ্য জীবনী শক্তির খোঁজ করেছিলেন ' Slumber did my spirit seal ' কবিতায় , ' পথের পাঁচালী ' তে বিভূতিভূষণও তেমনি অপুর চিন্তাশক্তিতে দুর্গাকে পুনর্জীবীত করেছেন :

" ঐ যেখানে আকাশের তলে আষাঢ় — দুর্গাপুরের — বাঁধা সড়কের গাছের সারি ক্রমশঃ দূর হইতে দূরে গিয়া পড়িতেছে , ওরই ওদিকে যেখানে তাহাদের গাঁয়ের পথ বাঁকিয়া আসিয়া সোনাডাঙ্গা মাঠের মধ্যে উঠিয়াছে ,

সেখানে পথের ঠিক সেই মোড়টিতে , গ্রামের প্রান্তের বুড়ো জামতলাটায় তাহার দিদি যেন ম্লানমুখে দাঁড়াইয়া তাহাদের রেলগাড়ীর দিকে চাহিয়া আছে ।" [৪৬] .....

ওয়ার্ডসওয়ার্থের ' Prelude ' এর ' There was a boy ' এবং বিভূতিভূষণের অপু সগোত্র । অপুর মতো তারও প্রকৃতির ভাষা বোঝার ক্ষমতা আছে । " A gentle shock of mild surprise has carried far into heart the voice of mountain torrents ."

' অপরাজিত ' উপন্যাসের বিভূতিভূষণ যে অপরাজিত জীবন রহস্যের কথা বলেছেন , ওয়ার্ডসওয়ার্থও সেই একই কথা বলেছেন :

" Whether we are young or old , our destiny , our being heart and home . Is with intifinitude , and only there with hope it is , hope that can never die . Effort and expectation and desire , And something ever move about to be ." [৪৭]

প্রকৃতি চেতনায় উভয়ের মধ্যে যেমন মিল আছে , তেমনি পার্থক্যও কিছু আছে । ওয়ার্ডসওয়ার্থের প্রকৃতি

নীতিবাদী শিক্ষক । কথা সাহিত্যিক হাডসন বিভূতিভূষণের মত প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের সম্পর্কের কথা বলেছেন । বিভূতিভূষণ যেমন বলেছেন :

" এই প্রকৃতির সঙ্গে , পাখীর গানের সঙ্গে মানুষের সুখ দুঃখের যোগ আছে বলেই এত ভাল লাগে "। [৪৮]

তেমনি হাডসনও বলেছেন :

" The blue sky , the brown soil beneath the grass , the trees , the animal , the wind and rain , and stars are never strange to me : for I am in and of and am one with them ." [৪৯]

হার্ডির সঙ্গে বিভূতি প্রকৃতির কোথাও কোথাও মিল থাকলেও মূলতঃ অমিলের মাত্রাটাই বেশি । হার্ডির প্রকৃতি নিষ্ঠুর ; বিভূতিভূষণের প্রকৃতির মধ্যে কোথাও কোথাও নিষ্ঠুরতার ছাপ থাকলেও , আসলে তাঁর প্রকৃতি স্নিগ্ধ প্রকৃতি । হার্ডির ' Egden Health ' নিগূঢ় উপায়ে উপন্যাসের মানব মানবীকে রূঢ় দৈবের হাতে অসহায় রূপে ব্যবহার করেছে ।

আধুনিক কাব্য ইমেজ নির্ঝরে জীবনানন্দ গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় সংযোজন করেছেন। প্রকৃতি ভাবনার দিক থেকে

উভয়ের মধ্যে মিল ও অমিল আছে । জীবনানন্দ তাঁর ' রূপসী বাংলা ' কাব্যে যেমন প্রকৃতির সঙ্গে যুগ যুগান্তের সম্পর্কের কথা সরবে উচ্চারণ করেছেন , বিভূতিভূষণও তেমনি ' অপরাজিত ' উপন্যাসের রাইন নদীর তীরে , নলখাগড়া প্যাপিরাসের বনে ফিরে আসার কথা জানিয়েছেন । জীবনানন্দ প্রকৃতির গভীর প্রদেশে চলে যেতে চান , বিভূতিভূষণ আবেষ্টনের মধ্যে থাকতে চান , প্রকৃতি ভাবনায় জীবনানন্দে বোধ ও বুদ্ধি উভয়েরই প্রাধান্য , বিভূতিভূষণের মধ্যে বোধের , বিভূতিভূষণের প্রকৃতি আনন্দময় , জীবনানন্দের আনন্দ বেদনার যুগপৎ মিশ্রন । জীবনানন্দের প্রকৃতি চিত্ররূপময় , ইন্দ্রিয় নির্ভর , বিভূতি প্রকৃতি চিত্ররূপের সঙ্গে আধ্যাত্মিক ভাবের প্রকাশ মাধ্যম । জীবনানন্দকে প্রকৃতির আলো — অন্ধকার — দুই ই প্রভাবিত করেছিল এবং তিনি প্রকৃতির মারণী শক্তি বা রুক্ষ রূপটির সঙ্গে ভালভাবেই পরিচিত ছিলেন । বিভূতিভূষণ প্রকৃতির রুদ্র রূপটির চিত্র আঁকলেও , সুন্দর ও স্নিগ্ধ রূপটিই তাঁর মন হরণ করেছিল । বিভূতিভূষণ প্রকৃতি লীন কথাশিল্পী । আদিম অরণ্য ফিরে পাবার স্বপ্নে তিনি বিভোর । আরণ্যক রহস্য রসায়িত অরণ্য প্রকৃতির ঐকতান ,

' দেবযানে ' স্বর্গের প্রকৃতি মর্ত্তপ্রকৃতির জন্য ব্যাকুল , ' পথের পাঁচালী ' র বিভূতিভূষণ ' ছায়া সুনিবিড় শান্তির নীড় ছোট ছোট গ্রামগুলি'র নদী নালা , ফল-ফুল , মাঠঘাট , ধানখেত , মানুষজন , পশুপাখি ভালবেসে , ই'ছামতীর লীলা রহস্য উদ্‌ঘাটিত করে , বাঁশের বাঁশিতে মেঠো সুরের সাধনা করেছেন ।

দুই

কালের যাত্রা :-

' হেথা নয় - হেথা নয় ,
অন্যকোথা , অন্যকোনখানে '

বিভূতিভূষণ কালকে দেখেছেন দার্শনিকের চোখে , সমাজতাত্ত্বিকের চোখে নয় । তাঁর রচনায় যে কাল চেতনার পরিচয় পাওয়া যায় , সে কাল তাঁর সম সাময়িক অর্থনৈতিক অথবা সামাজিক সমস্যার দায় বহন করে চলে না । বিভূতিভূষণের রচনায় তাঁর সমকালের চিত্র ততটা নেই । যে কাল অন্তহীন বেগে অনবরত বয়ে চলেছে বিভূতিভূষণ সেই কালেরই পরিচয় দিয়েছেন । তারা-শঙ্করের মত বিভূতিভূষণের কাল ' অর্ধনারীশ্বর ' নয় , বিভূতিভূষণের কাল ' প্রবাহ প্রতিম ' । " তারাশঙ্কর একাল সেকালকে দেখেছেনসম্পূর্ণ ভারতীয় দৃষ্টিতে । কালপ্রতিমা তাঁর কাছে অর্ধনারীশ্বর একথা তিনি নিজেই বলেছেন।

পক্ষান্তরে বিভূতিভূষণের কাল ছিল প্রবাহ প্রতিম "।[৫০]

বিভূতিভূষণ তাঁর সমসাময়িক যুগটার দিকে বিশেষ দৃষ্টিপাত না করে , সময় সমুদ্রের গভীর প্রদেশে ডুব দিয়ে মহাকালের হৃদস্পন্দন অনুভব করেছেন । সাধারণ লেখকের মত তিনি একটি বিশেষ যুগের সামাজিক প্রেক্ষাপট ফুটিয়ে তোলেন নি , শাশ্বত কালের পটভূমিতে সর্বকালিক মানব জীবনের পাঁচালী লিখেছেন । সমালোচক বলেছেন :

" জয়েস , প্রুস্ত , ভার্জিনিয়া উল্‌ফ্ বা কাফ্‌কার মতো এযুগের মানুষের মনের তথা অবচেতনার সূক্ষ্ম জটিলতায় আবর্তিত সময়চেতনাকে প্রতীকী চিত্রকল্প বা সাঙ্কেতিক ব্যঞ্জনায় হয়ত তেমন ভাবে রূপান্বিত করতে পারেন নি বিভূতিভূষণ ,— ' কিংবা রবীন্দ্রনাথের কোন কোন উপন্যাসে গল্পে যে গূঢ় মনস্তত্ব-আশ্রয়ী বা বলতে পারি , আধুনিক জীবন-সচেতন আপাত-অবিন্যস্ত সময়-বিন্যাসের নিপুণ কারুকার্যের রূপায়ণ চোখে পড়ে — সেদিক থেকে বিচার করলে বিভূতিভূষণকে হয়ত অনেকেই ' সনাতনপন্থী ' বলবেন । কিন্তু তবু একথা অবশ্য স্বীকার্য্য যে , তিনি হারানো দিনের জন্য ব্যক্তির সতৃষ্ণ অনুভবের অনুষঙ্গে সময়ের এক অভিনব মাত্রা এবং মহাবিশ্বে মহাকালের

গতিশীল ভাবকল্পনায় এক সুদুর প্রসারী আয়তন যোজনা করেছেন " ।[৫১] যে অন্তহীন পথে মহাকাল বিভূতিভূষণকে আহ্বান করেছে সেই অনন্ত পথের আভাস দিয়েছেন তিনি তাঁর উপন্যাস — গল্পে । বিশ্বের গতি স্রোতের দিকে চেয়ে তাঁর মনে পড়ে নিউটন, কেপলার , হেলস হোলট্জ , শঙ্কর , বরাহ মিহিরের জগতের কথা ।

বিভূতিভূষণের সাহিত্যে বহমান কালের সঙ্গে প্রবহমান মানব জীবনের এক আশ্চর্য সম্পর্ক খুঁজে পাওয়া যায় । ' পথের পাঁচালী ' ' অপরাজিত ' ' আরণ্যক ' ' ইছামতী ' প্রভৃতি উপন্যাসে এবং বিভিন্ন ছোট গল্পে কাল চেতনা এক মুখ্য বিষয় । কালচেতনার আন্তরিক সংবেদন প্রকাশ পেয়েছে ' উপেক্ষিতা ' গল্পে , জীবনের হারিয়ে যাওয়া মুহূর্তগুলি ' চিঠি ' গল্পে অনন্তকালের ব্যঞ্জনা পেয়েছে । ' ভণ্ডুল মামার বাড়ী ' গল্পে ভণ্ডুল মামার অসম্পূর্ণ বাড়ী যেন অন্তহীন সময়ের প্রতীক । ' ইছামতী ' উপন্যাসে ইছামতী নদী আবহমান স্রোতের ভবিষ্যৎ দ্রষ্টা ।

' পথের পাঁচালী ' উপন্যাসে উদাস বাউল বিভূতিভূষণ তাঁর একতারাটিতে কালের নিঃসীম গতি প্রবাহের সুরকেই ধ্বনিত করেছেন । চলমান মহাকালের প্রেক্ষাপটে মানবশিশু

অপুর পথ পরিক্রমনের ইতিবৃত্ত ও চেতনা বিকাশের কাহিনীই পথের পাঁচালী । বিশিষ্ট সমালোচক জিতেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী বলেছেন : " চলমান কালপ্রবাহের সুরই ' পথের পাঁচালী ' র মূল সুর " ।[৫২] শুধু কাল প্রবাহের সুরই নয় , কালের সঙ্গে সঙ্গে , অভিযাত্রিক মানবাত্মার জন্ম-জন্মান্তরের যুগ-যুগান্তরের চলার ছন্দের , চলার প্রেরণার কথা ' পথের পাঁচালী ' । সমালোচকের ভাষায় :

" ' পথের পাঁচালী ' র মধ্যে জীবনের গতি-চেতনাই মুখ্য সুর । জন্ম থেকে শুরু হয়ে জীবনের পথ বেয়ে মৃত্যুর মধ্য দিয়ে জন্ম-জন্মান্তরের বিচিত্র অভিজ্ঞতার পথ অতিক্রম করে মানবাত্মার অভিযাত্রী-রূপ ক্রমবিকশিত হয়ে চলেছে । ' পথের পাঁচালী ' সেই নিত্য - চলমান জীবনের অধিষ্ঠাত্রী পথিক দেবতার বন্দনা গান "।[৫৩] একজন মানুষ শৈশব হতে কৈশোর — যৌবনের পথ হেঁটে কি ভাবে জীবনকে উপভোগ করল , কিভাবে জীবন-স্বাদ অনুভব করল , কি কি অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করল , সেই অভিজ্ঞতার মূল্যই বা তাঁর জীবনে কতটুকু , তারই ইতিহাস রচয়িতা বিভূতিভূষণ ।

পলাতক কালের প্রেক্ষাপটে গতিশীল মানব জীবনের

পর্বান্তরিক বিন্যাস করেছেন । কাল সদা চঞ্চল । কারও জন্য সে থেমে থাকে না । কত বীরুরায় , রামচাঁদ রায় , ইন্দির ঠাকরুণ , দুর্গা , হরিহর , সর্বজয়া , অপু আসে আবার মহাকালের উপেক্ষায় বুদ্‌বুদের মত অনন্তে মিলিয়ে যায় । কালের এই নিরাসক্তি , এই নির্মমতা বিভূতি মনে দুঃখবাদের অবতারণা করেছে :

" কত ভিটায় নতুন গৃহস্থ বসিল , কত জনশূন্য হইয়া গেল , কত গোলক চক্রবর্তী , ব্রজ চক্রবর্তী মরিয়া হাজিয়া গেল , ইছামতীর চলোর্মি-চঞ্চল স্বচ্ছ জলধারা অনন্ত কালপ্রবাহের সঙ্গে পাল্লা দিয়া কুটার মত , ঢেউএর ফেনার মত , গ্রামের নীলকুঠির মত জন্‌সন টম্‌সন সাহেব , কত মজুরদারকে কোথায় ভাসাইয়া লইয়া গেল "।[৫৪] মহাকালের রুদ্রাক্ষের মালা থেকে খসে পড়ছে সময় প্রতিমুহূর্তে ' কায়াহীন বেগে '। শরৎ প্রভাতের শিউলি ফুলের মত ঝরে পড়ে প্রবীনের দল , নবীন প্রাণ আসে নতুন উদ্দীপনা নিয়ে । তারাও ক্রমে পুরানো হয়ে যায় । তখন আগত অথবা অনাগত নবীনের জন্য পথের সঞ্চয় তুলে রেখে তাদেরও চলে যেতে হয় ।

বিভূতিভূষণ বলেছেন :

" আমি শুধু কৌতূহলাক্রান্ত মহাকালের মিছিলে "।[৫৫]

ব্যক্তিগত জীবনেও বিভূতিভূষণের অনাসক্ত ভাব তাঁর কালচেতনায় ধরা পড়েছে । গজেন্দ্র কুমার মিত্র বিভূতিভূষণের অনাসক্ত চিত্তের পরিচয় দিতে গিয়ে বলেছেন : " বিভূতি বাবুর অনাসক্তি এবং উদাসীনতার কথা দিয়ে একটা পুঁথি লেখা যায় । একদিন ওঁর বারাকপুরের বাড়িতে কাগজ-পত্র ঘাঁটতে ঘাঁটতে আবিষ্কার করলুম, তিন-চারখানা বছর-দুই আগেকার চেক পড়ে আছে , তার অঙ্ক সব মিলিয়ে প্রায় দু-হাজার টাকা । জিজ্ঞাসা করলুম ' এ করেছেন কি ? এত গুলো টাকা মাটি ' । তিনি বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করলেন , কেন, ও টাকা আর পাওয়া যাবে না ? যখন সবিনয়ে জানালুম যে সে সম্ভাবনা আর নেই , ব্যাঙ্কের নিয়ম অনুযায়ী এগুলো এখন চোতা কাগজ , তখন একটু অপ্রতিভ মুখে কিছুকাল বসে থেকে চেকগুলো ছিঁড়ে ফেলে দিয়ে নিশ্চিন্ত এবং প্রফুল্ল হলেন । টাকার শোকের চেয়ে নিয়মটা না-জানার লজ্জাতেই বিব্রত বোধ করেছিলেন "।[৫৬]

উত্তর ভারতের ঐতিহাসিক ভগ্নাবশেষের মধ্যে অপু মহাকালের বিরাট শোভাযাত্রা দেখে অভিভূত হয়েছে ।

ব্যাক্তিগত জীবন চেতনাতেও মহাকাল চেতনা বিভূতি মনকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল :

" কালপুরুষ ন'দিদির উঠোনের ওপরেই উঠে এসেছে । আজ যে নক্ষত্র সংস্থান এই কালী পূজোর রাতে , পঞ্চাশ বছর আগেও এমনি উঠত , আমার ঠাকুরদাদা যখন শিশু তখনও এমনি উঠেছে , দুশো বছর আগে যখন শাঁখারি পুকুরের ধারে বর্ধিষ্ণু শাঁখারীর বাস ছিল তখনও এমনি উঠত । আবার পঞ্চাশ বছর কি দুশো বছর পরে ঠিক এমনি দিনে এমনি কালীপূজার রাতে ওরা ন'দিদির বাড়ীর উঠানের ওপরে এমনি উঠবে কিন্তু তখন পাশের বাড়ীর পথটা দিয়ে বিল , বিলের পাশটা দিয়ে খুকুও অমন আসবে না — কে কোথায় চলে যাবে । নতুন দল তখন আসবে পৃথিবীতে তাদের হাসিকান্না প্রেম ভালবাসায় মুখর হয়ে থাকবে গ্রামের বাতাস "।[৫৭]

বিভূতিভূষণ মহাকালের মধ্যে আনন্দময়ের আবিষ্কার করেছেন :

" হে আনন্দময় যুগে যুগে তোমার মহা রহস্যময় জীবনধারা বিজয়ীবৎ বিমৃত্যু বিশোক পথহীন মহাপথ ছেয়ে কত কল্প মন্বন্তর মহাযুগের মধ্যে দিয়ে , শত সহস্র জন্ম

মৃত্যুর মধ্য দিয়ে কোথায় যে ভেসে চলেছে — নিয়েচল নিয়েচল নিয়েচল মহাকালের মহা কলেবরের মধ্য দিয়ে ভাসিয়ে নিয়ে চল "।[৫৮]

পথের পাঁচালী উপন্যাসের নায়ক হল অপু আর অতিনায়ক হল কাল , যে নায়কেরও নিয়ন্তা , এই ধারণার যৌক্তিকতা আছে । জীবন রঙ্গমঞ্চে মানুষেরা কালের হাতের পুতুল মাত্র । কালের কাছে ইন্দির ঠাকরুণের মূল্য কিছুই নয় । অদম্য প্রাণ শক্তির প্রতীক দুর্গা , যাকে মুহূর্ত মাত্রও ভোলা যায় না , তাকেও কাল গ্রাস করল । কালের কাছে দুর্গা , ইন্দির ঠাকরুণ , সর্বজয়া , হরিহর সকলেরই একই মূল্য । অপুর মূল্যে পার্থক্য এটুকু যে তার যাত্রাপথ অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ । কেউ কেউ বলেন যে ' বল্লালী বালাই ' ও অক্রূর সংবাদ ছেঁটে দিলে 'পথের পাঁচালী'র রসহানী হয়না । অভিযোগটি সত্য নয় বলেই মনে করি । ' পথের পাঁচালী ' র উক্ত দুটি অধ্যায় একান্তই মূল্যবান । কাল চেতনার দিক থেকে দেখতে গেলে উক্ত দুটি অধ্যায় কে বাদ দেওয়া যায় না । কালের অতীত রূপ ' বল্লালী বালাই ' অংশে , মধ্যরূপ ' আম আঁটির ভেঁপু ' অংশে , আর ভবিষ্যৎ রূপের আভাষ আছে ' অক্রূর সংবাদ ' এ । নায়ক

অপুর অন্তরালে অতি নায়ক আছে কাল । সেই অতিনায়কের ঈশারায় , সেই পথিক দেবতার আহ্বানে সাড়া দিয়েছে অপু । যাত্রা করার আদেশ যখন তার এসেছে তখন যাত্রীকে যাত্রা ত করতেই হবে ।

' পথের পাঁচালী ' র অপুর কাহিনীকে এক বিচ্ছিন্ন কাহিনী বলা যায় না , তার পেছনে রয়েছে তার পিতৃ — পিতামহের ঐতিহ্য এবং চলমান জীবনের ফলশ্রুতি । একদিকে সুদূর অতীত অন্যদিকে অনাগত ভবিষ্যৎ — এ দুই এর মাঝখানে দাঁড়িয়ে থাকা অপুর বিস্ময় দুদিকে প্রসারিত । তার একদিকে জানা অতলান্তিক মহাসাগর অন্যদিকে দিগন্ত প্রসারিত প্রশান্ত মহাসাগর । ' পথের পাঁচালী ' তে অপুর কাহিনীর আরম্ভও নেই , শেষও নেই । ' পথের পাঁচালী ' থেকে অপরাজিত এবং সেখান থেকে আরও আগে বিস্তৃতি লাভ করেছে । উপন্যাসের পরিশেষে ভবিষ্যৎ বিস্তৃতির আভাষ আছে । জীবনানন্দের মত ঐতিহাসিক ঐতিহ্যের বা কাল চেতনার লিরিক কবি বিভূতিভূষণ ইন্দির ঠাকরুণের জন্ম উল্লেখ করেনি , ১২৪০ সালের ছিপছিপে চেহারার হাস্যময়ী তরুনীর সঙ্গে পঁচাত্তর বছরের বৃদ্ধার রূপের তুলনা করেছেন , যা জীবন ও জগতের প্রতি এক ব্যাপক

বৈরাগ্যের সূচনা করে । " ইন্দির ঠাকরুণের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে নিশ্চিন্দিপুর গ্রামে সেকালের অবসান হইয়া গেল "।[৫৯] উপন্যাসে দেখা যায় মহাকালের প্রেক্ষাপটে মানুষের ক্ষুদ্রজীবন সমুদ্রতটে বালুকণার মত । মানুষের কাছে মানুষ যত প্রিয়ই হোক না কেন , মায়া মমতা যতই গভীর হোক না কেন নিরাসক্ত কালের প্রহরীর কাছে জন্ম মৃত্যু এবং ক্ষুদ্র ইতিহাস পলকের ঘটনা মাত্র। বিভূতিভূষণ সেই পলক গুলিকে অপলক দৃষ্টিতে দেখেছেন । অপু মহাকালের যাত্রাপথে এক পথিক মাত্র । তার যাত্রাপথ ' নব নব পূর্বাচলে আলোকে আলোকে ' । ' পথের পাঁচালী ' এক বিস্ময়গত কাব্য । ভীতি , করুণা , হিংসা এগুলি সঞ্চারী ভাবমাত্র । অনন্ত আকাশ ও বিপুলা পৃথিবীর মাঝখানে দাঁড়িয়ে ক্ষুদ্র মানবশিশু যে রহস্যের গ্রন্থি মোচন করতে পারেনি , কেবল হতবাক হয়ে দেখতে থাকে , লেখক সেই বিস্ময় রসের অবিচ্ছেদ্য অনন্ত অপরিমেয়তাকে দেখিয়েছেন । সেই জন্য ' পথের পাঁচালী ' শেষ হয়েও মনে হয় " ..... হইল না শেষ "। বিশেষের মধ্যে নির্বিশেষের , সীমার মধ্যে অসীমের , নিকটের মধ্যে সুদূরের আর্তি অপুর জীবনের ' পথের পাঁচালী '।

' পথের পাঁচালী ' র শেষ অংশে অপু যখন নিশ্চিন্দিপুর ফেরার জন্য ব্যাকুল হয়ে ভগবানের কাছে প্রার্থনা জানায় তখন পথের দেবতা তাকে স্থিতি নয় , গতির মন্ত্রেই উদ্বুদ্ধ করে বলে : " মূর্খ বালক পথ তো আমার শেষ হয়নি তোমাদের গ্রামের বাঁশের বনে , ঠ্যাঙ্গাড়ে বীরু রায়ের বটতলায় কি ধলচিতের খেয়াঘাটের সীমানায় ? তোমাদের সোনা ডাঙ্গা মাঠ ছাড়িয়ে ; ইছামতী পার হয়ে , পদ্মফুলে ভরা মধুখালি বিলের পাশ কাটিয়ে , বেত্রবতীর খেয়ায় পাড়ি দিয়ে , পথ আমার চলে গেল সামনে , সামনে শুধুই সামনে ..... দেশ ছেড়ে বিদেশের দিকে , সূর্যোদয় ছেড়ে সূর্যাস্তের দিকে , জানার গন্ডী এড়িয়ে অপরিচয়ের উদ্দেশ্যে ..... দিন রাত্রি পার হয়ে , জন্ম মরণ পার হয়ে , মাস , বর্ষ , মন্বন্তর , মহাযুগ পার হয়ে চলে যায় , ... তোমাদের মর্মর জীবন-স্বপ্ন শেওলা-ছাতার দলে ভরে আসে , পথ আমার তখনও ফুরোয় না ..... চলে ..... চলে ..... চলে এগিয়েই চলে ।

অনির্বাণ তার বীণা শোনে শুধু অনন্তকাল আর অনন্ত আকাশ ..... সে পথের বিচিত্র আনন্দ-যাত্রার অদৃশ্য তিলক তোমার ললাটে পরিয়েই তো তোমায় ঘরছাড়া করে

এনেছি ! ------- চল এগিয়ে যাই "।[৬০]

পথের দেবতা তার পথের ব্যাপকতা সম্পর্কে জানিয়ে দিয়ে অপুকে যেন হাত ধরে সেই অনন্ত পথে আহ্বান করেছে । ' পথের পাঁচালী ' র মত ' অপরাজিত ' ও ' পথিক দেবতার বন্দনা গান ' । কালের যাত্রার ধ্বনি শুনে অপু বিভিন্ন তথা বিচিত্র পথে যাত্রা করে চলে । অপুর এই পথচলা নিছক ভ্রমনের নেশাই নয় , তার চেতনা বিকাশের পক্ষেও বটে । ' পথের পাঁচালী ' ও ' অপরাজিত ' আসলে মানবজীবনের চেতনা বিকাশের কাহিনী । ' পথের পাঁচালী ' তে অপুর পথটা কল্প লোকের , ' অপরজিত ' তে তার পথ বাস্তব লোকের । ' পথের পাঁচালী ' অপুর শৈশব জীবনের কাহিনী , জীবন সম্পর্কে সেখানে তার যে কিছুমাত্র ধারনা বা অভিজ্ঞতা হয়নি তা নয় , কিন্তু তার মধ্যে তখন যে শিশুমনের রোমান্সের প্রাধান্য ছিল তাতে জীবনের রূঢ় বাস্তবতাও ঠিক রুঢ় হয়ে ওঠেনি তার কাছে । ' অপরাজিত ' অপুর যৌবনের কাহিনী। জীবন সম্পর্কে এখানে তার অভিজ্ঞতা যুগপৎ আনন্দ ও বেদনার । বাস্তবের তিক্ত অভিজ্ঞতায় এখানে জীবন যেমন নারকীয় , মধুর অভিজ্ঞতায় তেমনি স্বর্গীয়ও বটে । একদিকে তার জীবন

পথে যেমন কাঁটা আছে , অন্যদিকে তেমনি কোমল পুষ্পেরও অভাব নেই । মা , অপর্না , লীলাকে হারানোর ব্যথা ও জীবন সম্পর্কে উদাসীন ভাব , চাকরী জীবনের রূঢ় অভিজ্ঞতা তার মনকে যেমন পীড়িত করে , লীলাদি , রানুদির স্নেহ , কাজলকে আপন করে পাওয়া এবং নিশ্চিন্দিপুরে প্রত্যাবর্তন সেই ব্যথায় প্রলেপ দিয়ে মনকে শান্ত করে ।

বস্তুতঃ ' অপরাজিত ' তেই অপু সচেতন ভাবে পথের দেবতার ডাক শুনতে পেয়েছে । ' Vastness of space and passing time " এর পরিণতি ' অপরাজিত ' তেই পাওয়া যায় । ' পথের পাঁচালী ' তে অপুর পথটা খুব একটা বড় ছিল না , সেখানে তার মন নিশ্চিন্দিপুরের চৌহদ্দীর বাইরে আসলে যেতে পারেনি । (পথের পাঁচালীতে অপু নিশ্চিন্দিপুরকে তার সঙ্গে নিয়েই ঘুরেছে)।

' অপরাজিত ' উপন্যাসে নেপথ্যে নয় , অন্তরে অপু উপলব্ধি করে মহাকালের গতিস্রোত :

" ইছামতী এই চঞ্চল জীবন ধারার প্রতীক । ওর দুপাড় ভরিয়া প্রতি চৈত্র বৈশাখে কত বনকুসুম , গাছপালা ,

Maulana Azad Lib.
Acc. No.....
T-5393

পাখি-পাখালী , গাঁয়ে গাঁয়ে গ্রামের ঘাট -- শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া কত ফুল ঝরিয়া পড়ে , কত পাখির দল আসে যায় , ধারে ধারে কত জেলেরা জাল ফেলে , তীরবর্তী গৃহস্থ বাড়ীতে হাসি-কান্নার লীলাখেলা হয় , কত গৃহস্থ আসে , কত গৃহস্থ যায় ,— কত হাসিমুখ শিশু মায়ের সঙ্গে নাহিতে নামে , আবার বৃদ্ধাবস্থায় তাহাদের নশ্বর দেহের রেণু কলস্বনা ইছামতীর স্রোতোজলে ভাসিয়া যায় — এমন কত মা , কত ছেলে-মেয়ে , তরুণ-তরুণী মহাকালের বীথিপথে আসে যায় — অথচ নদী দেখায় শান্ত , স্নিগ্ধ , ঘরোয়া , নিরীহ ! " [৬১] পথের পাঁচালীর শেষ দিকে যখন অপু নিশ্চিন্দিপুর ফেরার জন্য ব্যাকুল হয়ে ওঠে তখন পথের দেবতা তাকে নিশ্চিন্দিপুরে ফিরিয়ে দেননি ' অপরাজিত ' তে তাকে মনসা পোতায় নিয়ে এসেছে । যদি অপু নিশ্চিন্দিপুরে ফিরে আসতো তাহলে তার মধ্যে আমরা হয়ত মহৎ অতৃপ্তিকে পেতাম না , তার চলিষ্ণু সত্তার পরিচয় পেতাম না । অপরাজিতর পথ অপুর বৃহত্তর জীবনের পথ । এখানে তার মনে সীমাহীনতার স্বপ্ন জাগে । মধ্যপ্রদেশের ঘন অরন্যে অগ্নিকুন্ডের ধারে বসে থাকতে থাকতে শান্ত সনাতন বিশ্বের আড়ালে এক প্রচণ্ড গতিবেগ

অনুভব করে ।

বিভূতিভূষণের কাল চেতনার মধ্যে কয়েকটি বৈশিষ্ট্য চোখে পড়ে : -

(ক) দুঃখবাদী মনোভাব :- সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের চেহারার পরিবর্তনের মধ্যে বিভূতিভূষণের দুঃখবাদী মনের পরিচয় পাওয়া যায় ।

(খ) বিভূতিভূষণের কাল চেতনা — বৃত্তাকার :- ঘুরে ফিরে তিনি একই বিন্দুতে আসেন ।

চঞ্চল কাল কারো দিকে না চেয়ে ছুটে চলেছে আপন খেয়ালে । অপুর চোখের সামনে কালের স্রোতে ভেসে গেল কত প্রিয়জন । অপুরও কি কম পরিবর্তন হল ? শৈশব থেকে কৈশোর , যৌবন এবং সেখান থেকে ' কাজলে ' র মধ্যে অপু যেন ফিরে এলো চির কৈশোরে । বিভূতিভূষণ একেই ' Life force ' বলেছেন । যে পথের দেবতা অপুকে নিশ্চিন্দিপুর থেকে দেশান্তরের পথে বার করে এনেছিল , সেই দেবতাই তাকে কাজল করে নিশ্চিন্দিপুরে ফিরিয়ে নিয়ে এলো ।

' পথের পাঁচালী ' ' অপরাজিত ' তে শুধু গতির কথাই নেই , যতির কথাও আছে । মানব জীবনের দুটো সত্তা

আছে , একটা গতিশীল , আর একটা স্থিতিশীল। অপু মানব মনের গতিশীল সত্তার প্রতীক , ' কাজল ' স্থিতিশীল সত্তার । এই দুটোই সত্য ও স্বীকার্য । রবীন্দ্রনাথের ' বলাকা ' কাব্যে যে গতিবাদী দর্শনের পরিচয় পাওয়া যায় , বিভূতিভূষণের আলোচ্য গ্রন্থগুলিতে তার ছায়াপাত হয়েছে । রবীন্দ্রনাথ যেমন গতি ও স্থিতি উভয়কেই স্বীকার করেছেন , বিভূতিভূষণও সেই পথেরই পথিক ।

ইছামতীর ধারে অপু উপলব্ধি করে যে সে জন্ম জন্মন্তরের পথিক আত্মা , মহাকালের বীথি পথে তার যাত্রা নিত্য নবায়মান ।

অপু যেন মহাকালের মানব সংস্করণ । মূক মহাকাল কথা বলেছে অপুর মধ্য দিয়ে , দেখিয়েছে তার চির চলা। নিশ্চিন্দিপুরে ফিরে এসে অপুর স্থিতিলাভ না করার দুটো কারণ আছে : প্রথম কারণ অপুর মধ্যে মহাকালের চির চলিষ্ণু সত্তার প্রভাব । দ্বিতীয় কারণ অপুর শৈশবের নিশ্চিন্দিপুর তার মন থেকে এখন হারিয়ে গেছে । সে আর নিশ্চিন্দিপুরের শৈশবের স্বপ্নকে খুঁজে পায় না । কাজলের মধ্যেই সে এখন তার শৈশবকে খুঁজে পাবে । কাজল রইল অপু যাত্রা করল অজানার উদ্দেশ্যে । পথের দেবতা বিচিত্র

আনন্দ যাত্রার অদৃশ্য তিলক যার ললাটে পরিয়েছে সে
কেমন করে ঘর বাঁধবে , পথই তো সেই ঘর ছাড়ার ঘর ।

তিন

সীমার মাঝে অসীম তুমি

বিভূতিভূষণের সাহিত্য একই সঙ্গে ঘরোয়া ও ঘরছাড়া । বিভূতি মন একদিকে ঘরের বাঁধন ত্যাগ করতে পারেনি অন্যদিকে এ মন অনন্তমুখী । বিভূতি মনের এই দুই ভাবনাকে সীমা অসীম তত্ত্ব নাম দেওয়া যেতে পারে । হাসি কান্নাভরা , মায়ামমতা মাখানো মর্ত জীবন এবং অনন্ত নীলাকাশ উভয়েরই প্রতি বিভূতি মন আকৃষ্ট হয়েছে । বিভূতি সাহিত্যের একদিকে অপু , জিতু , সত্যচরণ , হাজারি , [redacted] , ভবানী । অন্যদিকে আছে দুর্গা , সর্বজয়া , রাণু প্রভৃতি ।

' পথের পাঁচালী ' উপন্যাসের লাবণ্য স্বরূপ দুর্গার জগৎটা ক্ষুদ্র , সেটা অপুর মত বৃহৎ নয় । প্রকৃতির প্রতি তার আকর্ষণ আছে , কিন্তু প্রকৃতি দেবীর অন্তরের হাতছানি সে পায়না । বনে-জঙ্গলে সে ঘুরে বেড়ায় কিন্তু ফল মূল সংগ্রহ করা ছাড়া কোন কাব্যিক অথবা দার্শনিক

চেতনায় তার মন রঙিন হয়ে ওঠে না , বা সে সেই শক্তিতে সীমাহীনতার স্বপ্নও দেখে না । দুর্গার রোমান্টিক মন নিশ্চিন্দিপুর ও বিবাহ অভিলাষ অতিক্রম করে আর অধিক দূরে যেতে পারেনা । সর্বজয়া সাধারণ বাঙালী গৃহবধূ , যার মন গৃহিণীপনা এবং সাংসারিক চিন্তার চৌহদ্দির বাইরে যেতে পারেনি । ছেলে পুরুতঠাকুর হয়ে জীবন কাটাবে , বিয়ে করে সংসারী হবে – এই স্বপ্নই সে দেখে।

' স্মৃতির রেখা ' গ্রন্থে বিভূতিভূষণ বলেছেন :

" জগতের অসংখ্য আনন্দের ভাণ্ডার উন্মুক্ত আছে । গাছপালা , ফুল , পাখী , উদার মাঠঘাট , সময় , নক্ষত্র , সন্ধ্যা , জ্যোৎস্নারাত্রী , অস্ত সূর্য্যের আলোয় রাঙা নদী তীর , অন্ধকার নক্ষত্রময়ী উদার শূন্য এসব জিনিষ থেকে এমন সব বিপুল , অব্যক্তব্য আনন্দ , অন্তরের উদার মহিমা প্রানে আসতে পারে সহস্র বৎসর ধরে তুচ্ছ জাগতিক বস্ত নিয়ে মত্ত থাকলেও সে বিরাট , অসীম , শান্ত উল্লাসের অস্তিত্ব সম্বন্ধেই কোন জ্ঞান পোঁছয় না । জগতের শতকরা নিরানব্বই জন লোক এ আনন্দের সম্বন্ধে মৃত্যু দিন পর্য্যন্ত অনভিজ্ঞই থেকে যায় – শত বর্ষজীবী হলেও পায় না – অন্যরূপ শিক্ষা , সাহচর্য , আদর্শ যে রূপ আনন্দের পথে

দেখিয়ে দেবার জন্য প্রয়োজন হয় , দুর্ভাগ্য ক্রমে তা সকলের জোটে না ।

সাহিত্যিকদের কাজ হচ্ছে এই আনন্দের বার্তা সাধারণের প্রাণে পৌঁছে দেওয়া । তারা ভগবানের প্রেরণা নিয়ে এই মহতী আনন্দবার্তা , এই অনন্ত জীবনের বাণী শোনাতে জগতে এসেছে , এই কাজ তাদের ত করতে হবেই — তাদের অস্তিত্বের এই শুধু সার্থকতা ---------- "।[৬২]

আনন্দের বার্তাস্বরূপ অনন্তকে বিভূতিভূষণ প্রকাশ করলেন তাঁর সাহিত্যে । এক দিক থেকে বিভূতিভূষণকে রবীন্দ্রনাথের সগোত্র বলা যেতে পারে । রবীন্দ্র সাহিত্যে যে বৃহত্তর জীবন বোধের পরিচয় পাওয়া যায় , বিভূতিভূষণের রচনায় যেন তারই এক অধ্যায় উদ্‌ঘাটিত হয়েছে ।

বিভূতিভূষণের জীবন দৃষ্টি দেশে কালে কোথাও বিচ্ছিন্ন নয় । অনন্তের ভাবনা তাঁর সাহিত্যে ও জীবনের মর্মমূলে জড়িত ছিল সেই অনন্ত জীবনের আশ্বাসে তিনি বলেছিলেন :

" ভয় নেই ব্যাঙ্কে টাকা জমিও না ; অসময়ে দেখবার ভয়ে ব্যাকুল হয়ো না । আমি অনন্ত জীবন তোমাদের জন্য অপেক্ষা করছি । কোন ভয় নেই , পৃথিবীর কোন শান্ত গ্রাম্য

নদীর কূলের চিতায় তোমার হুঁশিয়ার জীবন যখন শেষ হয়ে যাবে সেদিন থেকে এ অসীম শূন্য অনন্ত রহস্য তোমার সম্পত্তি হয়ে দাঁড়াবে । আপনা আপনিই হবে , কোন ব্যাঙ্কে জমাবার কোন প্রয়োজন নেই , জোৎস্না ভালবাস ? ফুল , ফল , পাখী ভালবাস ? গান ভালবাস ? পৃথিবীর ভাগ্য হত ছেলে মেয়েদের করুণ দুঃখের কাহিনী শুনে চোখে জল আসে ? মন ব্যাকুল হয়ে ওঠে ? আর্তের কান্না শুনে অন্যমনস্ক হয়ে যাও ? তবে তুমি অনন্ত জীবনের উত্তরাধিকারী "।[৬৩] ' পবিত্র কারুণ্যের মধ্যে ' দিয়ে আশাহত ব্যর্থতার মধ্য দিয়ে যে ' অনন্তের অনাহত ধ্বনি ' বিভূতিভূষণ শুনেছেন , তিনি সেই ধ্বনিকেই ধরার প্রয়াসী হয়েছেন তাঁর বিভিন্ন রচনার মাধ্যমে । এই বৃহত্তর জীবনবোধ বিভূতি উপন্যাসের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য । যে জীবনবোধ আমাদের প্রাত্যহিক ম্লানস্পর্শ পৃথিবীতে এক অন্য জগতের বার্তা বহন করে নিয়ে আসে এবং আমাদের ' থোড় বড়ি খাড়া , খাড়া বড়ি থোড় ' জীবন প্রনালীর মাঝখানে বৈচিত্র্যের দ্বার খুলে দেয় । পুরুষ চরিত্রেরাই বিভূতি সাহিত্যে অসীম জগতের হাতছানি উপলব্ধি করে , নারী চরিত্রেরা নয় । অপু , জিতু , সত্যচরণ , ভবানী ,

হাজারী , সীমাহীন দেবতার অদৃশ্য উপস্থিতি অনুভব করেছে ।

' পথের পাঁচালী ' রচনাকালে বিভূতি মন যেন অসীমের ভাবেই বিভোর ছিল । বিশাল সমুদ্রের ভাষা বুঝতে পেরে , অনন্ত নীলাকাশের বিরাটত্বে মুগ্ধ হয়ে তিনি সৃষ্টি করতে চাইলেন এমন এক চরিত্র , যে তাঁর মনের এই অনন্তের ভাব ব্যক্ত করতে পারে । বিভূতি মনের সেই অনন্ত ভাবের উন্মেষ মুহূর্তে জন্ম নিল অপু , যে বিভূতি মনের বৃহত্তর ভাবনার অন্যতম রূপকার । অপুর চিন্তার পরশে যেন ভূমি ভূমায় এবং নীড় আকাশে পরিণত হল । ' পথের পাঁচালী ' ও ' অপরাজিত ' গ্রন্থ দুটিতে যেন ভূমিও ভূমা এবং নীড়ও আকাশের [illegible] নীলিমা একধারে ধরা পড়েছে ।

প্রত্যক্ষ জীবনের অন্তরালে যে অসীম জগতের জীবন-জলধি প্রতি মুহূর্তে ভাষাহীন কল্লোলে আলোড়িত , বিভূতিভূষণের ' অপু ' সেই অসীম জগতেরই বার্তাবহ । সে অসীমের প্রতীক । দুর্গা , সর্বজয়া নয় সে , বেঁধে রাখা যায় না তাকে ক্ষুদ্র সংসারের চার দেওয়ালের বেড়ায় । পথে - প্রবাসে , স্থলে-জলে , অরণ্য-প্রান্তরে , যেখানে যত বৈচিত্র্য লুকিয়ে আছে সেখানেই তার অভিযান ।

' দৃষ্টিপ্রদীপ ' উপন্যাসে জিতু যেমন লৌকিক জগতের মধ্যে অলৌকিক জগতের ক্রিয়াকলাপ তার দৃষ্টিপ্রদীপের আলোকে উদ্‌ঘাটিত করেছে , ' পথের পাঁচালী ' ও ' অপরাজিত ' র অপুও তেমনি কখনো শিশুর মুগ্ধ দৃষ্টিতে কখনও পরিণতের পরিণত দৃষ্টিতে বিশ্বরহস্যে মুগ্ধ হয়েছে ও বোঝার চেষ্টা করেছে ।

বিজ্ঞানীর মতই তার কৌতূহল , বিজ্ঞানীর মতই সে জগতের রহস্য উন্মোচনে তৎপর , কবির মতই সে সৌন্দর্য্য পিয়াসী , দার্শনিকের মতই তার দূরদৃষ্টি । ঘরের জানালা থেকে অশ্বত্থগাছ দেখে অপু মনে মনে দূর দেশে হারিয়ে যায় :

" যতবার সে চাহিয়া দেখে , ততবার তাহার যেন অনেক — অনেক — অনেক দূরের কোন দেশের কথা মনে হয় — কোন্ দেশ , এ তাহার ঠিক ধারনা হইত না — কোথায় যেন কোথাকার দেশ — মার মুখে ঐ সব দেশের রাজপুত্তুরদের কথাই সে শোনে "। [৬৪]

বিভূতিভূষণের এই অনন্তের ভাবনা আবার অন্তের মাঝখানে ফিরে আসে । গৃহত্যাগ করলেও তা গৃহের মায়া ত্যাগ করতে পারে না । দূরের জগৎটা অপুকে

আকর্ষণ করে কিন্তু মায়ের জন্য তার মন ব্যাকুল হয়ে ওঠে :

" অনেক দূরের কথায় তাহার শিশু মনে একটা বিস্ময়মাখানো আনন্দের ভাবের সৃষ্টি করিত। নীল রং এর আকাশটা অনেক দূরে , ঘুড়িটা — কুঠির মাঠটা অনেক দূর — সে বুঝাইতে পারিত না , বলিতে পারিত না কাহাকেও , কিন্তু এসব কথায় তাহার মন যেন কোথায় উড়িয়া চলিয়া যাইত — এবং সর্বাপেক্ষা কৌতুকের বিষয় এই যে , অনেক দূরের এই কল্পনা তাহার মনকে অত্যন্ত চাপিয়া তাহাকে যেন কোথায় লইয়া ফেলিয়াছে — ঠিক সেই সময়ের মায়ের জন্য তাহার মন কেমন করিয়া উঠিত , যেখানে সে যাইতেছে সেখানে তাহার মা নাই , অমনি মায়ের কাছে যাইবার জন্য মন আকুল হইয়া পড়িত "। [৬৫]

অপু কুঠির মাঠের পারে মায়ের মুখে শোনা রূপকথার রাজ্য আবিষ্কারের মধ্যে অনন্তের পরশ পায় : " ঐ মাঠের পর ওদিকে বুঝি মায়ের মুখের সেই রূপকথার রাজ্য ? শ্যাম-লঙ্কার দেশে বেঙ্গমা-বেঙ্গমীর গায়ের নীচে , নির্বাসিত রাজপুত্র যেখানে তলোয়ার পাশে রাখিয়া একা শুইয়া রাত কাটায় ? ও-ধারে আর মানুষের

বাস নাই , জগতের শেষ সীমাটাই এই । ইহার পর হইতেই অসম্ভবের দেশ , অজানার দেশ শুরু হইয়াছে "। [৬৬]

অপু অসীম জগতের বার্তাবহ বলেই প্রকৃতির অন্দর মহলে প্রবেশ করতে পেরেছে , প্রকৃতি দেবীর স্নেহের দান সে দুহাত ভরে গ্রহন করেছে । নীলকন্ঠ পাখী দেখার আগ্রহ , বাবার সঙ্গে বিদেশ ভ্রমন , সান্ন্যাল মহাশয়ের গল্প তার অনন্ত ভাবনাকে পুষ্ট করার বিভিন্ন স্তর । বিদ্যাসাগরের " এই সেই জনস্থান মধ্যবর্তী প্রস্রবন গিরি ..... র " কথায় অপুর মন হারিয়ে যায় কোন কাল্পনিক দেশে । পথের দেবতা অপুকে স্থির হতে দেয় না, বার বার পথে আহ্বান করে ।

" পথের দেবতা প্রসন্ন হাসিয়া বলেন — মূর্খ বালক , পথ তো আমার শেষ হয়নি তোমাদের বাঁশের বনে , ঠ্যাঙ্গাড়ে বীরু রায়ের বটতলায় কি ধলচিতের খেয়া ঘাটের সীমানায় ? তোমাদের সোনাডাঙ্গার মাঠ ছাড়িয়ে , ইছামতী পার হয়ে , পদ্মফুলে ভরা মধুখালি বিলের পাশ কাটিয়ে , বেত্রবতীর খেয়ায় পাড়ি দিয়ে পথ আমার চলে গেল , সামনে , সামনে , শুধুই সামনে ..... । দেশ ছেড়ে বিদেশের দিকে , সূর্যোদয় ছেড়ে সূর্যাস্তের দিকে ,

জানার গন্ডী এড়িয়ে অপরিচয়ের উদ্দেশ্যে .....।

দিন রাত্রি পার হয়ে , জন্ম মরণ পার হয়ে , মাস , বর্ষ , মন্বন্তর , মহাযুগ পার হয়ে চলে যায় ..... তোমাদের মর্মর জীবন স্বপ্ন শেওলা ছাতার দলে ভরে আসে , পথ আমার ফুরোয় না ..... চলে ..... চলে ..চলে...এগিয়েই চলে "।[৬৭]

বহমান কালের চিত্রকল্পে বিভূতিভূষণ মানব জীবনের অসীম পিয়াসী মনের পরিচয় দিয়েছেন ।

' পথের পাঁচালী ' উপন্যাসে পথের দেবতা অপুকে বিচিত্র পথের আস্বাদ দিলেও সেখানে তার বৃহত্তর জীবনবোধ কতখানি প্রকাশ পেয়েছে তা ভাববার বিষয় । ' পথের পাঁচালী ' তে অপুর বৃহত্তর জীবন বোধের আভাষ থাকলেও তা ' অপরাজিত ' তেই পূর্ণ আকারে প্রকাশ পেয়েছে । জীবনের বিভিন্ন অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের মধ্য দিয়ে সে বৃহত্তর জীবনের দিকে পা বাড়িয়েছে । পরিচিতের গন্ডী ছাড়িয়ে অপরিচিত দিগন্তের দিকে ডানা মেলেছে । সংসারের কোন বাঁধন তাকে বাঁধতে পারেনি । পারিবারিক বন্ধন তাকে বাঁধতে পারনি , অপত্যস্নেহও তাকে নিশ্চল করতে পারেনি । অপুর ছেলে কাজলও অপুকে সংসারে বাঁধতে

পারেনি, সাধারন মানুষের জীবনে যা বিরল ঘটনা । জন্ম জন্মান্তরের পথিক আত্মা অপু এই পার্থিব জীবনটাকে এক বৃহত্তর জীবনের ভগ্নাংশ মাত্র বলে মনে করে । ইছামতীর তীরে আসন্ন সন্ধ্যায় সে বৃহত্তর জীবনের স্বপ্নই দেখে :

" ছ হাজার বছর আগে হয়ত সে জন্মিয়াছিল প্রাচীন ঈজিপ্টে — সেখানে নলখাগড়া প্যাপিরাসের বনে , নীল নদের রৌদ্রদীপ্ত তটে কোন দরিদ্র ঘরের মা বোন বাপ ভাই বন্ধু বান্ধবদের দলে কবে সে এক মধুর শৈশব কাটাইয়া গিয়াছে — আবার হয়ত জন্ম নিয়াছিল রাইন নদীর ধারে — কর্ক — ওক্ , বার্চ ও বীচ্‌বনের শ্যামল ছায়ায় বনেদী ঘরের প্রাচীন প্রাসাদে , মধ্যযুগের আড়ম্বর — পূর্ণ আবহাওয়ায় , সুন্দর মুখ সখীদের দল । হাজার বছর পর আবার হয়ত সে পৃথিবীতে ফিরিয়া আসিবে — তখন কি মনে পড়িবে এবার-কারের এ জীবনটা ? - কিংবা কে জানে আর হয়ত এ পৃথিবীতে আসিবে না । — ওই যে বটগাছের সারির মাথায় সন্ধ্যার ক্ষীণ প্রথম তারকাটি — ওদের জগতে অজানা জীবন ধারার মধ্যে হয়ত এবার নবজন্ম ! — কতবার যেন সে আসিয়াছে — জন্ম হইতে জন্মান্তরে , মৃত্যুর মধ্য

দিয়া ..... বহুদূরে অতীতে ও ভবিষ্যতে বিস্তৃত সে পথটা যেন বেশ দেখিতে পাইল — কত নিশ্চিন্দিপুর , কত অপর্ণা, কত দুর্গা দিদি — জীবনের ও জন্ম মৃত্যুর বীথিপথ বাহিয়া ক্লান্ত ও আনন্দিত আত্মার সে কি অপরূপ অভিযান — শুধু আনন্দে , যৌবনে , জীবনে পুণ্যে ও দুঃখে, শোকে ও শান্তিতে । ..... এই সবটা লইয়া যে আসল বৃহত্তর জীবন — পৃথিবীর জীবনটুকু যার ক্ষুদ্র ভগ্নাংশ মাত্র — তার স্বপ্ন যে শুধুই কল্পনা বিলাস , এযে হয় তা কে জানে — বৃহত্তর জীবনচক্র কোন দেবতার হাতে আবর্তিত হয় কে জানে ? ..... হয়ত এমন সব প্রাণী আছেন যাঁরা মানুষের মত ছবিতে , — উপন্যাসে , কবিতায় নিজেদের শিল্প সৃষ্টির আকাঙক্ষা পূর্ণ করেন না — তাঁর এক বিশ্ব সৃষ্টি করেন — তার মানুষের সুখে-দুঃখে উত্থানে-পতনে আত্ম প্রকাশ করাই তাঁদের পদ্ধতি — কোন মহান বিবর্তনের জীব তাঁর অচিন্তনীয় কলা-কুশলতাকে গ্রহে গ্রহে নক্ষত্রে নক্ষত্রে এ রকম রূপ দিয়াছেন — কে তাঁকে জানে ? —

একটি অবর্ণনীয় আনন্দে , আশায় , অনুভূতিতে , রহস্যে , মন ভরিয়া উঠিল। প্রাণবন্ত তার আশা , সে অমর ও অনন্ত জীবনের বাণী বনলতার রৌদ্রদগ্ধ শাখাপত্রের

তিক্তগন্ধ আনে — নীল শূন্যে বালি হাঁসের সাঁই সাঁই রব শোনায় । সে জীবনের অধিকার হইতে তাহাকে কাহারও বঞ্চনা করিবার শক্তি নাই — তার মনে হইল সে দীন নয় , দুঃখী নয় , তুচ্ছ নয় — ওটুকু শেষ নয় , এখানে আরম্ভও নয় । সে জন্ম-জন্মান্তরের পথিক আত্মা , দূর হইতে কোন সুদূরের নিত্য নূতন পথহীন পথে তার গতি, এই বিপুল নীল আকাশ , অগণ্য জ্যোতির্লোক , সপ্তর্ষি মণ্ডল , ছায়াপথ , বিশাল অ্যাণ্ড্রোমিডা নীহারিকার জগৎ , বহির্ষদ পিতৃলোক — এই শত সহস্র শতাব্দী , তার পায়ে চলার পথ — তার ও সকলের মৃত্যুদ্বারা অস্পৃষ্ট সে বিরাট জীবনটা নিউটনের মহাসমুদ্রের মত সকলেরই পুরোভাগে অক্ষুণ্ণভাবে বর্তমান — নিঃসীম সময় বাহিয়া সে গতি সারা মানবের যুগে যুগে বাধাহীন হউক "।[৬৮] .....

বিভূতিভূষণের এই বৃহত্তর জীবনবোধ বা অনন্ত চেতনার মধ্যে ব্রহ্মত্তের স্বাদ পাওয়া যায় । তাঁর এই অনুভূতি রোমান্টিকতা থেকে মিষ্টিক চেতনায় পৌঁছানোর অনুভূতি :

" আজকাল নির্জনে বসিলেই তাহার মনে হয় , এই পৃথিবীর একটা আধ্যাত্মিক রূপ আছে , এর ফুলফল

আলোছায়ার মধ্যে জন্মগ্রহন করার দরুণ এবং শৈশব হইতে এর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের বন্ধনে আবদ্ধ থাকার দরুণ এর প্রকৃত রূপটি আমাদের চোখে পড়ে না "।[৬৯] অপু চেতনাস্তরের আর একটা ডাইমেন্সন খুঁজে পেয়েছে , যা তার বৃহত্তর জীবনাভূতিরই অঙ্গ :

" যে-জীবন যে — জগৎকে আমরা প্রতিদিনের কাজকর্মে হাটে-ঘাটে হাতের কাছে পাইতেছি জীবন তাহা নয় , এই কর্মব্যস্ত অগভীর একঘেয়ে জীবনের পিছনে একটি সুন্দর পরিপূর্ণ , আনন্দভরা সৌম্য জীবন লুকানো আছে — সে এক শাশ্বত রহস্যভরা গহন গভীর জীবন-মন্দাকিনী , যাহার গতি কল্প হইতে কল্পান্তরে ; দুঃখকে তাহা করিয়াছে অমৃতত্বের পাথেয় , অশ্রুকে করিয়াছে অনন্ত জীবনের উৎসধারা ....."।[৭০]

জীবন মন্দাকিনীর কল্প কল্পান্তরের গতি দেখে শুধু অপুই নয় , ' দৃষ্টি প্রদীপে ' র জিতু , ' আরণ্যকে ' র সত্যচরণ , ' আদর্শ হিন্দু হোটেলে ' র হাজারিও মুগ্ধ হয়েছে ।

অপু বুঝতে পারে যে এই দৃশ্যমান জগতের পারে আর একটা জগৎ আছে , প্রকৃতি সেই জগতের বার্তা নিয়ে

আসে । পেঁয়াজের এক একটা খোসার মত সেই জগৎটাও যেন আকাশ বাতাস সংসারের আবরনে ঢাকা । অমর-কন্টকের পথে তার মনে সীমাহীনতার চরম উপলব্ধি হয় । বনের গাছপালার মধ্যে , ফুলের সুগন্ধে নব জগতের জন্ম দেয় , ছায়াপথের মত যা দূর বিসর্পিত । তাকে ধরা না গেলেও নীরব জীবন মুহূর্তে তার রহস্যময় প্রসার অনুভূত হয় । দুঃখের নিশীথে অপুর ' প্রাণের আকাশে সত্যের যে নক্ষত্ররাজী ' ফুটে উঠছে তা সে লিপিবদ্ধ করে রাখার সংকল্প করে । কাজলের মধ্যে বিভূতিভূষণ Life foree বা অপরাজিত জীবন রহস্যকে দেখিয়েছেন ।

অপু অতিথি , অনাসক্ত যাযাবর । পথের দেবতা তাকে সীমার মধ্যে রাখেনি । অপুর বাঁধনহারা প্রাণ সংসারের মায়া কাটিয়ে রবীন্দ্রনাথের তারাপদর মতই ' উদাসীন জননী বিশ্ব পৃথিবীর ' ডাকে সাড়া দিয়েছে :

" অপু আবার কোথায় চলিয়া গিয়াছে । হয়ত লীলার মুখের শেষ অনুরোধ রাখিতে কোন্ পোর্তো প্লাতার ডুবো জাহাজের সোনার সন্ধানেই বা বাহির হইয়াছে "।[৭১]

' জীবনেরে কে রাখিতে পারে -
আকাশের প্রতি তারা ডাকিছে তাহারে

তার নিমন্ত্রন লোকে লোকে

নব নব পূর্বাচলে আলোকে আলোকে ' ।

বিভূতিভূষণ তার মনের সীমাহীনতার স্বপ্নকে সাকার করতে গিয়ে অপুকে ঘরছাড়া করেছে এবং সীমার মূল্যকে প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে কাজলকে নিশ্চিন্দিপুরে টেনে এনেছে ।

অপুর মনের একটা দিক অসীম বিশ্বে পাড়ি দিল , আর একটা দিক সীমাকে উপেক্ষা না করতে পেরে কাজলের মধ্যে ধরা দিল , রাণুর মধ্যে যা অপরাজিত জীবন রহস্যের অপূর্ব মহিমায় আত্মপ্রকাশ করেছে ।

চার

শিশুবিশ্ব : শিশুমন

আমাদের অন্তরের মধ্যে আমাদের শৈশব এখনও শুয়ে আছে । যৌবন ও প্রৌঢ় বয়সের জটিল জীবন সংঘর্ষে মাঝে মাঝে যখন হাঁপিয়ে উঠি তখন সেই শৈশবকে বার বার স্মরণ করি । বিভূতিভূষণ তাঁর প্রতিভার জাদুকাঠি স্পর্শে আমাদের অন্তঃস্থিত শিশুর নিদ্রা ভাঙ্গিয়েছেন । বিভূতি সাহিত্যে , শিশুর এক বিশেষ ভূমিকা আছে । বিভূতিভূষণের হৃদয়ে এক চিরশিশু বাস করত । তাঁর মন ছিল শিশুর মতই সরল , শিশুর মতই কৌতূহল পরায়ন ও আত্মভোলা মনের মানুষ ছিলেন তিনি । বিভূতি সাহিত্যে বয়স্ক মানুষের মধ্যেও শিশুমন লুকিয়ে আছে, বয়স্কদের বয়স বাড়লেও তারা শিশু সুলভ ব্যবহার করে । বিভূতি সাহিত্যে বয়স্করাও শৈশবকে পিঠে বহন করে চলে । বিভূতিভূষণের স্বনির্মিত শিশুবিশ্বে বালক বয়স্কে ভেদ নেই , দূরত্ব নেই তারা পরস্পর পরস্পরের বন্ধু । প্রসঙ্গ ক্রমে স্মরণ

করা যেতে পারে অপুও নরোত্তম বাবাজীর পারস্পরিক মুক্ত সম্পর্কের কথা ।

শিশু বিভূতিভূষণের কবি কল্পনাকে বিশেষভাবে উদ্দীপ্ত করেছিল :

" সব ছোট্ট ছোট্ট ছেলে মেয়েগুলি পৃথিবীতে নেমে আসছে , নীল অকূল থেকে পৃথিবীর মাটির তীরে । মুখে তাদের প্রাণকাড়া দুষ্টুমির হাসি , চোখে দেবদূতের সরলতা কোঁকড়া চুলে ঘেরা টুকটুকে মুখগুলি , - সকলেরই হাতে ছোট্ট ছোট্ট সব মশাল । চন্দন কাঠের তৈরী চন্দন কাঠের গুঁড়ো দিয়ে মশলা বাঁধা মশালগুলি জ্বললে গন্ধে দিক আমোদিত করে । ওদের দিকে কেউ চাইছে না বাঁশ বনের অন্ধকার ছায়ায় সারাদিন ওদের কাটল , রাত আসছে , কিন্তু তাদের মশালগুলো কে জ্বালবে ? অনেক লোকে জ্বালতে এলো , কেউ জ্বেলে দিয়ে তাড়াতাড়ি চলে গেল , নিবে যে গেল তা পিছন ফিরে চেয়েও দেখল না । কেউ বহুবার চেষ্টা করেও জ্বালাতে পারল না , কেউ চোখ নীচু করে চেয়েও দেখলে না , যে শিশুদের হাতে মশাল আছে।

অথচ সব সময় শিশুরা অনন্ত নির্ভরপূর্ণ মিনতির

চোখে চেয়ে রয়েছে সকলেরই দিকে , কে তার মশাল জ্বেলে দেবে ? কে সে নিপুন অথচ প্রেমিক মশালচী ?

কত শিশু বুঝতে না পেরে — আশাভঙ্গ হয়ে নিজেদের হাতের মশাল ফেলে দিয়ে , হয়ত যা জ্বলতে পারত অতি সুন্দর , যুগ যুগ ধরে বিশ্বের দিগ্ দিগন্ত যে সৌরভে আকুল হয়ে উঠত , তা অনাদৃত হয়ে পড়ল কাদায় অবোধ শিশুদের বলে দেবার , দেখিয়ে দেবার , মশাল তুলে জ্বেলে দেবার ত কেউ নেই ।

গহন অরণ্যের অন্ধকার বীথি বেয়ে কে একজন আসছে । বাঁশবনের ছায়াস্নিগ্ধ হয়েছে কার সুন্দর মুখের হাসিতে ? তার হাতে মস্ত বড় মশাল , শুভ্র আলোয় সমস্ত অন্ধকার আলো হয়ে গেল এক মুহূর্তে ।

গহনান্ধকার বেণুবীথির অজানা ওপার থেকে সে এসেছে চির রাত্রির অন্ধকার দূর করতে । ভগবানের বিশ্বের সে একজন মশালচী ।

আয়রে , আয় আয় আয় । হাসিমুখে কোঁকড়া চুল দুলিয়ে আলোর জ্যোতিতে আকৃষ্ট হয়ে শিশু পতঙ্গের দল সব ছুটে এলো ওদের ছোট্ট ছোট্ট চন্দন মশলার বাঁধা মশাল । চারধার ঘিরে কাড়াকাড়ি , সবাই আগে চায় ।

কত ধৈর্যের সঙ্গে নতুন মশালচি আলো জ্বালতে লাগলো , যাদের নিবে যাচ্ছিল তাদের বার বার ফুঁ দিয়ে কত অসীম ধৈর্যের সঙ্গে । সকলেরই জ্বলল । ছোট্ট ছোট্ট জ্বলন্ত মশাল হাতে শিশুরা নাচতে নাচতে আনন্দভরা হাসি মুখে অন্ধকার কুঞ্জপথের এদিক ওদিক বেরিয়ে সব চলে গেল । আর কোথাও কেউ নেই । অপর কোন অরণ্যানীর গহন নীরব পুঞ্জীভূত অন্ধকার দূর করতে , অপর কোন অনাগত বংশধরদের হাতের মশাল অমনি করে করে জ্বেলে দিচ্ছে । নিত্যকালের ওরা হল যে মশালচী "।[৭২]

বিভূতিভূষণ কখনো শিশুর সঙ্গে এক হয়ে গেছেন কখনও বা তার দিকে মুগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে থেকেছেন । বিভূতিভূষণের মত আর কোন বাংলা সাহিত্যের ঔপন্যাসিক শিশুকে এতটা গুরুত্ব দিয়েছেন বলে মনে হয়না । লেখক তাঁর দিনলিপিতে বলেছেন : " যে যাই ভাবুক আমি দৃঢ় বিশ্বাস করি — শুধু বিশ্বাস বলে নয় — যেন দেখতেই পাই , হাজার বছর পরে ঐ আমার শৈশব আনন্দভরা ভিটার মত আর কোন দেশে জন্মে অপূর্ব আনন্দভরা শৈশব যাপন করব — পৃথিবীর মায়ের বুকে নতুন হয়ে ফিরে আসব । "[৭৩]

বিভূতি সাহিত্যে শিশু আমাদের হারিয়ে যাওয়া শৈশবের দূত । আমাদের জীবন থেকে যে শৈশব হারিয়ে গেছে , সেই মুছে যাওয়া শৈশব জীবনের স্বপ্নগুলিকে পুনর্জীবিত করেছেন লেখক । শিশু আত্মার উন্নতির সহায়কও । বিভূতিভূষণ শিশুকে দেবতার আসনেও বসিয়েছেন :

" অজস্র পাপ ক্ষুদ্রতা ও লোভে যে পৃথিবী ক্লেদাক্ত তার অনেক ঊর্ধে বিরাট বিশ্বযন্ত্রের লয় --- সঙ্গতির একটা মনোমুগ্ধকর তান এই শিশু "। [৭৪]

' পথের পাঁচালী ' ' অপরাজিত ' মানুষের শৈশব জীবনের ইতিবৃত্ত । আমাদের জীবনের অনাহত ও অমৃত শিশুকেই আমরা উক্ত দুটি গ্রন্থে খুঁজে পেয়েছি।

পথের পাঁচালী উপন্যাসে শিশুর ভূমিকা , সংসারে শিশুর দান কতখানি তা আলোচনা করতে গিয়ে বিভূতিভূষণ বলেছেন :

" মা ছেলেকে স্নেহ দিয়া মানুষ করিয়া তোলে , যুগে যুগে মায়ের গৌরব-গাথা তাই সকল জনমনের বার্তায় ব্যক্ত । কিন্তু শিশু যা মাকে দেয় , তাই কি কম ? সে নিঃস্ব আসে বটে , কিন্তু তার মন-কাড়িয়া-লওয়া হাসি ,

শৈশবতারল্য , চাঁদ ছানিয়াগড়া মুখ , আধ আধ আবোল-তাবোল বকুনির দাম কে দেয় ? ওই তার ঐশ্বর্য্য , ওরই বদলে সে সেবা নেয় , রিক্ত হাতে ভিক্ষুকের মত নেয় না "।[৭৫]

' পথের পাঁচালী ' গ্রন্থে শিশুর ভূমিকা আলোচনা করতে গিয়ে এক বিশিষ্ট সমালোচক বলেছেন :

" ' পথের পাঁচালী ' সারা বইটাই একটি শিশু-লীলার কাব্য "।[৭৬]

' পথের পাঁচালী ' শিশুমনের পাঁচালী ' পথের পাঁচালী ' র কথাকানন শিশু কন্ঠের কলধ্বনিতেই মুখরিত। কবি সমালোচক মোহিতলাল মজুমদারের ভাষায় :

" ' পথের পাঁচালী ' র সেই শুদ্ধসত্ব অপাপবিদ্ধ শিশুনায়কের জীবনলীলা পাঠককেও শিশু করিয়া তোলে "।[৭৭]

গ্রন্থের একদিকে আছে সমস্যাসঙ্কুল বাস্তব জগৎ , সর্বজয়ার হাতে যে জগতের চাবিকাঠি গচ্ছিত , অন্যদিকে রয়েছে শিশুমন নির্মিত রূপকথার অপরূপ রাজপ্রাসাদ , অপু যে প্রাসাদের রাজাধিরাজ ।

বিভূতিভূষণ কুশলী মনোবিজ্ঞানীর মত শিশু

মনস্তত্ত্বের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিশ্লেষন করে তার নির্যাসটুকু পরিবেশন করেছেন । অতিক্রান্ত শৈশবে শৈশব জীবনের এরূপ নিখুঁত ব্যাখ্যা কষ্টসাধ্য বিষয় সন্দেহ নেই , কিন্তু বিভূতিভূষণ সেই কঠিন সাধনাকেই সহজসাধ্য করেছেন । তিনি যেন শিশু হয়ে শিশুলীলা প্রত্যক্ষ করেছেন । ' পথের পাঁচালী ' ' অপরাজিত ' উপন্যাসে শিশুমনের স্বাভাবিক দিকগুলো যেমন তন্ময়ভাব , চঞ্চলতা , নিরাসক্তি , কৌতূহলপরায়নতা প্রভৃতির নিখুঁত পরিচয় দিয়েছেন লেখক। পথের পাঁচালী উপন্যাসে শিশু অনেকেই আছে , অপু , দুর্গা , পটু , লীলা ইত্যাদি । তাদের মধ্যে সবচেয়ে আকর্ষনীয় দুজন শিশু চরিত্র হল অপু ও দুর্গা । এই দুজন শিশু চরিত্রের মধ্যে শিশুমনের বিভিন্ন দুটি সত্তা দেখতে পাওয়া যায় , একটা বাহ্যিক অন্যটি আন্তরিক । দুর্গার মধ্যে শিশু মনের বাহ্যিক রূপটা খুঁজে পাওয়া যায় , সমালোচক যাকে ' চঞ্চল অবাধ্য উদ্দাম ' বলেছেন । অপুর মত রোমান্টিক বিস্ময় তার মধ্যে নেই , জগৎকে দেখে না সে কবির চোখে । দুর্গা সাধারন পল্লী-বালিকা মাত্র, সে বনে জঙ্গলে ঘুরে বেড়ায় , ফলমুল সংগ্রহ করে , নিন্দা গঞ্জনাকে ভ্রূক্ষেপ করে না । দুর্গার মধ্যে অদ্ভুত এক

প্রানশক্তি আছে, যার দ্বারা সে পাঠক হৃদয় জয় করতে পেরেছে । দুর্গা চঞ্চল দুরন্ত , শাসন না মানা বল্গাহীন প্রান । শিশু চরিত্রের বাহ্যিক রূপটা দুর্গার মধ্যে নিখুঁত রূপে ফুটে উঠেছে । শত বাধা নিষেধের গন্ডী এড়িয়ে , বহু আঘাত উপেক্ষা করে , যে শিশুমন আপন প্রানস্ফূর্তিতে , আপন আনন্দে সদামগ্ন দুর্গা সেই চির সবুজ , চির সতেজ , চির সরস শিশুপ্রান ।

অপু নামটি উচ্চারন করলেই মনে পড়ে একটি সুন্দর ফুটফুটে শিশুর কথা । সে নিশ্চিন্দিপুরের মেঠো পথে হাঁটছে কখনো দিদির হাত ধরে , কখনো কঞ্চি হাতে আপন মনে কথা বলে চলেছে । অপূর্ব এক আকর্ষনী শক্তি আছে এই শিশুটির মধ্যে । ' পথের পাঁচালী ' শিশু অপুর বৃন্দাবনী লীলা রহস্যের সাক্ষী । গোপীনীরা না থাকলেও সখীরা তার মন কেড়েছে , তাই ' অক্রূর সংবাদ ' অংশে এ হেন কৃষ্ণের বিদায় মুহূর্তে মাথুর বেদনায় অশ্রু ভারাতুর নিশ্চিন্দিপুর বাহু প্রসারিত করে ' পরান পুত্তলি ' কে ফেরাতে ব্যাকুল ।

এক বিশিষ্ট সমালোচক বিভূতি সাহিত্যে শিশুর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা উল্লেখ করতে গিয়ে বলেছেন :

" শিশুর প্রতি মনোযোগ বিভূতিভূষণের অত্যন্ত বেশি । অন্য কোন বাঙ্গালী ঔপন্যাসিক তাঁদের সাহিত্যে শিশুকে এত গুরুত্ব দেন নি "। [৭৮]

মন্তব্যটি যুক্তিযুক্ত বলেই মনে হয় , বিশেষ করে 'পথের পাঁচালী' সম্পর্কে । এই উপন্যাসে লেখক যেন সমস্যা পীড়িত জগৎ থেকে মুক্তি কামনায় দ্বন্দ্ব বিহীন শিশুর জগতে আশ্রয় নিয়েছেন । অপুর মধ্যে দেখা যায় শিশু সত্তার আভ্যন্তরীন দিকটা যেখানে সে ' স্বপ্নমুগ্ধ বিস্ময় বিহ্বল।' * যেখানে সে বালক কবি বিশ্ব চরাচরের সৌন্দর্য্য শুষে নিতে চায় , যেখানে সে কৌতূহলী বৈজ্ঞানিক , যেখানে সে দার্শনিক। তাই ' বঙ্গ পল্লীর গোষ্পদে দেখে বিশ্ব জীবনের প্রতিবিম্ব '।

তন্ময়তা , চঞ্চলতা , কৌতূহলপরায়নতা , নিরাসক্ত ভাব — এসব শিশু মনের স্বাভাবিক বৃত্তিগুলি যথাযথ রূপে প্রকাশ পেয়েছে অপুর মধ্যে ।

শিশুমন তন্ময় । সে তার ক্ষুদ্র জগতের মধ্যে এমনভাবে নিমগ্ন থাকে যে , বাইরের কোন বিষয় তাকে

---

* গোপিকানাথ রায় চৌধুরীর বিভূতিভূষন : মন ও শিল্প গ্রন্থটি দ্রষ্টব্য ।

আকৃষ্ট করতে পারে না । ' মহারাষ্ট্র জীবন প্রভাত ', ' রাজপুত জীবন সন্ধ্যা' ' পড়তে পড়তে অপু হারিয়ে যায় রাজবারার মরু পর্বতে , দিল্লী আগ্রার রঙ মহালে , শিস্ মহালে । শিশু কোন কিছুকে বিশেষ ভাবে বেশিক্ষন আঁকড়ে ধরে রাখতে পারে না । শিশু মন চঞ্চল , নিরাসক্ত , অপু বন্ধন ভীরু নিয়ম না মানার দলে , অপু নিরাসক্ত ' শিশু ভোলানাথ ' । কখনো সে দিদির সঙ্গে খেলা করে , কখনো যাত্রা দেখার জন্য ব্যাকুল হয় । কখনো লেখাপড়ার বাঁধন থেকে মুক্তি কামনায় ব্যাকুল হয়ে ওঠে । অপু স্বেচ্ছাচারি , স্বাধীন , আপন মনের দাস । মুক্তি ব্যাকুল শিশু চিত্তের নিখুঁত চিত্র অপুর মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে ।

অপুর শিশু হৃদয়ের গোপন প্রদেশে ভয় বলে একটা ভাব বাসা বেধে রয়েছে । শিশু মনস্তত্ত্বের এটা একটা স্বাভাবিক দিক । আতুরী বুড়ীকে দেখে অপু ভয় পেয়ে বলে : " বুড়ি পিসি , আমার মা কাঁদবে , আমায় আজ আর কিছু বোলো না — আমি তোমার গাছে কোনদিন আমড়া নিতে আসিনি — "। [৭৯]

অপু কৌতূহলী বৈজ্ঞানিক , অথবা দার্শনিক । সে সাধারন শিশু হয়েও অসাধারন । বনের খরগোশ অপুর

শিশুচিত্তকে আকর্ষন করে আবার বিস্মিতও করে । বর্ণ পরিচয়ের ' খ ' এ খরগোশ যে এমন জীবন্ত , এমন লাফাতে পারে , ভাঁটগাছ বৈঁচীর ঝোপে ঘোরা ফেরা করে অপু তা দেখে বিস্মিত হয় । অমলার খেলনা অপুর শিশুচিত্তকে যেমন আকর্ষিত করে , তেমনি বিস্মিতও করে : " একটা রবারের বাঁদর , সেটা তুমি যেদিকে যাও , তোমার দিকে চাহিয়া চোখ পিটপিট করিবে — একটা কিসের পুতুল , সেটার পেট টিপিলে দুহাতে মৃগীরোগীর মত হঠাৎ হাত পা ছুঁড়িয়া খঞ্জনী বাজাইতে থাকে — "।[৮০]

নীলকন্ঠ পাখী দেখার আগ্রহ তার কৌতূহলী শিশু মনের এক নিবিড় প্রকাশ । পরিচিত বস্ত জগৎ শিশু মনে এক রোমান্টিক স্বপ্ন জগতে পরিনত হয় । অপুর শিশুমন মাঠের পারে আবিষ্কার করে রূপকথার রাজ্য : " ঐ মাঠের পর ওদিকে বুঝি মায়ের মুখের সেই রূপকথার রাজ্য ? শ্যাম-লঙ্কার দেশে বেঙ্গমা-বেঙ্গমীর গায়ের নীচে , নির্বাসিত রাজপুত্র যেখানে তলোয়ার পাশে রাখিয়া একা শুইয়া রাত কাটায় "?[৮১] শকুনীর ডিম থেকে সে উড়তে চায় , সান্ন্যাল মহাশয়ের গল্প দুর্ভিক্ষের ক্ষুধার আগ্রহে গিলতে চায় ।

মহাভারতের কর্ণার্জুন যুদ্ধ তার অতৃপ্ত শিশু মনকে

তৃপ্ত করতে পারেনা , তাই মনে মনে এক কৃত্রিম যুদ্ধের পরিকল্পনা করে :

" এক একদিন মহাভারতের যুদ্ধের কাহিনী শুনিতে শুনিতে তাহার মনে হয় যুদ্ধ জিনিষটা মহাভারতে বড় কম লেখা আছে । ইহার অভাব পূর্ণ করিবার জন্য এবং আশ মিটাইয়া যুদ্ধ জিনিষটা উপভোগ করিবার জন্য সে এক উপায় বাহির করিয়াছে । একটা বাখারি কিম্বা হাল্কা কোন গাছের ডালকে অস্ত্রস্বরূপ হাতে লইয়া সে বাড়ীর পিছনে বাঁশবাগানের পথে অথবা বাহিরের উঠানে ঘুরিয়া বেড়ায় ও আপন মনে বলে — তারপর দ্রোণ তো একেবারে দশবাণ ছুঁড়লেন , অর্জুন করলেন কি , একেবারে দুশোটা বাণ দিলেন মেরে । তারপর — ওঃ — সেকি যুদ্ধ ! কি যুদ্ধ ! বাণের চোটে চারিদিক অন্ধকার হয়ে গেল !(এখানে সে মনে মনে যতগুলি বার হইলে তাহার আশা মিটে , তাহার কল্পনা করে , যদিও তাহার কল্পনার ধারা মার মুখে কাশীদাসী মহাভারতে বর্ণিত যুদ্ধের প্রনালী সম্বন্ধে যাহা শুনা আছে তাহা অতিক্রম করে না) তারপর-তো অর্জুন করলেন কি , ঢাল তরোয়াল নিয়ে রথ থেকে লাফিয়ে পড়লেন — পরে এই যুদ্ধ । দুর্যোধন এলেন — ভীম এলেন — বাণে বাণে

আকাশ অন্ধকার করে ফেলেচে --- "।[৮২]

সুদূর জগতের হাতছানি পেয়ে অপু ঘুড়ির সঙ্গে উড়ে যেতে চায় --- পরক্ষনেই মায়ের জন্য মন কেঁদে ওঠে , শিশু মনস্তত্ত্বের এটা একটা স্বাভাবিক দিক । বোধ হয় বিভূতিভূষণের মনের মধ্যে সব সময় শিশু চিত্ত সজাগ ছিল , সেই সজাগ শিশুচিত্তের অনুভবে তিনি দশ মাসের শিশু অপুর জীবন্ত বর্ণনা করেছেন । শিশুমন সরল শোভন , সে মনে থাকে না কোন কলুষতা । নির্মল , স্বচ্ছ শিশুমন পরকে সহজেই আপন করে নেয় । অপু ও লীলা আত্মীয় নয় কিন্তু তাদের মধ্যে আত্মার যোগ আছে । ধনী দরিদ্রের ভাব তাদের মধ্যে বাধা হয়ে দাঁড়ায় নি । ' পথের পাঁচালী ' ও ' অপরাজিত ' উপন্যাসে (প্রথম দিকে) অপু লীলা নামে দুটি শিশু একটি সুন্দর শোভনীয় পরিবেশ ফুটিয়ে তুলেছে ।

' পথের পাঁচালী ' উপন্যাসে নিশিন্দিপুরের মুগ্ধকর পরিবেশে অপুর শিশুচিত্ত যতটা সতেজ ছিল ' অপরাজিত ' তে ততটা নেই ' অপরাজিত ' গ্রন্থের প্রথম দিকে অপু শিশু কিন্তু পরে কিশোর যুবক । অপুর পুত্র কাজলের মধ্যে আমরা কৌতূহলী , চঞ্চল শিশুচিত্তের

পরিচয় পাই । বয়স বাড়লেও অপু তার শৈশবকে ত্যাগ করতে পারে নি । ' অপরাজিত ' উপন্যাসে পঁয়ত্রিশ বছরের অপু বিশালাক্ষী দেবীর কাছে তার ফেলে আসা শৈশব জীবনকে ফিরে পেতে প্রার্থনা করে বলে :

" অন্য কিছুই চাইনে , এ গাঁয়ের বনঝোপ , নদী , মাঠ , বাঁশবনের ছায়ায় অবোধ , উদগ্রীব , স্বপ্নময় আমার সেই যে দশ বৎসর বয়সের শৈশবটি-তাকে আর একটি বার ফিরিয়ে দেবে দেবী "?[৮৩]

যে শিশুর মুখে ভাষা ফোটেনি তারাও বিভূতি শিশু বিশ্বের সদস্য । ইছামতীর খোকা আধভাঙ্গা কথা নিয়ে বিভূতি শিশু বিশ্বে উপস্থিত হয়েছে । এতেই বোঝা যায় শিশু সম্পর্কে বিভূতিভূষণের আগ্রহ কতখানি । বিভূতি সমালোচক রমেন্দ্র নাথ মল্লিক বিভূতি সাহিত্যে শিশুর ভূমিকা উল্লেখ করতে গিয়ে বলেছেন : " গ্রাম্য শিশু জীবনকে কেন্দ্র করিয়াই তাঁহার সাহিত্য জগৎ এবং শিশুর মনোজগতের ধীর ক্রম বিকাশের ইতিহাস , শিশুর ও প্রকৃতির মিতালীর ইতিকথা আহরণ করিয়া আনিয়াছে জীবন সম্বন্ধে নূতন ভাষ্য "।[৮৪] কিন্তু শুধু গ্রামের শিশুর কথাই বিভূতিভূষণ বলেন নি , নগরের শিশুও তাঁর সাহিত্য

জগতে উপস্থিত হয়েছে, লীলা নগরের শিশু। অপু গ্রামের হয়েও বিশ্ব জগতের । কোন বিশেষ ভৌগলিক সীমায় তাকে বাঁধা যায় না । বিভূতিভূষণের শিশু চরিত্রের মধ্যে অনেক সময় একটা ভাব লক্ষ্য করা যায় , যে ভাবটা তার শিশু চিত্তে বয়স্ক মনের প্রলেপ দেয় । শিশু অপুর চিন্তা অনেক সময় সমালোচকের চিন্তায় পরিণত হয়েছে । কর্ণ চরিত্রের সমালোচনায় তার মধ্যে বয়স্ক মনের সন্ধান পাওয়া যায় :

" বিজয়ী বীর অর্জুন নহে — যে রাজ্য পাইল , মান পাইল , রথের উপর হইতে বাণ ছুঁড়িয়া বিপন্ন শত্রুকে নাশ করিল ; বিজয়ী কর্ণ — যে মানুষের চিরকালের চোখের জলে জাগিয়া রহিল , মানুষের বেদনায় অনুভুতিতে সহচর হইয়া বিরাজ করিল — সে ।"[৮৫]

অপুর শিশুচিত্তের অন্তরালে বোধ হয় স্বয়ং লেখকের চিত্তের ছায়া পড়েছে তাই স্বাভাবিক ভাবে বয়স্ক মনের রেখাপাত ঘটেছে । কবি সমালোচক কালিদাস রায়ের ভাষায় : " লেখক নিজের স্মৃতিপটে সংরক্ষিত নিজেরই শিশু জীবনের চিন্তা , কল্পনা ও অনুভূতি গুলিকে রূপ দিয়েছেন । "[৮৬]

এও সম্পূর্ণ নয় , বিভূতিভূষণের স্মৃতিপটে সংরক্ষিত নিজের শিশু জীবনেরই নয় , তাঁর বয়স্ক মনেরও ছায়াপাত ঘটেছে ।

হাজার বছর পরে আনন্দভরা শৈশবকে নতুন করে উপলব্ধি করার জন্য , পৃথিবী মায়ের বুকে নতুন করে ফিরে আসবার আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করে বিভূতিভূষণ যে শিশুবিশ্বের সৃষ্টি করলেন সে বিশ্ব নিত্য নতুন । সেই শিশু বিশ্ব আমাদের হারিয়ে যাওয়া শৈশবের মধুর মুহূর্তগুলিকে স্মরণ করিয়ে আমাদের বিচ্ছেদ ব্যথাতুর যক্ষ হৃদয়ের জন্য নব মেঘদূতের বার্তা বহন করে নিয়ে আসে ।

পাঁচ

সমাজতত্ত্ব : সমাজ চেতনা ।

কথা সাহিত্য বাস্তব জীবনের আলেখ্য । কথা সাহিত্যের সঙ্গে সমাজ জীবনের সহজ যোগ আছে । উপন্যাসের মধ্যে সমাজ জীবনের ছবি ফুটে উঠেছে কিনা , সে বিচার এ যুগের সাহিত্য সমালোচনার এক বিশেষ দিক । যে সব লক্ষণ মিলিয়ে সাহিত্যিকের যুগ সচেতনতার পরিমাপ করা যেতে পারে , সে সব লক্ষণ বিভূতিভূষণে প্রায় দুর্লভ বললেই হয় । বিশ শতকের তৃতীয় দশকে বাংলা সাহিত্যে তাঁর প্রবেশ । সে যুগের আলোড়ন মুখর ঘটনাগুলি — মধ্যবিত্ত জীবনের সমস্যা , অর্থনৈতিক মন্দা , বিশ্ব — যুদ্ধ , দেশ বিভাগ প্রভৃতি বিভূতি চিত্তে তেমন ভাবে রঙ ধরাতে পারেনি । শ্রেনী সংগ্রাম , সামন্ততান্ত্রিক , অবক্ষয় , স্বাধীনতা-সংগ্রাম সম্পর্কেও বিভূতিভূষণ প্রায় নির্বাক বললেই হয় । তাহলে কি বিভূতিভূষণ সমাজ সম্পর্কে একেবারেই উদাসীন ছিলেন ? বিভূতিভূষণ মানে

শুধু কি প্রকৃতি ? প্রকৃতির পোষাকে মুড়ে ফেললেই কি তাঁর প্রতিভার সম্যক মূল্যায়ণ হয় ? বিভূতিভূষণ জীবন মুখী সাহিত্যিক ছিলেন , জীবন পলাতক তিনি কখনও নন । তাঁর জীবন বোধ এতই ব্যাপক ছিল যে সাধারনের কাছে তা একপ্রকার অবোধ্য । তিনি গভীর, রহস্যময় মানব জীবনের রহস্য যবনিকা উন্মোচনে আজন্ম নিমগ্ন ছিলেন । ' সাহিত্যিকের কথা ' প্রবন্ধে তিনি জীবন-বিমুখ সাহিত্যিককে ধিক্কার দিয়েছেন :

" যে সাহিত্য টবের ফুল --- দেশের সত্যিকার মাটিতে শিকড় চালিয়ে --- যা রস সঞ্চয় করছে না , দেশের লক্ষ লক্ষ মূক নরনারীর আশা --- আকাঙ্খা , দুঃখ বেদনা যাতে বাণী খুঁজে পেল না , তা হয় রক্তহীন , পাণ্ডুর , থাইসিসের রোগীর মত জীবনের বরে বঞ্চিত , নয়তো সংসার বিরাগী ঊর্ধবাহু , মৌনী , যোগীর মত সাধারন সংসারিক জীবনান্তের বাইরে অবস্থিত । " [৮৭]

সমাজ সম্পর্কে বিভূতিভূষণ উদাসীন ছিলেন না। দিলীপ কুমার রায়ের ভাষায়: " ' পথের পাঁচালী ' র গান হয়ত পথেরই গান কিন্তু এখানে সেখানে সমাজচিত্রও তার মধ্যে ফুটে না উঠে পারে নি ।"[৮৮]

তিনি সমাজকে উপেক্ষা করেন নি । সময় সম্পর্কে তিনি কতখানি সচেতন ছিলেন তার অজস্র দৃষ্টান্ত ছড়িয়ে আছে তার প্রবন্ধ , বক্তৃতা ও দিন লিপিতে । 'অপরাজিত' গ্রন্থে রাজনৈতিক অপরাধে অভিযুক্ত প্রণব , যুদ্ধের বাজারে জিনিষ পত্রের মূল্যবৃদ্ধি প্রভৃতি কয়েকটি বিচ্ছিন্ন বিষয় টুকরো ছবির মত হলেও বলা যায় যে লেখক সময় সচেতন ছিলেন , যদিও গভীরভাবে তিনি এসব বিষয়কে গ্রহন করেন নি। বিভূতিভূষণ বিশ্বাস করেন যে , সমাজ-চেতনা কোন একটি বিশেষ যুগের ঘটনা চিত্রই নয় , মানব জীবনের শাশ্বত সমস্যাই সমাজের মধ্যে রূপলাভ করে । তিনি সমাজ ও মানুষকে দেখেছেন এক ভিন্ন দৃষ্টি ভঙ্গিতে যার ফলে সমাজ চেতনা সম্পর্কে উৎসাহী সমালোচক তাঁর সমাজ সচেতন মনকে ধরতে পারেন নি । বিভূতিভূষণের সমাজ চেতনার দিকটি প্রকাশ করতে গিয়ে এক বিশিষ্ট সমালোচক বলেছেন : " কোন আদর্শবাদী গোষ্ঠির মত বা কোন সমাজ চিন্তকের অভিমতকে সাহিত্যে উচ্চকন্ঠে ঘোষনা করার চেষ্টা তিনি করেন নি । মানুষের জীবন অযুত তল মনিখণ্ড । তার প্রত্যেকটি তলে অসামান্য বর্ণাঢ্যতা , অন্তহীন রহস্য আছে । বিভূতিভূষণ যে তলটির

দিকে দৃষ্টিপাত করেছিলেন একালের সমাজ সচেতন লেখকরা সেই তলটির সম্যক পরিচয় সম্পর্কে অবহিত বা অনুৎসুক , অথবা তাঁদের আদর্শ বা কল্পনা দৃষ্টি প্রতিভাত তল বিশেষকেই তাঁর প্রধানতম বলে মনে করেন । প্রকৃতি রসিক বিশেষণে ভূষিত করে প্রচ্ছন্ন অবজ্ঞার দৃষ্টিতে দেখলে বিভূতিভূষণের প্রতি অবিচার করা হবে । প্রকৃতিকে ভালবাসলেও মানুষের জীবনক্ষেত্রই তাঁর বিহার ভূমি । তিনি মানুষের ছবি এঁকেছেন । মানুষের সমাজের ছাপ তার মধ্যে আছেই । অধুনা প্রচলিত অর্থে সমাজ — চেতনা তাঁর রচনায় তেমন প্রখর ছিল না , কিন্তু মানব চেতনা তাঁর কথা সাহিত্যের প্রাণ । " [৮৯]

সেই সমাজবোধকে বিভূতিভূষণ অনিষ্টকর বলেছেন যা , মানুষের ব্যক্তি বোধকে ক্ষুন্ন করে :

" সেই সমাজবোধ অনিষ্টকর , যা কিনা মানুষের দলবদ্ধ জীবন যাপনের দাবি নিয়ে ব্যক্তি বোধকে ক্ষুণ্ণ করে । " [৯০]

বিভূতিভূষণের মধ্যে যে সমাজবোধ কতখানি ছিল তার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত 'অশনি সংকেত' । পঞ্চাশের মন্বন্তরের পট ভূমিকায় গড়ে উঠা এই উপন্যাসটিতে

বিভূতিভূষণের সমাজ সচেতন মনটি ধরা আছে । চণ্ডীদাস চট্টোপাধ্যায় তাঁর এক প্রবন্ধে বলেছেন :

" ' অশনি সংকেত ' এর গঙ্গাচরন পন্ডিত মশায়ের মতই নাকি বিভূতিভূষণকেও আশ-পাশের গ্রাম ঘুরে চাল সংগ্রহ করতে হয়েছে । অনঙ্গ বৌয়ের মতই বিভূতিভূষণের দ্বিতীয় পত্নীও তখন আসন্ন প্রসবা ছিলেন । অনঙ্গ বৌয়ের চরিত্র সৃষ্টি অবশ্য তাঁর স্ত্রী কল্যানীকে নিয়ে । সে কথা বিভূতিভূষণ নিজেও বলতেন : ' অশনি সংকেত ' বিভূতিভূষণের চোখে দেখা এবং কানে শোনা কাহিনী । " [৯১]

ক্ষুধার যন্ত্রনা যে কত তীব্র তা বোঝা যায় কাপালী বৌয়ের ভাষায় 'নরকে গিয়েও যাতে দুটো খেতি পাই' । ' ইছামতী ' উপন্যাসেও বিভূতিভূষণের সমাজ-সচেতন মনের প্রকাশ ঘটেছে ।

' পথের পাঁচালী ' ' অপরাজিত ' উপন্যাসে বিভূতিভূষণ মানব জীবনের চিরন্তন সমস্যার প্রকাশের মাধ্যমে তাঁর সমাজ সচেতন মনের পরিচয় দিয়েছেন । প্রধানতঃ বাংলার পল্লী আশ্রয়ী মানুষের ভাষাহীন বেদনা কাব্য সুন্দর হয়ে উঠেছে । সমালোচকের ভাষায় :

" মহৎ কথাশিল্পী বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় মুখ্যত প্রকৃতি প্রেমিক হলেও সমাজ চেতনার একটা স্নিগ্ধোজ্জ্বল রূপ প্রকাশ পেয়েছে তাঁর বহুখ্যাত ' পথের পাঁচালী ' ও ' অপরাজিত ' উপন্যাসে । দারিদ্র্যের নিষ্ঠুর নিষ্পেষনে পল্লী কেন্দ্রিক বাংলার ভাষাহীন বেদনা কাব্য সুন্দর দীপ্তিলাভ করেছে । নির্মম কৌলিন্য প্রথার বিষময় প্রভাবে বাঙালী হিন্দু নারী জীবনের ব্যর্থতার চিত্রও অঙ্কিত করেছেন শিল্পী পরম সহানুভূতির সঙ্গে । " [৯২]

একটি নির্দিষ্ট যুগের সমাজচিত্র এখানে প্রকাশিত হয়নি বা লেখক করতেও চাননি , তিনি চিরকালীন সমাজ চিত্রেরই প্রকাশ করেছেন । বিভূতিভূষণের কারবার মুখ্যতঃ গ্রাম্য জীবনকে নিয়েই । ' পথের পাঁচালী ' র সমাজ প্রধানতঃ পল্লী সমাজ , গৌণতঃ নগর সমাজ । লেখক এখানে গ্রাম্য সমাজের যুগ সঞ্চিত দুষ্ট ক্ষতগুলির উপর অঙ্গুলি নির্দেশ করেছেন । কৌলিন্য প্রথার নির্মমতা , সমাজের দৃষ্টিতে নারী পুরুষের ভেদাভেদ , বধূ নির্যাতন, প্রভৃতি সমস্যা - সঙ্কুল দিকগুলিকে যথেষ্ট দক্ষতা ও সহানুভূতির সঙ্গে ফুটিয়ে তুলেছেন ।

কৌলিন্য প্রথা ব্রাহ্মণ নারীর জীবনে এক দুঃস্বপ্নের

অধ্যায় । এ প্রথা এখন সক্রিয় নয় , কিন্তু এক সময় ছিল যখন এই প্রথার বিষময় প্রভাবে ইন্দির ঠাকরুণের মত শত শত বাঙালী হিন্দু নারী জীবনের সাধ ও স্বপ্ন নিঃশোষিত হয়ে যেত । কৌলিন্য প্রথার নিষ্ঠুর চাপে নারীর জীবন যে কত শোচনীয় হতে পারে তার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত ইন্দির ঠাকরুণ । ভাগ্য দেবতা তার প্রতি বিরূপ , তাই যৌবনে হারাল স্বামী । স্বামীকে হারানো বলাও ঠিক নয় , স্বামীকে ত সে পেলই না । ভাই এর সংসারে সে গলগ্রহ । সহ্য করতে হয় ভ্রাতৃজায়ার খোঁটা দেওয়া কথা । এক আত্মীয় স্বজন --- হারা পরিবেশে অসহায় ভাবে ইন্দির ঠাকরুণ বিদায় নিল জগৎ থেকে । মরণে এক ফোঁটা চোখের জল ফেলে এমন কেউ নেই । কোলিন্য প্রথার অন্ধ কালো পাথরের বেদীতে সরল প্রাণের রক্তাক্ত পরিণতি বড় করুণ , বড় বেদনাদায়ক । প্রাগৈতিহাসিক যুগের অন্ধকার সমাচ্ছন্ন পরিবেশ পেরিয়ে মানুষ এখন আধুনিক যুগের আলোয় এসেছে । কিন্তু আলো সত্যই কি আমরা পেয়েছি ? পশু শিকার হয়ত কমেছে , কিন্তু শিকার এখনো কমেনি , বৈষম্যের প্রাচীর আজও সমাজে অভঙ্গুর অবস্থায় বিরাজমান । মনু ঋষি মনু সংহিতায় নারীদের জন্য যে বিধি

বিধান রেখে গেছেন তার ঈষৎ পরিবর্ত্তন হলেও , সে বিধি নিষেধের দুর্গে আজও ফাটল ধরেনি । পুরুষ শাসিত সমাজে নারীর উপর শাসন , বাঁধন ও নির্যাতন চালাতে কোন কার্পণ্য নেই ।

ঊনবিংশ শতাব্দীর নব জাগরনের প্রভাবে বহু মহাপুরুষ ও মনীষীর প্রচেষ্টায় যুগ সঞ্চিত কুসংস্কারের অচলায়তন ভেঙ্গে পড়ল । রাম মোহন বন্ধ করলেন সতীপ্রথা বিদ্যাসাগর বিধবা বিবাহ আইন প্রবর্তন করালেন । সাহিত্যে নারী মুক্তির কথা ঘোষিত হল মধুসূদন , বঙ্কিমচন্দ্র , রবীন্দ্রনাথ , শরৎচন্দ্র প্রমুখ বিখ্যাত সাহিত্যিকদের চরিত্রের মুখে । মধূসূদনের প্রমীলা যেন সমস্ত নারীর প্রতিনিধি হয়ে নারী জাগরনের ঋক্‌মন্ত্র উচ্চারিত করল । বঙ্কিমচন্দ্রের আয়েষা প্রথম অকুন্ঠ চিত্তে প্রকাশ করল রোমান্টিক প্রেম , রবীন্দ্রনাথ অবলা নারীদের সবলার স্বপ্ন দেখালেন । বিধাতার বিরুদ্ধে তাঁর নারী অভিযোগ করে বলল কেন তিনি নারীকে আপন ভাগ্য জয় করার অধিকার থেকে বঞ্চিত করে রেখেছেন ? শরৎচন্দ্র নারীর অশ্রু বেদনাকেই প্রকাশ করলেন । কথা সাহিত্যিক বিভূতিভূষণ তেমন দীপ্তকন্ঠে কিছু বললেন না । তিনি তাঁর

গল্প উপন্যাসে হাল্কা রঙে চিত্রিত করলেন কিছু সামাজিক বৈষম্যের ছবি ।

আমাদের সমাজে স্ত্রী পুরুষের স্থান ও দামের মধ্যে পার্থক্যের সীমারেখাটা আজও মুছে যায়নি । সর্বজয়ার চোখে দুর্গা ও অপু এক হয়েও যেন একনয় । ছেলে মেয়ের স্নেহ সম পরিমানে বর্ষিত হয়না ।

নিক্তির পরিমানে ঝোঁকটা যেদিকে বেশী সেদিকটা অপুর ভাগে পড়ে , দুর্গার ভাগ্যে অপেক্ষাকৃত কম পড়ে । সর্বজয়া তার সমস্ত স্নেহ ভালবাসা অপুর উপর উজাড় করে দেয় , দুর্গা অল্পই পায় । ছেলের শত ত্রুটি মাফ করে সর্বজয়া ; সামান্য অপরাধে মেয়ের উপর শাস্তির দণ্ড বর্ষিত হয় । সর্বজয়া দুর্গার অশান্ত , অবাধ্য আচরনের জন্য যে তাকে শাস্তি দেয় তাই নয় , দুর্গা মেয়ে তাই তার উপর সর্বজয়ার ততটা মায়া মমতা নেই । পুরুষ শাসিত সমাজে নারীর মূল্য বড় কম , নারীর উপর অত্যাচার নারীত্বের অপমান এটা আমাদের সমাজে পরিচিত ঘটনা । গোকুলের স্ত্রী এমনি এক স্নেহ বঞ্চিতা নারী । সে অন্নদা রায়ের পুত্রবধূ । তার স্থান তার সংসারে সবচেয়ে নীচে । গোকুল সামান্য কারনে তার স্ত্রীর গায়ে হাত ওঠাতে চায় , অকথ্য

ভাষায় গালাগালি দেয় , অপমান করে ।

' পথের পাঁচালী ' উপন্যাসে বিভূতিভূষণ পল্লী সমাজের কুসংস্কারাচ্ছন্ন মনের বাস্তবনিষ্ঠ চিত্র ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করেছেন । আতুরী বুড়ী , সঙ্কীর্ন হৃদয় -- পল্লী সমাজের এক অপবাদদুষ্ট নাম । গ্রামের লোকে তাকে ডাইনী অপবাদ দিয়েছে , যার ফলে নিষ্পাপ শিশু মনও তাকে ভয় পায় । আতুরী বুড়ী যে ডাইনি নয় , তার মধ্যেও যে স্নেহ বাৎসল্যের অফুরন্ত ভান্ডার লুকিয়ে থাকতে পারে , তা লেখক দেখিয়ে দিয়েছেন । বিশালাক্ষী দেবীর কাহিনীর মধ্যে বলি প্রথার প্রতি ব্যঙ্গ আছে । পল্লী সমাজের ছাঁদা প্রথারও বর্ণনা করেছেন লেখক ।

শরৎচন্দ্রের -- ' পল্লী-সমাজ ' এ পল্লী সমাজের দলাদলীর যে জটিল চিত্র পাওয়া যায় , বিভূতিভূষনে তা নেই । পল্লীসমাজের রাজনৈতিক দিকটা পথের পাঁচালী উপন্যাসে প্রকাশ পায়নি । এটা হয়ত লেখকের পল্লীজীবন চিত্রনের একটা অপূর্ণতার দিক কিন্তু সেই সঙ্গে এত্ত সত্য যে তিনি জোরাল ভাবধারাকে পছন্দ করতেন না তাই পল্লী সমাজের রাজনীতির দিকটা তাঁর উপন্যাসে ' কাব্যের উপেক্ষিত ' হয়েই থাকল । বিভূতিভূষণের গ্রন্থে গ্রামের

পাঠশালা , জমিদারের অত্যাচারের অমানুষী কাহিনী জীবন্তরূপে ফুটে উঠেছে । তৎকালীন গ্রাম্য সমাজে অন্নদা রায়ের মত এমন অনেক জমিদার ছিল , যারা তমরেজের স্ত্রীর উপর অত্যাচার করতে সামান্য দ্বিধা করত না । নগর সমাজের চিত্র পথের -- পাঁচালীতে খুব একটা নেই । নন্দবাবু নগর সমাজের অসৎ চরিত্রের প্রতিনিধি যে সুযোগ খোঁজে সর্বজয়ার মত নারীর সতীত্ব অপহরণ করতে । ' ছায়া সুনিবিড় শান্তির নীড় ছোট ছোট গ্রামগুলির ' নিস্তরঙ্গ বুকে সমাজ সমস্যার খণ্ড খণ্ড ঢেওয়ের আঘাতে মাঝে মাঝে আন্দোলিত হয়েছে ' পথের পাঁচালী ' র তটভূমি । ' অপরাজিত ' গ্রন্থে অপুর চাকরী সমস্যা ও সন্ধান , কারখানার ধর্মঘট , রাজনৈতিক অপরাধে অভিযুক্ত বিপ্লবী প্রনব প্রভৃতি চিত্রে বিভূতিভূষণের সমাজে সচেতন মনের পরিচয় পাওয়া যায় ।

অর্থনৈতিক , রাজনৈতিক দিকগুলিই জীবনের মুখ্য দিক নয় , বহু বিচিত্র জীবনের যে কোন দিক উদ্‌ঘাটিত হলেই সাহিত্য সৃষ্টি সার্থক হয়ে ওঠে । বিভিন্ন মনোবৈজ্ঞানীকেরা জীবনকে যে ভাবে দেখেছেন তাই শুধু সত্য নয় , বিভূতিভূষণ যে ভাবে জীবনকে দেখেছেন ,

জীবন সমস্যার চিত্র এঁকেছেন তাও সত্য । জীবনকে ফাঁকি দিয়ে কোন স্বপ্ন জগতের ইতিহাস রচনা করতে যাননি তিনি । বাস্তব জীবনের চিত্রই তিনি এঁকেছেন , সে বাস্তবে কবি কল্পনার ছোঁয়া আছে তাই সাধারনের কাছে সেই বাস্তবতায় সন্দেহ দেখা দেয় । সমাজ সমস্যার পরিচয় তিনি দিয়েছেন , সমাজপতির মত সমাজ সমস্যা সমাধানের ভার নেন নি । তাঁর সমাজ চেতনা সাহিত্যিকের দৃষ্টিতে , শিল্পীর দৃষ্টিতে দেখা ও অনুভব করা সমাজ চেতনা । এখানে সমাজ চিত্রটি বিভূতিভূষণ সুকৌশলে ফুটিয়ে তুলেছেন । তার সমাজ চেতনায় উদ্দীপনার ভাব না থাকলেও সমাজ জীবন ও সামাজিক সমস্যার পরিচয় পেতে অসুবিধা হয় না । বিভূতিভূষণের সমাজ জিজ্ঞাসায় মধ্যাহ্ন সূর্যের প্রখরতা না থাকলেও , নিশীথ চন্দ্রের স্নিগ্ধ চন্দ্রিকা অসুলভ নয় ।

ছয়

স্বদেশ প্রীতি : স্বদেশ চেতনা

বিভূতিভূষণের দেশভক্তি উচ্ছ্বাসহীন । তিনি দেশকে সরবে মা মা বলে ডাকেন নি , মনে মনে তিনি দেশকে ভালবেসেছিলেন । হৃদয় মন্দরের গোপন ও অকৃত্রিম ভক্তি দ্বারাই তিনি দেশমাতৃকার উপাসনা করেছেন । পল্লী প্রকৃতি তথা পল্লীর মানুষের সঙ্গে তার দেহমন ওতপ্রোতভাবে যুক্ত ছিল । এক বিশিষ্ট সমালোচকের ভাষায় :

" গ্রাম-বাংলাকে দেহ-মনের যুক্ত অঞ্জলিতে গ্রহণ করেছিলেন বিভূতিভূষণ । ইন্দ্রিয়ের পঞ্চপ্রদীপ জ্বেলে দেখিয়েছিলেন তার রূপ , বরণ করে মনের ঘরে তুলেছিলেন , সাহিত্যের সভায় গেয়েছিলেন তার গান । "[৯৩]

বিশ শতকের তৃতীয় দশকের উত্তেজক মুহূর্তের অনুত্তেজক অনুভবের ফল বিভূতিভূষণের স্বদেশপ্রীতি। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর , বিদ্রোহী কবি নজরুল ইসলামের

রচনায় দেশভক্তির যে বিচিত্ররূপ প্রকাশ পেয়েছে , বঙ্কিমচন্দ্র , প্রভৃতির রচনায় দেশভক্তির যে রৌদ্র রাগিনীর উদাত্ত গম্ভীর সুর শোনা যায় বিভূতিভূষণের রচনায় তা হয়ত নেই, কিন্তু তাঁর হৃদয়েও যে দেশানুরাগ সজীব ছিল তাঁর পল্লীপ্রীতিই তার প্রমাণ। বিভূতিভূষণের দেশ ভক্তির সঙ্গে সুখ্যাত কবি ও নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের দেশ ভক্তির অনেকটা মিল আছে । দ্বিজেন্দ্রলাল রায় যেমন ধন ধান্যে পুষ্পে ভরা বসুন্ধরার মধ্যে স্বপ্ন দিয়ে তৈরী ও স্মৃতি দিয়ে ঘেরা সকল দেশের শ্রেষ্ঠ বঙ্গভূমির প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়েছেন , তেমনি বিভূতিভূষণের অপু নিশ্চিন্দিপুরকেই তার হৃদয়-রাজ্যের সর্বশ্রেষ্ঠ আসনটি দান করেছে ।

বাংলা গ্রাম্য প্রকৃতি ও গ্রামের মানুষের প্রতি বিভূতিভূষণের যে নিবিড় অনুরাগ ছিল তাতেই তাঁর স্বদেশপ্রীতি প্রকাশ পেয়েছে । এক দিকে তিনি যেমন তাঁর দেশের প্রকৃতির রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শে মুগ্ধ হয়েছেন , তেমনি আবার দেশের মানুষের সুখ , দুঃখ , হাসি, কান্না আপন হৃদয়ে অনুভব করেছেন । বিভূতিভূষণের স্বদেশ চিন্তায় মানুষ ও প্রকৃতি মিলে মিশে একাকার ।

' পথের পাঁচালী ' ' অপরাজিত ' উপন্যাসে অপুর

মধ্যে তাঁর জন্মভূমি নিশ্চিন্দিপুরের প্রতি যে নিবিড় অনুরাগ প্রকাশ পেয়েছে তাতেই বিভূতিভূষণের স্বদেশপ্রীতির প্রমান পাওয়া যায় । নিশ্চিন্দিপুর অপুর মনকে এমনভাবে আচ্ছন্ন করে রেখেছে যে তার মত ডাইনামিক চরিত্রও মাঝে মাঝে ষ্ট্যাটিক হয়ে পড়েছে। ' জল বিন্নু মীন যেন কবহুঁ না জীয়ে ' নিশ্চিন্দিপুর বিচ্ছেদে অপুর অবস্থা এমনিই । দুর্গার মৃত্যুর পর কাশী যাত্রার দিনটি যেমন ঘনিয়ে আসতে লাগল : " ততই আসন্ন বিরহের গভীর ব্যথায় তাহার মনের সুরটি করুণ হইয়া বাজিতেছে । " [৯৪] বিপ্রলম্ভের মধ্যেই প্রকাশিত হল দেশানুরাগের প্রানের বানী : " এই তাহাদের বাড়ীর ঘর , ওই বাঁশবন , সল্‌তে-খাগীর আমবাগানটা , নদীর-ধার , দিদির সঙ্গে চড়ুইভাতি করার ওই জায়গাটা --- এসব সে কত ভালবাসে । ওই অমন নারিকেল গাছ কি তাহারা যেখানে যাইতেছে সেখানে আছে ? জ্ঞান হইয়া পর্যন্ত এই নারিকেল গাছ সে এখানে দেখিতেছে , জ্যোৎস্নারাত্রে পাতাগুলি কি সুন্দর দেখায় । সুমুখ জ্যোৎস্নারাত্রে এই দাওয়ায় বসিয়া জ্যোৎস্না --- ঝরা নারিকেল শাখার দিকে চাহিয়া কত রাত্রে দিদির সঙ্গে সে দশ --- পঁচিশ খেলিয়াছে , কতবার মনে হইয়াছে কি সুন্দর

দেশ তাহাদের এই নিশ্চিন্দিপুর ! যেখানে যাইতেছে , সেখানে কি রান্নাঘরের দাওয়ার পাশে বনের ধারে এমন নারিকেল গাছ আছে ? সেখানে কি সে মাছ ধরিতে পারিবে , আম কুড়াইতে পারিবে , নৌকা বাহিতে পারিবে , রেল রেল খেলিতে পারিবে , কদমতলায় সায়েবের ঘাটের মত ঘাট কি সেদেশে আছে ? রাণুদি আছে ? সোনাডাঙার মাঠ আছে ?" [৯৫]

অপুর স্বদেশ তার গ্রাম নিশ্চিন্দিপুর । শৈশবে সে নিশ্চিন্দিপুরের যে ধুলোমাটি গায়ে মেখেছিল , উত্তর জীবনেও তা সে ঝেড়ে ফেলতে পারেনি । পথের দেবতা অপুকে যতই বিচিত্র পথে নিয়ে যাক না কেন নিশ্চিন্দিপুরের মেঠো পথটির কথা সে কখনও ভোলে নি । হরিহরের মৃত্যুর পর ধনীগৃহে স্বাধীনতার অভাবে জন্মভূমির জন্য সে ব্যাকুল হয়ে পড়েছিল । সর্বজয়া যখন সেখান থেকে চলে যাবার কথা বলে তখন প্রথমে সে মায়ের মুখের দিকে আশ্চর্য্য ভাবে চেয়ে থাকে । " পরে হঠাৎ খুশি হইয়া বলিয়া উঠিল — কোথায় মা , নিশ্চিন্দিপুর ? সেই বেশ তো , চলো , আমি সেখানে ঠাকুর পূজো করবো — পৈতেটা তো হয়ে গিয়েছে — নিজেদের দেশ , বেশ হবে —

এখানে আর থাকবে না — "।[৯৬] নিশ্চিন্দিপুর বিচ্ছেদ অপুর পক্ষে অসহনীয় । গভীর ভালবাসা জন্ম দেয় আশঙ্কার , মনে জাগে নেতি বাদী প্রশ্ন : " আর কি কখনও , সে তাহাদের গাঁয়ে ফিরিতে পাইবে না ? — কখনো না ? — কখনো না ?"[৯৭] অপুর স্বপ্নে জাগরণে শুধু নিশ্চিন্দিপুর । তাকে তার গ্রামটি অহোরাত্র আহ্বান করে , ডাক দেয় শাঁখারী পুকুর , ডাক দেয় বাঁশবাগনটা , ডাক দেয় , সোনাডাঙ্গার মাঠ , সায়েবের ঘাট , সোঁদালী বনের পাখী , ডাক দেন বিশালীক্ষী দেবী ।

অপু ভাবতে থাকে :

" এতদিনে তাহাদের সেখানে ইছামতীতে বর্ষার ঢল নামিয়াছে । ঘাটের পথে শিমূল তলায় জল উঠিয়াছে । ঝোপে ঝোপে নাটা-কাঁটা , বন কলমীর ফুল ধরিয়াছে। বন অপরাজিতার নীল ফুলে বনের মাথা ছাওয়া "[৯৮] রবীন্দ্রনাথের ' দুই বিঘা জমি ' কবিতায় জন্মভূমির বিচ্ছেদে উপেনের যে অবস্থা ' পথের পাঁচালী ' র অপুর অবস্থা অনেকটা তারই মত । উপেন যেমন বহু তীর্থ ভ্রমন করার পরেও সুন্দরী জন্মভূমির মায়া কাটিয়ে উঠতে পারেনি জন্ম জন্মান্তরের পথিক আত্মা অপুর স্মৃতিতে তেমনি তার জন্মভূমি

নিশ্চিন্দিপুর চির জাগ্রত । প্রমথ নাথ বিশী বলেছেন : " নিশ্চিন্দিপুর নামে শামুকের খোলাটি হরিহরের পিঠের উপরে বিধাতা অচ্ছেদ্য ভাবে এঁটে দিয়েছেন । ওরা যখন যেখানেই যাক স্মৃতিতে নিশ্চিন্দিপুরকে বহন করে নিয়ে গিয়েছে । " [৯৯]

নিজের গ্রামের প্রকৃতি ও মানুষের দৈনন্দিন দিনলিপি অপুর মুখস্থ হয়ে গেছে । রাজু কাকার অবেলার স্নান , অক্রূর মাঝির মাছ ধরার তোড়জোড় , ঠাকুরঝি পুকুরের বট গাছটার পেছনে দিগন্তের কোলে রাঙা আগুনের ফেনার মত সূর্য অস্ত যাওয়া , পটু , নীলু , তিলু , ভোলার কথা , মিষ্টি নিঃশব্দে শান্ত বিকেলে পাঁচিলের উপরের কঞ্চির ডগাটাতে বসে থাকা হলদে পাখীটার কথা , মায়ের হাতে পোঁতা লেবু চারাটা সমস্তই অপুর স্মৃতিতে চির জাগরুক । নিশ্চিন্দিপুরই অপুর জীবন ; এই গ্রামটিকে শত সহস্রবার দেখেও তার যেন দেখার তৃষ্ণা মেটে নি :

" জনম অবধি হাম রূপ নেহারনু
নয়ন না তিরপিত ভেল "

বিধাতার কোন অভিশাপে যে সে আজ গ্রাম থেকে নির্বাসিত তা সে ভেবেই পায় না । নিশ্চিন্দিপুরের জন্য বারবার

মনটা কেঁদে ওঠে । ঈশ্বরের কাছে মিলনের প্রার্থনা করে :

" আমাদের যেন নিশ্চিন্দিপুর ফেরা হয় — ভগবান — তুমি এই করো ঠিক যেন নিশ্চিন্দিপুর যাওয়া হয় —নৈলে বাঁচবো না — পায়ে পড়ি তোমার — "[১০০]

বহুদিন পর নিশ্চিন্দিপুর ফেরার মুহূর্তে পদ্মবনে ভরা মধুখালি বিল , সোনাডাঙার স্বপ্ন মাখানো মাঠটা , অপরাহ্নের মন মাতানো রূপ দেখে তার মন ভরে উঠল ।

" বেলা পড়িয়া আসিয়াছে এমন সময়ে পথটা সোনাডাঙ্গা মাঠের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িল — পাশেই মধুখালির বিল — পদ্মবনে ভরিয়া আছে । এই সেই অপূর্ব সৌন্দর্যভূমি , সোনাডাঙার স্বপ্ন মাখানো মাঠটা — মনে হইল এত জায়গায় তো বেড়াইল , এমন অপরূপ মাঠ ও বন কই কোথাও তো দেখে নাই ! সেই বনঝোপ , ঢিবি , বন , ফুলে ভর্তি বাব্‌লা — বৈকালের একি অপূর্ব রূপ ।"[১০১] অপুর স্বদেশ নিশ্চিন্দিপুর অপুর মনকে আশ্চর্যভাবে সম্মোহিত করে রেখেছে । নিশ্চিন্দিপুর সম্পর্কে তার মনের কথা :

' এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি ,
সকল দেশের রানী সে যে আমার জন্মভূমি । '

শান্তি রসাশ্রিত দেশ ভক্তিই বিভূতিভূষণের দেশভক্তি । তিনি ধৈর্যের সাধক , অধৈর্যের নন । যে ভক্তি অধৈর্য ভাবোন্মাদ মত্ততায় মুহূর্তেই বিহ্বল হয়ে পড়ে সেই ' উদ্ভ্রান্ত উচ্ছল যেন ভক্তি মদধারা ' কে উপেক্ষা করে উচ্ছ্বাসহীন ভক্তি তিনি কামনা করেন ।

' দাও ভক্তি শান্তিরস
স্নিগ্ধ সুধা পূর্ণ করি মঙ্গল কলস
সংসার ভবন দ্বারে । '

সাত

মৃত্যু - চেতনা

জীবন জিজ্ঞাসা শুধুমাত্র প্রাণ মনের সীমানায় সীমাবদ্ধ নয় , প্রাণ মনকে অতিক্রম করে মৃত্যু-চেতনায় যখন এই জিজ্ঞাসা এগিয়ে যায় তখন তার অবসান ঘটে । বিভূতিভূষণ মৃত্যুকে দেখেছেন অভয় মূর্তিতে । মৃত্যু-চেতনা তাঁর জীবনানুরক্তিরই আর একটি দিক ; মৃত্যু তাঁর কাছে বিভীষিকা নয় , বরং তাঁর চিত্তের আনন্দ অনুভবের একটা দিক । তিনি বিশ্বাস করেন যে মৃত্যুর সিংহদ্বার দিয়েই জন্মের জয়যাত্রা । তাই শঙ্কার কথা উঠতেই পারে না ।

" অনুভূতির প্রথম কথা হোল — মনের মধ্যে কে যেন বলে উঠলো — অভীঃ , ভয় নেই । কিসের ভয় নেই ? কোন কিছুরই না । ' ন মৃত্যু র্ণ শঙ্কা ' । ভগবান যুগ যুগান্তর কল্প থেকে কল্পান্তর আমার ও তোমার হাত ধরে চলেছে , আনন্দ ও প্রেমের স্নিগ্ধ ধারার মধ্যে দিয়ে । সকল

জন্ম মরণ পার করে তিনি নিয়ে চলেছেন । জরা নেই, মৃত্যু নেই । ..... জীবের ভয় কি ? অবিনশ্বর তুমি , অবিনশ্বর আমি --- আমরা ভগবানের চিরদিনের লীলা সহচর , ভগবানও চিরদিন আমাদের লীলা সহচর। " [১০২]

বিভূতিভূষণের মৃত্যু চেতনা জীবন চেতনারই অংশ । তা যদি না হোত তাহলে মৃত্যু বর্ণনাতেও এত সংযমী ভাব কেন ? হারানোর যন্ত্রনা নেই , বিচ্ছেদেও এত শান্তি ও সান্ত্বনা কেমন করেই বা জাগে ? বিভূতিভূষণ রবীন্দ্রনাথের মতই বিশ্বাস করেন ।

' আছে দুঃখ , আছে মৃত্যু ,
বিরহ দহন লাগে ,
তবুও শান্তি , তবু আনন্দ ,
তবু অনন্ত জাগে । '

বিভূতিভূষণের মতে মৃত্যু করুণ রসের আকর নয় , যতি জীবনের প্রসারণের উপাদান: " মৃত্যু করুণ রসে ভারাতুর করে তোলেনি আখ্যান , বরং মৃত্যুর যতি জীবনের গতিকেই অবারিত করে দিয়েছে বার বার ।" [১০৩] প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যেতে পারে দুর্গার মৃত্যুর বর্ণনা । দুর্গার মৃত্যু ভাবতেই হৃদয় রিক্ত হয়ে যায় , চোখ দুটো হয়

অশ্রু ভারাতুর । কিন্তু কি বিস্ময়কর শক্তিতে লেখক হৃদয়ের বাঁধ ভাঙ্গা বেদনার উচ্ছ্বাসকে সংযমিত করে অদ্ভুত নিরাসক্তির পরিচয় দিয়েছেন : " দুর্গা আর চাহিল না । আকাশের নীল আস্তরণ ভেদ করিয়া মাঝে মাঝে অনন্তের হাতছানি আসে — পৃথিবীর বুক থেকে ছেলে মেয়েরা চঞ্চল হইয়া ছুটিয়া গিয়া অনন্ত নীলিমার মধ্যে ডুবিয়া নিজেদের হারাইয়া ফেলে — পরিচিত ও গতানুগতিক পথের বহুদূরপারে কোন পথহীন পথে — দুর্গার অশান্ত , চঞ্চল প্রানের বেলায় জীবনের সেই সর্বাপেক্ষা বড় অজানার ডাক আসিয়া পৌঁচিয়াছে । " [১০৪]

ইন্দির ঠাকরুণের মৃত্যু বর্ণনাতেও সেই একই মনোভাব ' ইন্দির ঠাকরুণের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে নিশ্চিন্দিপুর গ্রামে সেকালের অবসান হইয়া গেল ' । কবি কীটসের মতই বিভূতিভূষণ মনে করেন

' Death is lifes high need

Death is crown of life '

এই বিশ্বাস বিভূতি চিত্তকে বেদনা -- বিধুর না করে সংযমী করেছে । বিভূতিভূষণের রচনায় মৃত্যু চেতনার প্রকাশ অনেক স্থানে দেখা যায় । ' দেবযানে ' র মৃত্যু ও

পরলোকতত্ত্ব সতন্ত্রভাবে আলোচনার বিষয় । ' দেবযান ' উপন্যাসটি বৌদ্ধধর্মের জন্মান্তর বাদের উপর প্রতিষ্ঠিত। অন্যত্র বিভূতি সাহিত্যে মৃত্যু উদাস করুণ মুহূর্তেরও জন্ম দিয়েছে । সর্বজয়া , অপর্ণা , দুর্গাকে হারিয়ে অপুর হৃদয় রিক্ত হয়ে গেছে । কিন্তু এখানে তাঁর মৃত্যু চেতনার বৈশিষ্ট্য নেই । বৈশিষ্ট্য সেখানে , যেখানে মৃত্যুর অন্তরে প্রবেশ করে তিনি অমৃতের সন্ধান পেয়েছেন । সর্বজয়ার মৃত্যু বর্ণনায় মৃত্যুর সেই অমৃত রূপের আভাষ আছে । সর্বজয়ার কাছে প্রথমে মৃত্যুর আবির্ভাব ভয় রূপে । তখন তার রূপ নেংটী ইঁদুরের মত । কিন্তু কিছুক্ষণ পরে মৃত্যুদূত তার কাছে উপস্থিত হয়েছে মনোহর রূপে । তখন বেদনা নেই , চোখে জলও নেই , মনে এক অদ্ভুত ভাব জাগে : যখন ছেলের বেশে মৃত্যু এসেছে তখন কোন মা তাকে ভয় পাবে ? কেমন করেই বা তাকে দূরে ঠেলে দেবে ?

" বুঝি মৃত্যু আসিয়াছে । ..... কিন্তু তার ছেলের বেশে , তাকে আদর করিয়া আগু বাড়াইয়া লইতে ..... এতই সুন্দর ..... কি হাসি ! ..... কি মিষ্টি হাসি ওর মুখের ! ..... " [১০৫]

রবীন্দ্র সাহিত্যে মৃত্যু নতুন সম্ভাবনার প্রতীক তিনি

মৃত্যুকে দেখেছেন নতুন ঊষার স্বর্ণদ্বার রূপে । তার কাছে মৃত্যু কখনো শ্যাম , কখনো প্রিয় , বিভূতিভূষণের কাছে মৃত্যু সুন্দর ও অভয় রূপে প্রকাশ পেয়েছে ।

আট

মানব প্রীতি : মানব সঙ্গম

বিভূতিভূষণ মানে শুধু প্রকৃতিই নয় । প্রকৃতির মোড়কে মুড়ে ফেললেই বিভূতি প্রতিভার সম্যক মূল্যায়ন হয় না , বরং তাঁকে ছোট করে দেখা হয় । প্রকৃতি তাঁর উপন্যাসে গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে একথা সত্য , কিন্তু তিনি মানব জীবনকে উপেক্ষা ত করেনই নি , উপরন্তু বলা যায় যে মানব মহিমাকে উজ্জ্বল করার জন্যেই তিনি প্রকৃতির প্রেক্ষাপট রচনা করেছেন । ধূলি মলিন পৃথিবীর মানব সন্তান বিভূতিভূষণ মানব জীবনকে বাদ দিয়ে , স্বপ্নজগতের ইতিহাস লিখতে যান নি , মর্ত-মানুষের কামনা বাসনার কলরবকেই শুনিয়েছেন ।

বিভূতিভূষণ প্রকৃতি প্রেমিক কিন্তু জীবন পলাতক নয় । তিনি তাঁর গল্প উপন্যাসের মাধ্যমে মানব মহিমার নতুন ও মহৎ মূল্য বোধ আরোপ করেছেন । সমালোচকের ভাষায় :

" বিভূতিভূষণ ছিলেন খাঁটি মানুষ , মানুষের মনুষ্যত্ব বলতে যে খাঁটি জিনিষটুকুকে বোঝায় , ঠিক সেই জিনিষটুকুতেই তিনি ছিলেন একেবারে খাঁটি , তাই তাঁর জীবনের ক্ষেত্রেও যেমন সাহিত্যের ক্ষেত্রেও তেমনি কোন ভেজাল দেওয়ার প্রয়োজন হয়নি ।

মনুষ্য জীবন জটিল ও বহুমুখি , মানব মন তাই স্বভাবতই চিন্তা ভারাক্রান্ত , সমস্যা সঙ্কুল । মানব জীবনে তাই অন্তর্দ্বন্দ্ব ও বিকারের অন্ত নেই । এই সব কারণেই মানব মনের আত্ম সমীক্ষারও প্রয়োজন হয় । মানুষের অন্তর্জ্বালা ব্যক্ত করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ এক জায়গায় বলেছেন , -

" জানো কি তোমার ধরা ভূমি
পীড়ায় পীড়িত আজি , ফিরিতেছে
এপাশ ওপাশ ?
চক্ষে বহে অশ্রুধারা , ঘন ঘন বহে ওঠে শ্বাস !
নাহি জানে কী যে চায় , নাহি জানে কি সে ঘুচে তৃষ্ণা
বিকারের মরীচিকা --- জালে "

মানব মনের এই মনস্তাত্ত্বিক জটিলতার জন্যেই , জীবন রহস্যের জটিলতার জাল ছিন্ন করবার জন্যই আত্ম

সমীক্ষার বিশেষ প্রয়োজন আছে ।

আত্ম সমীক্ষার দ্বারাই মানুষ নিজেকে জানতে ও বুঝতে শেখে । উপনিষদ তাই বলে ' আত্মাং বিদ্ধি ' --- আত্মাকে জান --- ' Know thy self '- এই সনাতন বাণীই হলো আত্ম সমীক্ষার মূল মন্ত্র । সাধারন মানুষ বড় বেশী বার মুখো , আর তাই তাদের উদ্‌ভ্রান্তিরও শেষ নেই । এই উদ্‌ভ্রান্তির হাত থেকে পরিত্রাণ পেতে হলে চাই অন্তর্মুখী আত্ম সমীক্ষা । আমরা সত্যিকারের কি চাই , তা যদি আমরা আমাদের মনের গভীরে অবগাহন করে খুঁজে নিতে পারি , তাহলে আর কোন উদ্‌ভ্রান্তি থাকে না। কি সাহিত্যিক বা কি কবি — সকলের ক্ষেত্রেই আত্ম সমীক্ষা একটি বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করে । যে কবি যতো বড় আত্ম সমীক্ষক , সে কবি ততো বড় খাঁটি সাহিত্যিক। এই বিচারে বিভূতিভূষণ একজন আত্ম সমীক্ষক , বড়ো সাহিত্য সমীক্ষক । বাংলা সাহিত্যে সমীক্ষক তথা আত্ম সমীক্ষক আর কেউ আছেন কিনা সন্দেহ । ' পথের পাঁচালী ' র ' অপু ' চরিত্রের গভীরে যাঁরা প্রবেশ করতে পারবেন , তাঁরাই এই কথাটির গুরুত্ব বুঝতে পারবেন ।

বিভূতিভূষণের জীবন — চেতনার মধ্যে কোন ফাঁক

ছিল না , ছিল না কোন অসম্পূর্ণতা । আত্ম সমীক্ষার সমীক্ষা ধারায় তিনি উপলব্ধি করেছিলেন — আধ্যাত্মিক জীবন , মানব জীবন ও প্রকৃতি জীবন — এই ত্রিবিধ জীবনের সমন্বয়েই একটি পরিপূর্ণ তথা সুস্থ সুন্দর জীবন গড়ে ওঠে । জীবনের সমগ্রতা লাভ করতে হলে এই তিনেরই প্রয়োজন আছে । বিভূতি সাহিত্য সমালোচকের ভাষায় বলতে গেলে বলা যায় ,

" সমগ্র জীবন ধারার মধ্যে তিনি একটা সুষম সঙ্গতি ও ছন্দ আবিষ্কার করতে পেরেছিলেন । তাই পল্লী-জীবনের তুচ্ছ হাসি কান্নার কাহিনী থেকে বিশ্বেতিহাসের বিরাট পতন অভ্যুদয়ের কাহিনী পর্য্যন্ত , হাস্যকর গ্রাম্য কুসংস্কার থেকে ব্রহ্মোপলব্ধির তূরীয় অনুভূতি পর্যন্ত সব কিছুকেই অনায়াসে এই জীবন বৃন্তের অন্তর্ভুক্ত করে নিতে পেরেছিলেন । হ্যাঁ , এখানেই মানুষ বিভূতিভূষণের কৃতিত্ব , সাহিত্যিক বিভূতিভূষণের সার্থকতা । "[১০৬]

বিভূতি জীবনীকার যমুনা বন্দোপাধ্যায়ের ভাষায় " মানুষের আন্তরিকতার মর্যাদাকে তিনি উপেক্ষা করেন নি । মানুষের প্রতি তাঁর অসীম প্রীতি ছিল । ছোট বড় সবার সঙ্গে মিশতেন তাদের পরম আত্মীয়ের মত । "[১০৭]

মানব জীবনের প্রতি তাঁর নিবিড় অনুরাগ ছিল : " সৃষ্টি আছে , চন্দ্র আছে , অসীম বস্ত শিশুগুলো আছে — কিন্তু মানুষ যদি না থাকতো , তবে কিছুই না । মানুষ আছে বলেই এই সৃষ্টির শ্রেষ্ঠত্ব , সুখের দুঃখের আনন্দ উৎস । অজানা গ্রহে নক্ষত্রে কি আছে জানি না , কিন্তু মনে হয় সে সব স্থান মরুভূমি নয় — তরুণ মুখের হাসি-কান্নায় , সে সব অজানা দূরের জগতও জাগ্রত প্রাণস্পন্দনে ভরা , সেখানেও বিচিত্র সন্ধ্যাকালে বিচিত্র বন-পর্বতের নির্জনতায় বিরহী একা বসে প্রিয়ার কথা ভাবে , মা-হারানো ছেলের স্মৃতিতে চোখের জল ফেলেন । দেশ কর্তারা বড় বড় কাজ করেন , বড় বড় যুদ্ধ বিগ্রহ হয় ।

এই পৃথিবীতে এই মানুষের মনের সুখ দুঃখ নিয়েই ভগবানের অপূর্ব কাব্য। " [১০৮]

বিভূতি সাহিত্যে দেবতারও যাতায়াত মানুষের পথ দিয়ে । এমন কি দেবতার অস্তিত্বও মানুষ আছে বলেই । ' দৃষ্টি প্রদীপ ' উপন্যাসের নায়ক জিতু অনুভব করেছে যে তার দেবতার পথ " ওই পিঙ্গল ও পাটল বর্ণের মেঘ পর্বতের ওপরে কোন অজানা নক্ষত্রপুরীর দিকে নয় , তাঁর পথ --- আমি যেখান দিয়ে হাঁটছি , ওই কালু গাড়োয়ান যে

পথ দিয়ে গাড়ী চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছে — এপথেও । আমার এই পথে আমার সঙ্গে পা ফেলে তিনি বলেছেন এই মুহূর্তে — আমি আছি তাই তিনি আছেন ।" [১০৯] রবীন্দ্রনাথ তার গীতাঞ্জলি কাব্যে প্রায় অনুরূপ উক্তি করেছেন :

" তাই তোমার আনন্দ আমার পর ,
তুমি তাই এসেছ নীচে —
আমায় নইলে , ত্রিভুবনেশ্বর
তোমার প্রেম হত যে মিছে ।"

' আরণ্যক ' এ নিসর্গ সৌন্দর্যের সঙ্গে মানবপ্রীতির সুর ধ্বনিত হয়েছে :

" শুধু বন প্রান্তর নয় , কত ধরনের মানুষ দেখিয়াছিলাম । ..... কত অতি দরিদ্র বালক বালিকা , নরনারী , কত দুর্দান্ত প্রকৃতির মহাজন , গায়ক , কাঠুরে ভিখারীর জীবন যাত্রার সঙ্গে পরিচয় হইয়াছিল । " [১১০]

উপন্যাসের সমাপ্তি মানবপ্রীতির নিবিড় রসানুভূতিতে ভরা :

" মনে হয় কেমন আছে কুন্তা , কত বড় হইয়া উঠিয়াছে সুরতিয়া , মুটুক নাথের টোল আজও আছে কিনা , ভানুমতী তাহাদের সেই শৈল বেষ্টিত অরণ্য ভূমিতে

কী করিতেছে , রাখাল বাবুর স্ত্রী ধ্রুবা , গিরিধারী লাল , কে জানে এতকাল পরে কে কেমন অবস্থায় আছে । কতকাল তাহাদের আর খবর রাখি না ।"[১১১] মানুষের প্রতি এই আসক্তি , উন্মুখতা , কাঙালপনা বিভূতিভূষণের মানবপ্রীতিকে গাঢ় করে তোলে না ?

বিভূতিভূষণের গল্প উপন্যাসে বাংলা দেশের দারিদ্র্য , নিম্ন মধ্যবিত্ত মানুষের সুখ - দুঃখ দারিদ্র্য বেদনার ছবি যথেষ্ঠই পাওয়া যায় । জীবনকে ত্যাগ লেখক কখনোই করেন নি : " লেখক জীবনকে ত্যাগ করে কোন স্বপ্নজগতের রোমান্টিক রূপকথা রচনা করতে চান নি । "[১১২] বিভূতিভূষণ মানুষের জীবন নিকেতনের সম্মুখের রাস্তাটায় দাঁড়িয়েই গান করেন নি , তিনি জীবন নিকেতনের অন্দর মহলেও প্রবেশ করেছেন এবং অন্তরের প্রাণ-চাঞ্চল্য অনুভব করতে পেরেছেন , তারা কি চায় কি না চায় তাও জানতে চেয়েছেন । বাংলার বাঁশবনে ঘেরা ঘন শ্যামল পল্লীগ্রামের মানুষ ও অরণ্য প্রদেশের সাধারন মানুষের প্রতি বিভূতিভূষণের সহজ আকর্ষন ছিল । রঙের প্রলেপ দেওয়া মানুষের প্রতি তাঁর তেমন আকর্ষন ছিল না । যারা বিভূতিভূষণকে বাস্তব — বিমুখ স্বপ্নদর্শী লেখক বলেন

তাদের অভিযোগ সম্পূর্ণ অমূলক । বিভূতিভূষণের সমস্ত রচনায় মুখ্য স্থান করে আছে মানুষ ।

" আমি কোন বড় ঘটনায় বিশ্বাসবান নই । দৈনন্দিন ছোট খাটো সুখ দুঃখের মধ্যে দিয়ে যে জীবনধারা ক্ষুদ্র গ্রাম্য নদীর মত মন্থর বেগে অথচ পরিপূর্ণ বিশ্বাসের ও আনন্দের সঙ্গে চলেছে — আসল জিনিষটা সেখানে । "[১১৩]

' পথের পাঁচালী ' ' অপরাজিত ' গ্রন্থের মানুষের প্রাধান্য সহজেই লক্ষ্য করা যায় । ' পথের পাঁচালী ' র পথটা হল মানব জীবনেরই সুখ দুঃখ আশা নিরাশার । বিভূতিভূষণ একসময় বলেছেন : ' মানুষ নিয়ে ইতিহাস , মানুষ নিয়েই সাহিত্য ' উক্ত উপন্যাসগুলি সম্পর্কে বিভূতিভূষণের মন্তব্যটি অত্যন্ত সার্থক । ' পথের পাঁচালী ' র মূল কাহিনী মানুষের জীবনকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছে । প্রকৃতি এই গ্রন্থের অলঙ্কার আর মানুষ হল আত্মা । উপন্যাসটির দেহ সজ্জায় প্রকৃতির উল্লেখ যোগ্য ভূমিকা আছে সন্দেহ নেই কিন্তু গ্রন্থটির আসল প্রতিপাদ্য বিষয় চলমান মহাকালের প্রেক্ষাপটে চলমান মানবজীবনের জীবন যাপন প্রনালী তথা জীবন জিজ্ঞাসার কথাকে ফুটিয়ে তোলা । প্রকৃতির আন্তরিক আবেদন অবশ্যই আছে কিন্তু

তা মানব জীবনের সহায়করূপে ।

প্রকৃতি এই গ্রন্থে প্রধান্য লাভ করেছে একথা বলা যায় না । বিভূতিভূষণ জীবন পলাতক কিছুতেই নন । বিভূতি সাহিত্য সমালোচক অধ্যাপক তিমির বরণ চক্রবর্তীর ভাষায় :

" জীবন রসের পরম ধনের সন্ধানটি তিনি যেমন করে পেয়েছিলেন তেমন করে আর কজন পেয়েছেন আমার জানা নেই । " [১১৪]

মানুষের সুখ — দুঃখ , ব্যথা — বেদনা বিভূতিভূষণ হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি করেছেন। জীবন সংযোগহীন সাহিত্যকে লেখক মূল্যহীন বলে মনে করেন : " যে সাহিত্য টবের ফুল দেশের সত্যিকার মাটিতে শিকড় চালিয়ে যা রস সঞ্চয় করছে না , দেশের লক্ষ লক্ষ মূক নরনারীর আশা — আকাঙ্খা , দুঃখ-বেদনা যাতে বানী খুঁজে পেলে না , তা রক্তহীন পান্ডুর থাইসিসের রোগীর মত জীবনের বরে বঞ্চিত , নয়ত সংসার বিরাগী ঊর্দ্ধবাহু , মৌনী , যোগীর মত সাধারণ সাংসারিক জীবনান্তে , বাইরে অবস্থিত। " [১১৫]
' পথের পাঁচালী ' উপন্যাসের চরিত্র সম্পর্কে একথা বলা যায় যে তারা টবের ফুল নয় । বিভূতিভূষণের মতে সত্যিকারের

সাহিত্যিক যিনি :

" চারি পাশের মানব সমাজ সম্বন্ধে তিনি শুধু চিন্তা করেন এই নয় , এর অন্তরতম হৃদস্পন্দনকে তিনি একান্তভাবে অনুভবের চেষ্টা পান । " [১১৬]

' পথের পাঁচালী ' র সমস্ত বইটাই মানব জীবনের ইতিবৃত্ত । সহায় সম্বলহীন বিধবা ইন্দির ঠাকরুণের নীরব বেদনার সাক্ষী বিভূতিভূষণ তার প্রতি যথেষ্ঠ সহানুভূতিশীল । লেখক ইন্দির ঠাকরুণের হয়েই যেন ইন্দির ঠাকরুণের অরন্তুদ বেদনার স্বরূপ আবিষ্কার করেছেন । সর্বজয়া তার দোষগুন সমেত প্রকাশিত হয়েছে । হরিহরের জীবন সংগ্রাম ও ছেলে মেয়ের আব্দার পূরনের জন্য তার পিতৃসত্তার ভাবনা ও ব্যাকুলতা সমস্তই লেখকের মানব জীবনমুখী মনের পরিচায়ক ।

জীবনের হাটে ব্যথা - বেদনার বেসাতী নিয়েই বিভূতিভূষণ উপস্থিত হন নি , ব্যথা - বেদনার অন্তরালে যে সুখ ও আনন্দ লুকিয়ে আছে তাও তিনি প্রকাশ করেছেন। সর্বজয়া অপুর বাৎসল্য প্রেমের মনোরম মুহূর্তের চিত্রাবলী উপভোগ্য হয়ে উঠেছে । দশমাসের শিশু অপুর বর্ণনা অত্যন্ত আকর্ষনীয় হয়ে উঠেছে :

" খোকা প্রায় দশ মাসের হইল । দেখিতে রোগা রোগা গড়ন , অসম্ভব রকমের ছোট্ট মুখখানি । নীচের মাড়িতে মাত্র দুখানি দাঁত উঠিয়াছে । কারণে অকারণে যখন — তখন সে সেই দুখানি মাত্র দুধে — দাঁতওয়ালা মাড়ি বাহির করিয়া হাসে । " [১১৭] বিভূতিভূষণ যদি মানব দরদী না হতেন তাহলে দুর্গার জন্য বার বার এত বিলাপ কেন ? কাশী-যাত্রার সময় নিশ্চিন্দিপুর ছেড়ে যাবার মুহূর্তে অপু প্রকৃতির মধ্যে দিদির বিচ্ছেদ ব্যথাতুর মূর্তি আবিষ্কার করে : " বার বার বলিতে চাহিল — আমি চাইনি দিদি , আমি তোকে ভুলিনি , ইচ্ছে করে ফেলেও আসিনি - ওরা আমায় নিয়ে যাচ্ছে — । " [১১৮]

মানুষের উপর নিবিড় অনুরাগের উজ্জ্বল নিদর্শন পাওয়া যায় বিশালাক্ষী দেবীর গ্রাম ত্যাগের ঘটনায় । নরবলি দেওয়ার জন্য দেবী রুষ্ট হয়ে গ্রাম ত্যাগ করেন। লেখক বিশালাক্ষী দেবীর মাধ্যমে দেখিয়েছেন হিংসা নয় , প্রেমই ঈশ্বর লাভের সোপান। ' বড় শক্ত বুঝা , যারে বলে ভালবাসা তারে বলে পূজা । ' কুসংস্কার মানুষের মনকে যে কতখানি নীচে নামিয়ে দিতে পারে , তার যে কোন মূল্য নেই তাও দেখিয়েছেন লেখক । নিশ্চিন্দিপুর গ্রামের অনাদৃত ,

উপেক্ষিত আতুরী বুড়ী বিভূতিভূষণের সহানুভূতি লাভ করে তাঁর হৃদয় রাজ্যে স্থান লাভ করেছে । আতুরী বুড়ী যে ডাইনি নয় , তার মধ্যেও যে স্নেহ , প্রেম লুকিয়ে আছে তা বুঝতে আমাদের অসুবিধে হয় না । অপুরা যখন আতুরী বুড়ীকে দেখে ভয় পেয়ে গেল তখন আতুরী বুড়ী স্নেহমাখা স্বরে বলল : " ভয় কি মোরে , ও বাবারা ? মোরে ভয় কি ?..... মুই কি ধরে নেবো খোকারা ? এস মোর বাড়ীতি এস — আমচুর্ দেবানি এস — " [১১৯] অপুরা ভয় পেয়ে যখন পালিয়ে গেল তখন আতুরী বুড়ীর শূন্যবুক যেন আর্তনাদ করে উঠল: " মুই মাত্তিও যাইনি , ধত্তিও যাইনি — কাঁচাছেলে , কি জানি মোরে দেখে কেন ভয় পালে সন্দেবেলা ? খোকাডা কাদের ?" [১২০] আতুরী বুড়ী নিজেই জানে না যে তার দোষ কোথায় ! এমন চরিত্র যিনি সৃষ্টি করেন তাঁকে মানব দরদী বলবনা ত কাকে বলব ? বিভূতি উপন্যাসে প্রকৃতির যতখানি গুরুত্ব আছে , মানুষের গুরুত্ব তার চেয়ে কম নয় , বরং বেশীই ।

' পথের পাঁচালী ' সম্পর্কে একথা সর্বাংশে সত্য বলে মনে করি । এই উপন্যাসে প্রকৃতির ভূমিকা বাদ দিলে উপন্যাসটি অনলংকৃত হয়ে যায় একথা সত্য কিন্তু প্রানহানি

তখনই হয় যখন অপু , দুর্গা , সর্বজয়া , হরিহর , গুলকী , নরোত্তম দাস , রানু , পটু , ইন্দির ঠাক্‌রুণ প্রভৃতির কথা আমরা ভুলে গিয়ে প্রকৃতিকে নিয়ে মেতে থাকব ।

আধুনিক কথা সাহিত্যে জীবনের সমস্যাকে আশ্রয় করে যে মনঃসমীক্ষা মূলক উপন্যাস গল্প রচিত হয় বিভূতভূষণকে সেদিক থেকে বিচার করা চলবে না । বিভূতিভূষণ বাংলাদেশের দরিদ্র নিম্ন মধ্যবিত্ত জীবনের জীবন যাপন প্রণালী যথেষ্ট আন্তরিকতার সঙ্গে এঁকেছেন । তাঁর সাহিত্যে বিশেষ যুগের মানুষের জীবন সমস্যার কথা না থাকলেও দেশ কালাতিশায়ী মানুষের কথা আছে ।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর উপন্যাসে ' আপন রহস্যে আপনি একাকী ' মানুষের স্বরূপ উদ্ঘাটন করতে গিয়ে অপার শক্তিশালী হওয়া সত্ত্বেও শরৎচন্দ্রের তুলনায় সাধারণ পাঠক সমাজে কথা সাহিত্যে অপেক্ষাকৃত কম জনপ্রিয়তা অর্জন করতে পেরেছেন , বিভূতিভূষণ বোধহয় তেমনি মাটির কাছাকাছি সাধারন মানুষ ও উগ্রতা বর্জিত মানুষ সৃষ্টি করে মানুষের প্রতি অসীম ভালবাসার দৃষ্টান্ত রেখে গেলেও জীবন পলাতক নিন্দনীয় আখ্যায় আখ্যায়িত হয়েছেন ।

মানুষ যেখানে সহজ সেখানে বিভূতিভূষণের দৃষ্টি গেছে । যেখানে মানুষ ' আপন রহস্যে আপনি একাকী ' আপন মনের অন্তরালে সবচেয়ে দুর্গম সেখানে বিভূতিভূষণ দৃষ্টিপাত করেন নি (অপরাজিতর লীলা সম্পর্কে যদিও তর্কের অবকাশ আছে) । বিভূতিভূষণের গল্প উপন্যাসে এক রকমের মায়ার আবরণ আছে। সেই মায়ার ইন্দ্রজালে আচ্ছন্ন পাঠক মন মায়ার কুয়াশা সারিয়ে দিতে পারলে তবেই মানব জীবনের স্বরূপকে দেখতে পাবেন । যন্ত্রনার চিত্রনেও বিভূতিভূষণ এত অনাসক্ত যে সেখানেও মায়ার ঘোরটা কাটতে চায় না । তাই তখনই পাঠক ভুল করেন । " আসলে দুঃখ , যন্ত্রনাময় পৃথিবীর মানুষের কথাই তিনি বলেছেন , কিন্তু কালো রঙের পতাকা উঁচিয়ে বা ডান্ডা ঘুরিয়ে নয় ; তিনি প্রচারক নন ; জীবনরসিক শিল্পী ।"[১২১] আসলে বিভূতিভূষণের মানব চরিত্রের মধ্যে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে , তাদের মধ্যে এক অপূর্ব সরলতা আছে , প্রকৃতির সঙ্গে তাদের আশ্চর্য মিল আছে , তাই তাঁর মানব চরিত্র প্রায় ক্ষেত্রেই উগ্রতা বর্জিত । কিন্তু তা বলে কি তিনি মানব প্রেমিক নন ?

"জীবনের প্রতি তাঁর মর্ম্মান্তিক অনুরাগ । সেই

অনুরাগের জমিতে থাকে প্রান্তর বিস্তৃত জীবন প্রবাহ ।" [১২২]

' অপরাজিত ' উপন্যাস সম্পর্কে বলা যায় যে তার সবটাই মানুষের কথা । ' পথের পাঁচালী ' তে প্রকৃতির ভূমিকা আছে কিন্তু ' অপরাজিত ' তে অনেক স্থানে প্রকৃতির রূপ প্রকাশ পেলেও তাকে বাদ দিলে উপন্যাসের অঙ্গহানী হয় না । ' অপরাজিত ' অপুর অপরাজিত জীবন রহস্যের কাহিনী । বিরূপ বিশ্বের সমস্যার ঝাঁঝ এখানে তাকে সহ্য করতে হয়েছে সমস্যা সমধানের পথ সে খুঁজছে কিনা এ আলোচনা নাই বা হলো । লীলার জীবনের বিভিন্ন সমস্যা , অপর্নার শান্ত সরল ব্যবহার , সর্বজয়ার জীবনের গোধূলি বেলার অসহায় অবস্থা , কাজলের মাতুলালয়ে কষ্ট ভোগ প্রভৃতির মাধ্যমে বিভূতিভূষণের মানব প্রীতি কি ধরা পড়ে না ?

নয়

মাতৃমন : বাৎসল্য প্রেম

পাল্য পালকের --- সম্পর্ক সূত্রে গড়ে ওঠে বাৎসল্য ভাব । বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্যে কবিরা যে বাৎসল্য চিত্র এঁকেছেন গোষ্ঠী চেতনার সীমা অতিক্রম করে তা সার্বজনীন হৃদয় কথাকেই ব্যক্ত করে । মধ্য যুগ ছাড়া আধুনিক যুগের কাব্য কবিতা , উপন্যাস প্রভৃতিতে বাৎসল্য চিত্র বহুস্থানে প্রকাশ পেয়েছে । বঙ্কিমচন্দ্র , রবীন্দ্রনাথ , শরৎচন্দ্রের রচনায় বাৎসল্য ভাব যথেষ্ট পরিমানে ধরা পড়ে । বাংলা কথা সাহিত্যে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় বাৎসল্য প্রেমের আকর্ষণীয় চিত্র এঁকেছেন । বিভূতি রচনায় বাৎসল্য ভাব তাঁর স্বাভাবিক চরিত্র ধর্মের প্রকাশ । বিভূতিভূষণের মনখানি শিশুর মতই সরল ছিল । তিনি তাঁর সেই অন্তঃস্থিত শিশুমনের তৃপ্তিমানসেই যেন বাৎসল্যের চিত্র এঁকেছেন ।

' পথের পাঁচালী ' ' অপরাজিত ' উপন্যাসে বাৎসল্য

চিত্রে চিরন্তন মাতৃহৃদয় প্রকাশ পেয়েছে । যুগ যুগ ধরে যে জননী তার সন্তানের মঙ্গল কামনায় আপন হৃদয়কে ব্যাকুল করে তোলে সর্বজয়া সেই মাতৃ হৃদয়ের চিরন্তন প্রতিনিধি । সর্বজয়া সঙ্কীর্ণচিত্ত , স্বার্থপর রমনী — একথা সত্য কিন্তু তার মাতৃ মহিমাকে বিভূতিভূষণ ক্ষুণ্ণ করেন নি । নিজের সন্তানের প্রতি তাঁর স্নেহের অন্ত নেই । তার মধ্যে রয়েছে বাৎসল্য প্রেমের অফুরন্ত ভান্ডার , দারিদ্র্যের তীব্রতাতেও যা শুকিয়ে যায়নি । বিশেষভাবে অপুর উপর তার মাতৃ প্রেমে কোন কার্পন্য নেই । শিশু অপুর অর্ধস্ফুট বাক্য , অর্থহীন গীতধ্বনি সর্বজয়ার মনকে ভরিয়ে রাখে । অপুকে কাজল পরিয়ে ঘুম পাড়াতে গিয়ে ঘুম পাড়ানি গান গাইতে থাকে । -

" আয়রে পাখী – ই – ই লেজঝোলা , --
আমার খোকনকে নিয়ে–এ– এ– গাছে তোলা " .....[১২৩]

শিশু অপুর শৈশবোচিত দুষ্টুমি সর্বজয়ার মনকে আকর্ষন করে । শিশু অপু : " ট্যাপা ট্যাপা ফুলো-ফুলো গালে মায়ের মুখের দিকে হাঁ করিয়া চাহিয়া থাকিত , পরে হঠাৎ কি মনে করিয়া সম্পূর্ন দন্তহীন মাড়ি বাহির করিয়া আহলাদে আটখানা হইয়া মল --- পরা অসম্ভবরূপ ছোট্ট পায়ে মাকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া মায়ের পিঠের দিকে মুখ লুকাইত ।

সর্বজয়া হাসিমুখে বলিত — ওমা , খোকা আবার কোথায় লুকুলো ? তাইতো , দেখতে তো পাচ্ছিনে ! ও খোকা ! "..... [১২৪]

ছেলে মায়ের সঙ্গে খেলা করে , মা ছেলেকে চুম্বনে চুম্বনে ভরিয়া দেয় । অপু সর্বজয়ার সাংসারিক প্রয়োজনীয় বস্তু লুকিয়ে দেয় । চট ঢাকা দিয়ে মাকে ভয় পাইয়ে দেয় । সর্বজয়া নিজের সন্তানের সুখ কামনায় দুর্গা অপুর কুড়িয়ে পাওয়া কাঁচের টুকরোকে মূল্যবান হীরের টুকরো হওয়ার স্বপ্ন দেখে : " রাঁধিতে রাঁধিতে সর্বজয়া বারবার মনে মনে বলিতে লাগিল — দোহাই ঠাকুর , কত লোক তো কত কি কুড়িয়ে পায় ! এই কষ্ট যাচ্ছে সংসারের — বাছাদের দিকে মুখ তুলে তাকিও — দোহাই ঠাকুর । " [১২৫]

' পথের পাঁচালি ' উপন্যাসের এয়োদশ পরিচ্ছেদে ছেলে মেয়ে ঘরে ফিরে না আসতে সর্বজয়ার মাতৃচিত্তের উদ্বিগ্নতার পরিচয় পাওয়া যায় :

" সেই ঝড়ের আগে দুজনে বেরিয়েছে আম কুড়োতে যাই বলে , আর তো ফেরেনি --- এই ঝড় বৃষ্টি গেল , সন্দে হলো , ও মা , কোথায় গেল তবে ? " [১২৬]

সর্বজয়ার এই অবস্থা বৈষ্ণব পদাবলীর কৃষ্ণ ব্যকুল

প্রানা যশোদার

' মন উচাটন নিঃশ্বাস সঘন

কদম্ব কাননে চায় ' --

এরই অনুরূপ । সর্বজয়ার মাতৃ স্নেহে একদেশদর্শিতার কথা স্বাভাবিক ভাবেই উঠতে পারে । একদেশদর্শিতা সর্বজয়ার মধ্যে আছে সত্য , তবে তা সম্পূর্ণ নয় । দুর্গা অপেক্ষা অপুর উপর তার স্নেহ অপেক্ষাকৃত অধিক পরিমানে বর্ষিত হয়েছে , কিন্তু তার ফলে দুর্গার প্রতি প্রেমের অভাব নেই স্নেহে কার্পন্যনেই । দুর্গার প্রতি তার স্নেহ ও শাসন পরায়ন এই দুটো দিকেরই বর্ষণ হয়েছে । দুর্গা যেখানে অবাধ্য , উচ্ছৃঙ্খল সেখানে সর্বজয়া তাকে শাসন করেছে কিন্তু দুর্গার প্রতি তার স্নেহ প্রেম কখনই শুকিয়ে যায়নি । সেজ ঠাকরুণের অপমান সহ্যের সীমা পার করলে সেজ ঠাকরুণের উপর যে রাগ সর্বজয়ার হয়েছিল , তা দুর্গার উপর বর্ষিত হয় । সন্তানের কুপথে গমনের ইঙ্গিত পেয়ে দুর্গাকে অমানুষী শাসন করে । এক ঝড়বৃষ্টির রাতে অসুস্থ দুর্গাকে প্রাকৃতিক দুর্যোগের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য সর্বজয়ার মাতৃমনের কি ব্যাকুলতা । দুর্গার মৃত্যুর পর হরিহর যখন ঘরে ফিরে আসে , তখন স্বামীর কাছে

সর্বজয়ার সর্বরিক্ত মাতৃহৃদয় " উচ্ছ্বাসিত কন্ঠে ফুকারিয়া কাঁদিয়া উঠিল — ওগো দুগ্‌গা কি আর আছে গো — মা যে আমাদের ফাঁকি দিয়ে চলে গিয়েছে গো —" [১২৭] মাত্র একটি বাক্যে সর্বরিক্ত মাতৃমনের এমন বেদনা আর কোথায় পাওয়া যাবে ?

সর্বজয়া মাতৃস্নেহের সমস্ত দিকগুলি পদ্মের পাপড়ির মত মেলে ধরেছে অপুর উপর । অপু সর্বজয়ার মাতৃহৃদয়কে পূর্ণ বিকাশের পথে নিয়ে গেছে। ধনীগৃহে অপুর অপমানে সর্বজয়ার মাতৃমন কেঁদে ওঠে — " ঠাকুর , ঠাকুর , ও আমার বড় আদরের ধন, তুমি তো জানো ও একদণ্ড চোখের আড়াল থেকে সরলে আমি স্থির থাকতে পারিনে , যা কিছু শাস্তি দেবার আমার ওপর দিয়ে দাও ঠাকুর , ওকে কিছু বোলো না , আমার বুক ফেটে যায় ঠাকুর , তা আমি সইতে পারবো না —" [১২৮] অপুর সঙ্গে সর্বজয়ার মধুর বাৎসল্য লীলার উপভোগ্য চিত্র পাই ' পথের পাঁচালী ' উপন্যাসে ।

' অপরাজিত ' উপন্যাসে স্মৃতি রোমন্থনের মাধ্যমে সর্বজয়ার পুত্রব্যাকুল মাতৃহৃদয়ের পরিচয় পাই। সর্বজয়া অপুর জন্য কত কি সংগ্রহ করে রাখে। তিন বছর বয়সে

অপু একবার হারিয়ে গেলে সর্বজয়ার মাতৃমন কেঁদে কেঁদে আকুল । হরিহর যখন অক্রূর মাঝির সাহায্যে ডোবায় জাল ফেলাল তখন সর্বজয়ার অস্থির চিত্তের এক অত্যন্ত বাস্তব সম্মত বর্ণনা পাই " সর্বজয়া ভাবিল অক্রূর মাঝিকে চিরকাল সে নিরীহ বলিয়া জানে , ভাল মানুষের মত কতবার মাছ বেচিয়া গিয়াছে তাহাদের বাড়ি — সে সাক্ষাৎ যমের বাহন হইয়া আসিল কি করিয়া ? শুধু অক্রূর মাঝি নয় , সবাই যেন যমদূত , অন্য অন্য লোকেরা যাহারা মজা দেখিতে ছুটিয়াছে , তাহারা — এমনকি তাহার স্বামী পর্য্যন্ত । সেই তো গিয়া ইহাদের ডাকিয়া আনিয়াছে । সর্বজয়ার মনে হইতে ছিল যে , ইহারা সকলে মিলিয়া তাহার বিরুদ্ধে ভিতরে ভিতরে কি একটা ষড়যন্ত্র আঁটিয়াছে — কোন হৃদয়হীন নিষ্ঠুর ষড়যন্ত্র । "[১২৯]

ভালমন্দ জিনিষ মা ছেলের জন্য তুলে রাখে । কুণ্ডুদের বাড়ীর বিয়েতত্ত্বের সন্দেশ সর্বজয়া খেতে পারে না অপুর জন্য তুলেরাখে । সর্বজয়া মা তাই সে চায় তার ছেলে যেন না বাড়ে , ছোটটি থেকে তার সঙ্গে খেলা করে । অপুর ছেলে মানুষীর জন্য সর্বজয়ার মাতৃমন তৃষিত হয়ে থাকে । মা ছেলেকে জিজ্ঞাসা করে " দুবেলাই মাছ

দেয় ? পেট ভরিয়া ভাত দেয় তো ? কিখাবার খায় সে বৈকালে ? কাপড় নিজে কাচিতে হয় ? " [১৩০] ছেলের জন্য এত ভাবনা মা ছাড়া আর কার হয় ? সর্বজয়ার চোখে অপু দেবশিশুর মত সুন্দর । ঈশ্বরের কাছে সে প্রার্থনা জানায় যে পরের জন্মে সে যেন আবার অপুকেই ছেলেরূপে পায় । তার জীবনে দুঃখ থাক , থাকনা বিষাদ শত সহস্র দুঃখ বেদনার মধ্যে পুত্র প্রেমের মধ্যেই মা তার আনন্দকে পাবে : " সর্বজয়ার জীবনের পাত্র পরিপূর্ণ করিয়া অপু যে অমৃত শৈশবে পরিবেশন করিয়াছে , তারই স্মৃতি তার দুঃখ-ভরা জীবন-পথের পাথেয় । " [১৩১]

ইন্দির ঠাকরুণকে কেউ মা বলে ডাকেনি , বহুদিন আগে তার মেয়ে বিশ্বেশ্বরী মর্তলোক ছেড়ে মৃত্যুপারের দেশে চলে গেছে , কিন্তু ইন্দির ঠাক্‌রুণের মাতৃ হৃদয়টা আজও শুকিয়ে যায় নি । দুর্গার মধ্যেই সে তার হারানো মেয়েকে ফিরে পেয়েছে " হরিহরের মেয়ের মধ্যে বিশ্বেশ্বরী মৃত্যুপারের দেশ হইতে চল্লিশ বছর পরে তাহার অনাথা মায়ের কোলে আবার ফিরিয়া আসিয়াছে । চল্লিশ বছরের নিভিয়া-যাওয়া ঘুমন্ত মাতৃত্ব মেয়েটার মুখের বিপন্ন অপ্রতিভ ভঙ্গিতে , অবোধ চোখের হাসিতে — এক মুহূর্তে

সচকিত আগ্রহে , শেষ-হইতে-চলা জীবনের ব্যাকুল ক্ষুধায় জাগিয়া উঠে । " [১৩২]

সন্তানের সুখের জন্য মা নিজে অনেক ত্যাগ করে। দুর্গা মা নয় , কিন্তু তার মধ্যে আমরা মাতৃ হৃদয়ের পরিচয় পাই । ইন্দির ঠাক্‌রুণ যখন দুর্গাকে চাল গুঁড়ো না দিতে পেরে লজ্জিত হয় তখন দুর্গা খাওয়ার ইচ্ছে থাকলেও নিজের লোভকে দমন করে রেখে বলে " তা হোক পিতি , তুইখা – " [১৩৩] মাতৃমনের কি বিচিত্র গতি ।

বিভূতিভূষণের শেষ দিকের রচনায় বাৎসল্য একটি তত্ত্বে পরিণত হয়েছে । ' কুশল পাহাড়ীর খেলা গল্পে মতিলাল তার শিশু পুত্রের সম্পর্কের মধ্যে ' ইছামতী ' উপন্যাসে এই তত্ত্বরূপ বাৎসল্যের প্রকাশ ঘটেছে ।

দশ

নারীমন : নারী মনস্তত্ত্ব

বিভূতিভূষণের রচনায় তথাকথিত জটিল মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণের অভাব থাকলেও, নর নারীর মনের বিচিত্র গতি প্রকৃতির কথা প্রকাশ পায়নি একথা বলা অযৌক্তিক । একথা হয়ত সত্য যে নর নারীর প্রেম সম্পর্ক নিয়ে মনোজগতের তীব্র অন্তর্দ্বন্দ্ব তাঁর রচনায় অনেক ক্ষেত্রেই অনুপস্থিত , কিন্তু নারীর মনের বিচিত্র সাধ ও সাধনার কথা তাঁর রচনায় অসুলভ নয় । ফ্রয়েডীয় যৌন মনস্তত্ত্বের প্রতি তাঁর আগ্রহ ছিল না , মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মত তিনি ' আদিম পৃথিবীর অন্ধকারেও হারিয়ে যাননি '! তাঁর নারী চরিত্রেরা তাদের উগ্রতা ত্যাগ করে নরম ভাষায় নারী-মনের চিরন্তন স্বভাবকেই ব্যক্ত করেছে । বিভূতিভূষণের রচনায় নারী মনস্তত্ত্ব বর্ণনায় অগ্নিকন্যা দ্রৌপদীর তীব্রতা নেই , কৃত্তিবাসের সীতার নম্র মধুর হৃদয় কথাই ব্যক্ত হয়েছে। অন্ততঃ ' পথের পাঁচালী ' ' অপরাজিত ' সম্পর্কে একথা বলা

অযৌক্তিক নয় ।

বর্ত্তমানযুগে নারীরা তাদের অবলা তন্ত্রের সীমা পার করে সবলা হয়ে উঠছে । পুরুষের প্রতিযোগী হয়ে তারা তাদের নায্য দাবী আদায় করে নিতে পিছিয়ে পড়ছে না। নারীকে আর এখন গৃহবধূরূপেই দেখি না , পথে প্রবাসে বিচিত্র জীবন ক্ষেত্রে তাদের এখন অবাধ যাতায়াত । এতৎসত্বেও একটি ক্ষেত্রে নারী আজও তাদের সনাতন ধর্মকে বিসর্জন দিতে পারে নি । সেই সনাতন ধর্ম হল স্নেহ প্রেম-প্রণয় ও ভালবাসার ধর্ম । বিবাহের পর অনেকদিন হরিহর ঘর সংসার না করে যাযাবর বৃত্তি অবলম্বন করেছিল । বিয়ের পর স্ত্রী স্বামীর ঘরকেই নিজের ঘর বলে মনে করে , পিতৃগৃহ তখন তার কাছে পরগৃহ হয়ে যায় । পিতৃগৃহে হরিহরের অনুপস্থিতিতে সর্বজয়ার ' অনাবিল যৌবনের সোনালী কল্পনা ' ' আড়ালে আবডালে নির্জন রাত্রে চোখের জলে ঝরে পড়ত ' । স্বামী না ফিরলে তার অবস্থা যে কি হবে সে ভেবেই তার মনে অস্থির দ্বন্দ্ব উপস্থিত হত।

সর্বজয়ার মধ্যে তার একটি দিকের পরিচয় পাওয়া যায় , সে দিকটি হল মাতৃমণের বিচিত্র গতি । মা তার

সন্তানকে অকৃত্রিম ভাবে ভালবাসে , সে ভালবাসার মধ্যে কোন খাদ নেই । এই ভালবাসায় মাতৃমন অন্যজনের হস্তক্ষেপ সহ্য করতে পারে না । অন্য পক্ষ যদি তার ভালবাসায় ভাগ বসাতে চায় তাহলে মায়ের মধ্যে এক ঈর্ষার ভাব দেখা দেয় । ইন্দির ঠাকরুণের প্রতি সর্বজয়া ঈর্ষান্বিত হয় কারণ তার মেয়ে দুর্গা ইন্দির ঠাকরুণের কাছে অধিকাংশ সময় কাটায় । মাতৃমনের এই বিচিত্র গতি চিরকাল ধরে জীবনে ও সাহিত্যে প্রকাশিত । অভিজ্ঞ মনোবিজ্ঞানীর মত বিভূতিভূষণ সর্বজয়ার মাতৃমনের সেই গতিকে ধরার প্রয়াস করেছেন ।

লজ্জা নারীর ভূষণ , লজ্জা নারীর অগৌরব নয় গৌরব । ' পথের পাঁচালী ' উপন্যাসে ব্রীড়াবনত দুর্গার চিরন্তনী নারী স্বভাবের একটি খণ্ডচিত্র ঔপন্যাসিক দক্ষতার সঙ্গে এঁকেছেন । দুর্গার নারী মন স্বাভাবিক ভাবেই নীরেনের প্রতি আকৃষ্ট হয়। নীরেনের মুখ দেখার ইচ্ছে থাকলেও সে লজ্জাবশত মধু সংক্রান্তির ব্রতের দিন এক বিশেষ মুহূর্তেও পারেনি । দুর্গার মত চঞ্চল মেয়েকে দেখে কি মনে হয় যে নীরেনের প্রতি এ মেয়ের মনের গোপন কক্ষে আসক্তি বাসা বেঁধে থাকবে ? নারী মনের কি বিচিত্র গতি !

দুর্গার আসক্তি তাকে ঘর বাঁধার স্বপ্ন দেখায় । নারীমনে প্রেমের বৈদ্যুতিক শক্তি লুকিয়ে থাকে , কোন এক বিশেষ মুহূর্তে তার প্রকাশ ঘটে একথা চিরন্তন সত্য। 'পথের পাঁচালী'র লীলার মধ্যেও আমরা প্রেমের সেই বৈদ্যুতিক শক্তিকে দেখতে পাই । নারীর প্রেম যেমন গভীর , গতি তার তেমনি বিচিত্র । কখন কোন পথ দিয়ে অলক্ষ্যে কার প্রতি যে নারীর মন আকৃষ্ট হয় তা বলা যায় না । 'পথের পাঁচালী'তে আমরা নারী মনের সেই দুর্জ্ঞেয় সত্বার সামান্য পরিচয় পাই । লীলা যখন অপুর এঁটো দুধ খায় তখন অপু বলে যে সে কেন তার এঁটো দুধ খেলো । তার উত্তরে লীলা বলে সেটা তার ইচ্ছে । আমার ইচ্ছে এইটুকু শব্দে নারী মনের বিচিত্র গতি উদঘাটিত করেছেন বিভূতিভূষণ । ' অপরাজিত ' উপন্যাসে লীলা যুবতী সেখানে অপুর উপর তার আকর্ষণের আর এক অধ্যায়ের পরিচয় পাওয়া যায় ।

রবীন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্রের মনস্তত্ব বর্ণনায় মনের যে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম দিক গুলি পূর্ণ রূপে ফুটে উঠে , বিভূতিভূষণের মধ্যে তা হয়ত নেই । রবীন্দ্রনাথের বিনোদিনী , শরৎচন্দ্রের কিরনময়ী অচলার পথ বিভূতিভূষণের নারীরা অনুসরন করেনি , তারা এক স্বতন্ত্র পথ আবিষ্কার করেছে । বিনোদিনী

কিরণময়ীর মত স্ত্রীর কাছ থেকে স্বামীকে ছিনিয়ে নেবার প্রতিযোগিতায় তারা নামেনি অথবা অচলার দোলাচল মনোবৃত্তির অস্থিরতাতেও ভোগেনি । বিভূতি উপন্যাসের নারীরা কেবল মাত্র তাদের মনের কথাই ব্যক্ত করেছে । বিভূতি উপন্যাসে মনস্তত্ত্বের বর্ণনায় জীবন নদীর দুকুল ভাঙ্গা বন্যার পরিচয় নেই । এর গতি ধীর , এ পাড় ভাঙ্গে না , পাড়ে জাগায় শ্যাম সমারোহ । এর প্রকৃতি স্নিগ্ধ অথচ আকর্ষনীয় ।

এগারো

ভাষা শিল্পী বিভূতিভূষণ

বিভূতিভূষণের ' পথের পাঁচালী ' র ভাষা আলোচনা করতে গিয়ে বলতে হয় যে ভাষা প্রয়োগে তিনি একজন দক্ষ ভাষা শিল্পী । স্বচ্ছতা তাঁর ভাষার প্রধান গুণ । বিভূতি সাহিত্যের ভাষায় শীতের ভোরের কুহেলীকুহক নেই , শরৎ কালের নির্মল নীলাকাশের স্বচ্ছতা আছে । সাধু ও চলতি — উভয় ভাষা প্রয়োগেই তাঁর দক্ষতা স্বীকার করতে হয় । সাধু ও চলিতের অনুশীলনের মধ্যে কোন পূর্ব পরিকল্পনা নেই । বিভূতিভূষণের প্রথম গল্প ' উপেক্ষিতা ' যেখানে চলিত ভাষায় লেখা , সেখানে তাঁর প্রথম উপন্যাস ' পথের পাঁচালী ' লেখা হয়েছে সাধু ভাষায় । বিদ্যাসাগর , বঙ্কিমচন্দ্র , মধুসূদনের ভাষায় যে একধরণের দার্ঢ্য আছে, গাম্ভীর্য আছে , বিভূতিভূষণকে সেদিকটা বিশেষ আকর্ষণ করে নি । মানব চরিত্র চিত্রণে , প্রকৃতি চিত্রণে ও ভাষায় ক্ষেত্রে সর্বত্রই তিনি স্নিগ্ধতার পরিচয় দিয়েছেন ।

বিভূতিভূষণের ভাষায় গুণ বা বৈশিষ্ট্য অনেক প্রথমতঃ তাঁর ভাষা কাব্য সৌন্দর্যমন্ডিত ও অন্যদিকে নিরাভরণ আটপৌরে । বিশিষ্ট সমালোচক জিতেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর ভাষায় : " রোমান্টিক কাব্য সৌন্দর্যমন্ডিত রূপালঙ্কার-সমৃদ্ধ ভাষা এবং নিরাভরণ বস্তুনিষ্ঠ আটপৌরে ভাষা — দ্বিবিধ ভাষা ব্যবহারেই বিভূতিভূষণ সমান সুদক্ষ ছিলেন । " [১৩৪]

কাব্য - সৌন্দর্য মন্ডিত ভাষা

(ক) " মাঠের ঝোপঝাপগুলা উলুখড় , বনকলমী , সোঁদাল ও কুলগাছে ভরা । কলমীলতা সারা ঝোপগুলার মাথা বড় বড় সবুজ পাতা বিছাইয়া ঢাকিয়া দিয়াছে — ভিতরে স্নিগ্ধ ছায়া , ছোট গোয়ালে , নাটাকাঁটা, ও নীল বন-অপরাজিতা ফুল সূর্যের আলোর দিকে মুখ উঁচু করিয়া ফুটিয়া আছে , পড়ন্ত বেলার ছায়ায় স্নিগ্ধ বনভূমির শ্যামলতা , পাখীর ডাক , চারিধারে প্রকৃতির মুক্ত হাতে ছড়ানো ঐশ্বর্য রাজার মত ভান্ডার বিলাইয়া দান , কোথাও এতটুকু দারিদ্র্যের আশ্রয় খুঁজিবার চেষ্টা নাই , মধ্যবিত্তের কার্পণ্য নাই । বেলাশেষের ইন্দ্রজালে মাঠ , নদী , বন

মায়াময় । " [১৩৫]

(খ) " পথের দেবতা প্রসন্ন হাসিয়া বলেন — মূর্খ বালক , পথ তো আমার শেষ হয়নি তোমাদের গ্রামের বাঁশের বনে , ঠ্যাঙাড়ে বীরু রায়ের বটতলায় , কি ধলচিতের খেয়াঘাটের সীমানায় ? তোমাদের সোনাডাঙা মাঠ ছাড়িয়ে , ইছামতী পার হয়ে , পদ্মফুলে ভরা মধুখালি বিলের পাশ কাটিয়ে ..... দেশ ছেড়ে বিদেশের দিকে সূর্যোদয় ছেড়ে সূর্যাস্তের দিকে ..... দিন রাত্রি পার হয়ে , জন্ম মরণ পার হয়ে , মাস , বর্ষ , মন্বন্তর , মহাযুগ পার হয়ে চলে যায় — তোমাদের মর্মর জীবন-স্বপ্ন শেওলা-ছাতার দলে ভরে আসে , পথ আমার তখনও ফুরোয় না ..... চলে ..... চলে ..... চলে ..... এগিয়েই চলে ..... অনির্বাণ তার বীনা শোনে শুধু অনন্ত কাল আর অনন্ত আকাশ ..... " [১৩৬]

(গ) " বিজয়ী বীর অর্জুন নহে — যে রাজ্য পাইল , মান পাইল , রথের উপর হইতে বাণ ছুঁড়িয়া বিপন্ন শত্রুকে নাশ করিল , বিজয়ী কর্ণ — যে মানুষের চিরকালের চোখের জলে জাগিয়া রহিল , মানুষের বেদনায় অনুভূতিতে সহচর হইয়া বিরাজ করিল — সে " [১৩৭]

(ঘ) " চল্লিশ বছরের নিভিয়া - যাওয়া ঘুমন্ত মাতৃত্ব মেয়েটার মুখের বিপন্ন অপ্রতিভ ভঙ্গিতে , অবোধ চোখের হাসিতে — একমুহূর্তে সচকিত আগ্রহে , শেষ-হইতে-চলা জীবনের ব্যাকুল ক্ষুধায় জাগিয়া উঠে । "[১৩৮]

(ঙ) " সর্বজয়ার জীবনের পাত্র পরিপূর্ণ করিয়া অপু যে অমৃত শৈশবে পরিবেশন করিয়াছে, তারই স্মৃতি তার দুঃখভরা জীবন-পথের পাথেয় । "[১৩৯]

নিরাভরণ আটপৌরে ভাষা :

(ক) " খোকা ট্যাঁপা-ট্যাঁপা ফুলো-ফুলো গালে মায়ের মুখের দিকে হাঁ করিয়া চাহিয়া থাকিত "[১৪০]

(খ) " সে বাহির উঠানে পা দিতেই দুর্গা তাহার পিঠে দুম্ করিয়া নির্ঘাত এক কিল বসাইয়া দিয়া কাহিল — লক্ষ্মীছাড়া বাঁদ'র ! পরে মুখ ভ্যাঙইয়া কাহিল — আম খেয়ে দাঁত টকে গিয়েছে — আবার কোনো দিন আম দেবো খেও " [১৪১]

বিভূতি সাহিত্যের ভাষার দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য লিরিকতা । যেখানে লেখক আবেগে আপ্লুত হয়ে পড়েছেন , সেখানেই

তাঁর ভাষা আবেশবিহ্বল লিরিক সুরের গুন্জন তুলেছে । ' পথের পাঁচালী ' উপন্যাসে আম আঁটির ভেঁপু অংশে এর অজস্র দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় :

" কর্ণ যেন ঐ অশ্বত্থ গাছটার ওপারে আকাশের তলে , অনেক দূরে কোথায় এখনও মাটি হইতে রথের চাকা দুই হাতে প্রাণপনে টানিয়া তুলিতেছে — রোজই তোলে — রোজই তোলে — মহাবীর , কিন্তু চিরদিনের কৃপার পাত্র কর্ণ ! বিজয়ী বীর অর্জুন নহে — যে রাজ্য পাইল , মান পাইল , রথের উপর হইতে বাণ ছুঁড়িয়া বিপন্ন শত্রুকে নাশ করিল , বিজয়ী কর্ণ — যে মানুষের চিরকালের চোখের জলে জাগিয়া বহিল , মানুষের বেদনায় অনুভূতিতে সহচর হইয়া বিরাজ করিল — সে । " [১৪২]

" আকাশের নীল আস্তরণ ভেদ করিয়া মাঝে মাঝে অনন্তের হাতছানি আসে — পৃথিবীর বুক থেকে ছেলেমেয়েরা চঞ্চল হইয়া ছুটিয়া গিয়া অনন্ত নীলিমার মধ্যে ডুবিয়া নিজেদের হারাইয়া ফেলে — পরিচিত ও গতানুগতিক পথের বহুদূর পারে কোন পথহীন পথে — দুর্গার অশান্ত , চঞ্চল প্রাণের বেলায় জীবনের সেই সর্বপেক্ষা বড় অজানার ডাক আসিয়া পৌঁছিয়াছে । " [১৪৩]

গ্রাম্য জীবনের সঙ্গে বিভূতিভূষণের গভীর টান ছিল । তাঁর লেখায় গ্রামীন জীবনধারার প্রভাব সবার উপর ছাপিয়ে উঠেছে । ভাষা ব্যবহারেও গ্রামীণতার প্রভাব বিশেষভাবে লক্ষনীয় । বিভূতিভূষণ ছিলেন গ্রামের মানুষ , তিনি বাংলার গ্রাম্য জীবনের সঙ্গে আষ্টে পৃষ্ঠে বাঁধা ছিলেন । বিভূতিভূষণ গ্রামের মানুষের মুখের ভাষা বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছেন । উদাহরণ স্বরূপ ইন্দির ঠাকরুণের ভাষা স্মরণ করা যেতে পারে- " তা দে বৌ – পাকা নোনাডা , তা ভাবলাম নিই খেয়ে, কডা দিনই বা বাঁচবো ? তা দিয়ে দে দুটো পয়সা – " [১৪৪] " সমস্ত দিন টউরে বেড়িয়ে এই রকমডা হয়েছে , তাই বলি একটু শুয়ে থাকি । " [১৪৫]

তমরেজের বৌ এর মুখে নীচ জাতীয়া নারীর ভাষা ব্যবহৃত হয়েছে - " কনে যান্ ও মনিব ঠাকুর , মোর খোকার একটা উপায় করে যান , ওরে মুই খাওয়াবো কি , এক পয়সার মুড়ি কিনে দেবার যে পয়সা নেই – মোর গোলা না খুলে দ্যান , মোর টাকা কডা মোরে ফেরত দ্যান্ – " [১৪৬]

আতুরী বুড়ীর ভাষার মধ্যে যথেষ্ঠ আন্তরিকতা আছে , এবং আঞ্চলিকতার ছাপও আছে

" কাঁচা ছেলে , কি জানি মোরে দেখে কেন ভয় পালে সন্ধে বেলা ? খোকাডা কাদের ?"[১৪৭]

সর্বজয়া তার কথাবার্ত্তার মাধ্যমে বাংলার গ্রাম্য নারীর বৈশিষ্ট্যই প্রকাশ করেছে ।

" কোথায় বেরুনো হয়েছিল শুনি ? একলা নিজে কতদিকে যাবো ? সকাল থেকে ক্ষার কেচে গা গতর ব্যথা হয়ে গেল , একটুখানি কুটো গাছটা ভেঙে দুখানা করা নেই , কেবল পাড়ায় পাড়ায় টো টো টোক্‌লা সেধে বেড়াচ্ছেন — সে বাঁদর কোথায় ?" [১৪৮]

বিভূতিভূষণ ' পথের পাঁচালী ' উপন্যাসে গ্রাম্য শব্দের ব্যবহার করেছেন । সেজন্য তিনি তিরস্কারের নন , পুরস্কারেরই যোগ্য । 'আগালেডা' ' এক পোয়া - পথ ' ' উম ' ইত্যাদি শব্দের ব্যবহার নগর সভ্যতার কোলে পালিত মানুষ হয়ত ভাষার দুষ্টতা আবিষ্কার করতে পারেন কিন্তু শব্দ গুলির দ্বারা গ্রাম্য জীবন যতটা জীবন্ত রূপ লাভ করেছে অন্য কোন মার্জিত শব্দে ততটা জীবন্ত হতো কিনা সন্দেহ ।

বিভূতিভূষণের ভাষা ব্যবহারে সবচেয়ে দক্ষতার পরিচয় স্মৃতি রোম'ন্থণ অথবা প্রকৃতির সৌন্দর্য বর্ণনার

সময় । কখনো কখনো তাঁর ভাষার মধ্যে একটা এক-ঘেঁয়েমি ভাব লক্ষ্য করা যায় । শব্দ বিপর্যয়ও তাঁর ভাষার --- একটা ত্রুটি পূর্ণ দিক । নীরেন্দ্রনাথ রায় বিভূতিভূষণের ভাষার দুর্বলতার কথা বলেও তিনি তাঁর ভাষার তিনটি প্রধান গুণের উল্লেখ করেছেন । (ক) স্বচ্ছ ও অনায়াস (খ) পাণ্ডিত্য প্রকাশনী কোটেশনের অভাব (গ) দুর্লভ প্রসাদ গুণ ও কবিত্ব শক্তি । বিভূতিভূষণের এই প্রশংসা কতদূর সার্থক তা বিচার্য্য বিষয়—প্রথমত ' স্বচ্ছ ও অনায়াস ' এই উক্তিটি বিভূতিভূষণের ভাষা সম্পর্কে সার্থক উক্তি । বিভূতিভূষণ অযথা গুরুগম্ভীর শব্দ ব্যবহার করে তাঁর ভাষাকে আড়ষ্ট করে তোলেন নি । তাঁর ভাষা চেষ্টা প্রসূত নয় ,অনায়াস । দ্বিতীয়তঃ তাঁর ভাষার মধ্যে পান্ডিত্য নেই । বঙ্কিমচন্দ্রের মতো তাঁর ভাষা কঠোর সাধনালব্ধ নয় । তৃতীয়তঃ বিভূতিভূষণের ভাষা কবিত্ব গুণে ভরপুর । প্রমান স্বরূপ কিছু উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে ।

(১) " পথের দেবতা প্রসন্ন হাসিয়া বলেন --- মূর্খ বালক , পথ তো আমার শেষ হয়নি তোমাদের গ্রামের বাঁশের বনে , ঠ্যাঙ্গাড়ে বীরু রায়ের বটতলায় কি ধলচিতের খেয়াঘাটের সীমানায় ? তোমাদের সোনাডাঙ্গা মাঠ ছাড়িয়ে ,

ইছামতী পার হয়ে , পদ্মফুলে ভরা মধুখালি বিলের পাশ কাটিয়ে , বেত্রবতীর খেয়ায় পাড়ি দিয়ে , পথ আমার চলে গেল সামনে , শুধুই সামনে ..... দেশ ছেড়ে বিদেশের দিকে , সুর্য্যোদয় ছেড়ে , সূর্যাস্তের দিকে , জানার গন্ডি এড়িয়ে অপরিচয়ের উদ্দেশে ..... " [১৪৯]

(২) " সর্বজয়ার জীবনের পাত্র পরিপূর্ণ করিয়া অপু যে অমৃত শৈশবে পরিবেশন করিয়াছে , তারই স্মৃতি তার দুঃখভরা জীবন-পথের পাথেয় " [১৫০]

মানুষের অস্থির মনের ভাষা বিভূতিভূষণ যেন মানুষের অন্তর লোকে প্রবেশ করেই আয়ত্ত করেছিলেন। দুর্গার বিচ্ছেদে অপুর অস্থির চিত্তের প্রকাশে বিভূতিভূষণ অসাধারণ দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন : " তাহার মন হঠাৎ হু-হু করিয়া উঠিল " [১৫১] বোনের প্রতি ভাই এর আন্তরিকতা প্রকাশ পেয়েছে মাত্র কয়েকটি শব্দে : " একটু পিদিমের তেল লাগিয়ে দেব দিদি ?" [১৫২] এখানে ' পিদিমের তেল ' শব্দের স্থানে প্রদীপের তেল ব্যবহার করলে তত ব্যঞ্জনাধর্ম্মী হতো বলে মনে হয় না ।

দুর্গার মৃত্যুর পর যখন হরিহর ঘরে ফিরে আসে তখন হরিহরের কাছে সর্বজয়ার কন্যাহারা মাতৃ হৃদয়ের হাহাকার

মাত্র কয়েকটি শব্দে প্রকাশ পেয়েছে। " ওগো দুগ্‌গা কি আর আছে গো । " [১৫৩]

বিভূতিভূষণের ভাষার মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্র , রবীন্দ্রনাথের বিপুল ঐশ্বর্য্য হয়ত নেই , কিন্তু তাঁর ভাষা তাঁর সৃষ্ট চরিত্রের প্রাণের ভাষা ।

বারো

ভাই - বোন : প্রীতির পাঁচালী

' পথের পাঁচালী ' উপন্যাসে এক বিশেষ লক্ষনীয় দিক হল ভাই-বোনের সম্পর্ক । রবীন্দ্রনাথের গল্পগুচ্ছের ' দিদি ' গল্পে ভাই এর প্রতি বোনের মনের গভীর টানের পরিচয় পাওয়া যায় । বিভূতিভূষণ রবীন্দ্রনাথের চেয়েও একধাপ এগিয়ে গেছেন । তিনি কেবল ভাই-এর প্রতি বোনেরই নয় , বোনের প্রতি ভাই-এরও মন কেমনের ভাবে 'পথের পাঁচালী' উপন্যাসটি পূর্ণ করেছেন । রবীন্দ্রনাথের দিদি গল্পে দিদি শশীমুখীর ভূমিকা যতখানি, ভাই নীলমনির ততখানি নয়। অসহায় মাতৃপিতৃহীন ভাইটিকে স্বামী জয় গোপালের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য তার প্রয়াসের অন্ত্য নেই । রবীন্দ্রনাথের গল্পটিতে বোন যতটা সক্রিয় ভাই ততটা নয় । পথের পাঁচালী উপন্যাসে ভাই — বোনের পারস্পরিক টানটা সমান সমান । অবশ্য একথাও সত্য যে বোনের প্রতি ভাই

এর মন কেমনের ভাবেই উপন্যাসের পৃষ্ঠাগুলি ভরা ।*

ভাইয়ের প্রতি বোনের এবং বোনের প্রতি ভাইয়ের এমন মধুর সম্পর্কের কাহিনী বাংলা উপন্যাস সাহিত্যে বিরল । প্রকৃতির ক্ষেত্রে যেমন , ভাই-বোনের সম্পর্কের মধ্যেও তেমনি লেখক স্নিগ্ধ মানসিকতারই পরিচয় দিয়েছেন । বিভূতিভূষণের মধ্যে একটা শিশুমন সর্বদাই জাগরুক ছিল । সেই শিশুমনের সরলতার ছাপ তাঁর প্রায় সমস্ত রচনাতেই রয়েছে । এই শিশুসুলভ সরল মানসিকতার জন্যই লেখক দুর্গার ভাই-বোন সম্পর্ককে মলিন বা রুক্ষ হতে দেন নি ।

' পথের পাঁচালী ' উপন্যাসটি অপু দুর্গা নামে দুই ভাই বোনের এক প্রীতিনিষিক্ত সোনালী মুহূর্তের জীবন্ত আলেখ্য । দিদি দুর্গার শৈশব দৃষ্টিতেই ভাই অপুর অমলিন আবির্ভাব । প্রথম দর্শনেই ভাইকে দেখে বোন আত্মহারা : " একটি টুকটুকে অসম্ভব রকমের ছোট্ট , প্রায় একটা কাচের বড় পুতুলের চেয়ে কিছু বড় জীব কাঁথার মধ্যে শুইয়া—সেটিও ঘুমাইতেছে । গুলের আগুনের মন্দ মন্দ

---

* এখানে বোন দুর্গার উপর ভাই অপুর গভীর টানের কথাই বলা হচ্ছে ।

ধোঁয়ায় ভালো দেখা যায় না । সে খানিকক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিতে থাকিতেই জীবটা চোখ মেলিয়া মিট্‌মিট্‌ করিয়া চাহিয়া অসম্ভব রকমের ছোট্ট হাত দুটি নাড়িয়া নিতান্ত দুর্বলভাবে অতি ক্ষীণ সুরে কাঁদিয়া উঠিল । এতক্ষণ পরে খুকী বুঝিল রাত্রিতে বিড়ালছানার ডাক বলিয়া যাহা মনে করিয়াছিল তাহা কি । অবিকল বিড়ালছানার ডাক — দূর হইতে শুনিলে কিছু বুঝিবার জো নাই । হঠাৎ অসহায় , অসম্ভব রকমের ছোট্ট নিতান্ত ক্ষুদে ভাইটির জন্য দুঃখে , মমতায় , সহানুভূতিতে খুকীর মন পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল ।" [১৫৪]

নিশ্চিন্দিপুর গ্রামের বীথিপথ দিয়ে ভাই বোনের নিত্য অবাধ যাতায়াত । দুর্গা অপুকে সঙ্গে নিয়ে পাড়ায় পাড়ায় ঘুরে বেড়ায় , খেলা করে , আম খায় , চড়ুইভাতি করে । উভয়ের সম্পর্কের মধ্যে কোনরকমের দূরত্ব নেই , ছোট বড় ভাব নেই । জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠকে শাসন করলেও বড়ত্বামি প্রদর্শন করে না । একে অপরকে হিংসা করে না । অভিমানের মেঘ মাঝে মাঝে হয়ত কালো করে মনের আকাশটাকে । কিন্তু সে মেঘ শরতের মেঘের মতই ক্ষণস্থায়ী , মুহূর্তেই বিলীন হয়ে যায় তারপর আবার প্রীতির সূর্যটা স্নেহসুধা ঝরাতে

থাকে ।

সেজঠাকরুণের অভিযোগে যখন সর্বজয়া দুর্গাকে অমানুষী শাসন করে তখন দিদির জন্য ভাইয়ের মন বেদনায় ও সহানুভূতিতে ভরে উঠে । ' দিদির অত্যন্ত আশার জিনিস আমগুলো ' এভাবে হাতছাড়া হওয়ার ব্যথায় ও মায়ের কাছে দিদির এরূপ মার খাওয়ায় অপুর মন অত্যন্ত বিষণ্ণ হয়ে উঠল । মনে মনে সে দিদির সকল দুঃখ কষ্ট ঘুচানোর ও সকল অভাব পূর্ণ করার কথাই ভাবে :

" দিদির অত্যন্ত আশার জিনিষ আমগুলো এভাবে লইয়া গেল , তাহার উপর আবার দিদি এরূপ ভাবে মারও খাইল । দিদির চুল ছিঁড়িয়া দেওয়ায় মায়ের উপর তাহার অত্যন্ত রাগ হইল । যখন তাহার দিদির মাথার সামনে রুক্ষ চুলের এক গোছা খাড়া হইয়া বাতাসে উড়ে তখনই কি জানি কেন , দিদির উপর অত্যন্ত মমতা হয় — কেমন যেন মনে হয় দিদির কেহ কোথাও নাই — সে যেন একা কোথা হইতে আসিয়াছে — উহার সাথী কেহ এখানে নাই । কেবলই মনে হয় , কেমন করিয়া সে দিদির সকল দুঃখ ঘুচাইয়া দিবে — সকল অভাব পূরণ করিয়া তুলিবে ! তাহার দিদিকে সে এতটুকু কষ্টে পড়িতে দিবে না "। [১৫৫]

খাওয়ার পর মায়ের ভয়ে অপু পড়তে বসলেও তার মন পড়ে থাকে দিদির কাছে । বেলা একটু পড়লে টুনুদের বাড়ী , পট্‌লিদের বাড়ী , নেড়াদের বাড়ী , বকুলতলা , গাবতলা — প্রায় সমস্ত নিশ্চিন্দিপুর দিদির খোঁজে চষে বেড়াল । না পেয়ে তার মনটা হু হু করে উঠল " কতক্ষণ হইল সেই গিয়াছে , বাড়ী আসে নাই — কোথায় গেল দিদি "? [১৫৬] দুপুর বেলা সে কি খেল ? এসব প্রশ্নই তার মনে জাগে । দুধ খেতে খেতে দিদির জন্য কেঁদে উঠে বলে " দিদির জন্য বড্ড মন কেমন করছে " [১৫৭] দিদির কানের পাশের ব্যথা উপষম করার জন্য বলে " একটু পিদিমের তেল লাগিয়ে দেব দিদি "? [১৫৮]

অমলার খেলনার প্রাচুর্য ও বাহার দেখে ও অমলার তুলনায় দুর্গার খেলনার অপর্যাপ্ততার জন্য অপুর মন দিদির জন্য করুণায় ভরে উঠে : " আহা , দিদিটার ও-সব খেলনা কিছুই নেই — মরে কেবল শুক্‌নো নাটাফল আর রড়ার বিচি কুড়িয়ে , আর শুধু পরের পুতুল চুরি করে মার খায় ! ..... তাহার দিদির বয়সী অন্য কোনো মেয়ের খেল্‌নার ঐশ্বর্য কত বেশী , তাহা সে এ পর্যন্ত কোনো দিন দেখে নাই , আজ তুলনা করিয়া দেখিবার সুযোগ পাইয়া

দিদির প্রতি অত্যন্ত করুণায় তাহার মনটা যেন গলিয়া গেল ।" [১৫৯]

ভাইয়ের কান্না বোন সহ্য করতে পারে না । সতু অপুর চোখে ধুলো ছুঁড়লে অপু যখন কাঁদতে থাকে তখন অপুর ব্যথায় দুর্গার বুক ফেটে যায় । ভাইয়ের যন্ত্রণা লাঘব করার জন্য অস্থির হয়ে পড়ে । প্রাণের চেয়ে প্রিয় কড়িগুলো ভাইকে দিতে দ্বিধা করে না । ভাইয়ের কান্না তার কাছে অসহ্য : " অপুর কান্না সে সহ্য করিতে পারে না — তাহার বুকের মধ্যে কেমন যেন করে । " [১৬০]

দুর্গার মৃত্যু ' পথের পাঁচালী ' উপন্যাসে এক বেদনারক্তিম অধ্যায় । দুর্গার মৃত্যুতে সর্বজয়া ও হরিহর যতটা না ব্যথা পায় , তার চেয়ে অনেক বেশি ব্যথিত হয় অপু । এখন থেকে সে বড় একা হয়ে যায়। চড়কের মেলায় আনন্দ নেই , শূন্যতাই আনে " চড়কটা যেন এবার কেমন ফাঁকা ঠেকিতে লাগিল "। [১৬১] তাদের বেড়ার গায়ে যখন রাংচিতা ফুল লাল হয়ে ফুটে উঠে তখন দিদির মুখ মনে পড়ে , পাখীর ডাকে , সদ্যফোটা ওড়কল্‌মী ফুলের দুলুনিতে দিদির জন্য মন কেমন করে : " মনে হয় যাহার কাছে ছুটিয়া গিয়া বলিলে খুশী হইত , সে কোথায় চলিয়া

গিয়াছে --- কতদূর ! ..... আর কখনো , কখনো — সে এসব লইয়া খেলা করিতে আসিবে না ..... "[১৬২]

কাশী যাত্রার সময় নিশ্চিন্দিপুর ছেড়ে যাবার মুহূর্তে অপু প্রকৃতির মধ্যে আবিষ্কার করে তার দিদির ম্লানমুখী মূর্তি । তার দিদিকে কেউ সঙ্গে নেয় নি । অপুর হৃদয়টা ফাঁকা হয়ে গেল । দিদি মারা গেলেও দুজনের খেলা করার পথে ঘাটে , বাঁশবনে , আমতলায় অপু তার দিদিকে কাছে কাছে পেয়েছে , দিদির অদৃশ্য স্নেহস্পর্শ নিশ্চিন্দিপুরের ভাঙ্গা কোঠাবাড়ীর প্রতি গৃহকোণে সে পেয়েছে । আজ দিদির সঙ্গে যেন চিরকালের ছাড়াছাড়ি হয়ে গেল । মনে পড়ে দিদির মুখ , তার না মেটা-সাধ। অপুর দিদি যেন তাদের যাত্রাপথের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে আছে । অপুর মনের মধ্যের অবাক ভাষা ' চোখের জলে আত্মপ্রকাশ করে ' যেন এই কথা বার বার বলতে চাইল : " আমি চাইনি দিদি , আমি তোকে ভুলিনি , ইচ্ছে করে ফেলেও আসিনি — ওরা আমায় নিয়ে যাচ্চে —" [১৬৩]

অপুর উত্তরজীবনে অপু বহু বৈচিত্র্যের স্বাদ পেয়েছে , বহু মানুষের সঙ্গে মিশেছে কিন্তু তার দিদিকে তার হৃদয় সিংহাসন থেকে কখনও সরিয়ে দিতে পারে নি : " সত্যই সে

ভুলে নাই । উত্তরজীবনে নীলকুন্তলা সাগর মেখলা ধরনীর সঙ্গে তাহার খুব ঘনিষ্ঠ পরিচয় ঘটিয়াছিল । কিন্তু যখনই গতির পুলকে তাহার সারা দেহ শিহরিয়া উঠিতে থাকিত , সমুদ্রগামী জাহাজের ডেক্ হইতে প্রতি মুহূর্তে নীল আকাশের নব নব মায়ারূপ চোখে পড়িত , হয়তো দ্রাক্ষাকুঞ্জবেষ্টিত কোন নীল পর্বতসানু সমুদ্রের বিলীন চক্রবাল সীমায় দূর হইতে দূরে ক্ষীণ হইয়া পড়িত , দূরের অস্পষ্ট আবছায়া - দেখিতে - পাওয়া বেলাভূমি এক প্রতিভাশালী সুরস্রষ্টার প্রতিভার দানের মত মহামধুর কুহকের সৃষ্টি করিত তাহার ভাবময় মনে — তখনই , এই সব সময়েই , তাহার মনে পড়িত এক ঘনবর্ষার রাতে , অবিশ্রান্ত বৃষ্টির শব্দের মধ্যে এক পুরানো কোঠার অন্ধকার ঘরে , রোগশয্যাগ্রস্ত এক পাড়াগাঁয়ের গরীব ঘরের মেয়ের কথা —

— অপু সেরে উঠলে আমায় রেলগাড়ী দেখাবি ?[১৬৪]

রাণী অপুর নিজের বোন না হলেও তার সঙ্গে অপুর সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ । অপু নিশ্চিন্দিপুর ছেড়ে যাবে শুনে রাণী ব্যথিত হয় । 'অপরাজিত' উপন্যাসে দেখা যায় যে

বহুদিন পর অপুর সঙ্গে রাণুর সাক্ষাতের মুহূর্তে রাণুদির চোখের জলে প্রকাশ পেল অকৃত্রিম ভ্রাতৃপ্রেম । নিশ্চিন্দিপুর ছেড়ে যাবার পূর্বে অপু কাজলকে রাণুদির হাতেই সঁপে দেয় ।

'কর্মহীন পূর্ণ অবকাশে' গোকুলের স্ত্রীর মনটা ব্যাকুল হয়ে উঠে নিঃসহায় ছন্নছাড়া ভাইটার জন্য । তার মা , বাবা আজ কেউ এ পৃথিবীতে নেই ; আছে শুধু পিতৃকুলে এক গাঁজাখোর ভাই । সে কোথায় কখন থাকে তারও ঠিকানা নেই । সে প্রয়োজনে নিজের সামান্য পুঁজি থেকে ' সিকিটা দুয়ানিটা ' তার ভাইকে দিত । অনেকদিন হল ভাইকে সে দেখেনি । ভাইয়ের জন্য বোনের মন অস্থির হয়ে পড়ে : " নিঃসহায় ছন্নছাড়া ভাইটার জন্য সন্ধ্যাবেলা কাজের ফাঁকে মনটা হু-হু করে । নির্জন মাঠের পথের দিকে চাহিয়া মনে হয়, গৃহহারা পথিক ভাইটা হয়তো দূরের কোন জনহীন আঁধার মেঠো-পথ বাহিয়া একা কোথায় চলিয়াছে , রাত্রে মাথা গুঁজিবার স্থান নাই , মুখের দিকে চাহিবার কোনো মানুষ নাই । — বুকের মধ্যে উদ্বেল হইয়া উঠে, চোখের জলে ছায়াভরা নদীর জল , মাঠ , ঘাট , ওপারের শিমুল গাছটা , বাঁকের মোড়ে বড় নৌকাখানা — সব ঝাপ্‌সা হইয়া

আসে ।" [১৬৫]

প্রধান চরিত্রে ভাই বোনের প্রীতির সম্পর্কে কোন একপেশে ভাব নেই , ভাই বোনের মধ্যে কারও ভালবাসা একতরফা হয়নি । অপ্রধান চরিত্রগুলিতে ভাইয়ের উপর বোনের টান যতখানি দেখতে পাওয়া যায় , ভাইয়ের দিক থেকে বোনের প্রতি ভালবাসা বা টান কতখানি তার চিত্র লেখক আঁকেন নি । অপ্রধান চরিত্রে বোনের ভালবাসা একতরফা ভাইয়ের দিক থেকে কোন সাড়া পাওয়া যায়নি ।

তেরো

বিভূতি মন : দর্শন ও আধ্যাত্মিক চেতনা

প্রচলিত অর্থে যাকে দার্শনিক বলে বিভূতিভূষণ সে রকম দার্শনিক ছিলেন না , প্রচলিত অর্থে তিনি অধ্যাত্মসাধকও ছিলেন না । তাঁর জীবনানুভূতিই তাঁকে দর্শন ও আধ্যাত্মিক চেতনার পথে উত্তীর্ণ করেছে । বিভূতিভূষণ বিশ্বের বিচিত্র সৌন্দর্যের মধ্য থেকে তাঁর দর্শন ও আধ্যাত্মিক চেতনাকে পেয়েছেন । হিন্দু সমাজে সাধারণ্যে প্রচলিত স্থূল অধ্যাত্ম চেতনা নয় , তাঁর অধ্যাত্ম-চেতনা যেমন সূক্ষ্ম তেমনই অসাধারণ । সাধারণ মানুষ ঈশ্বরকে উপাসনা করে ভয়ে অথবা লৌকিক জীবনের স্থূল দিকের পুষ্টি সাধনে । বিভূতিভূষণের অধ্যাত্ম সাধনা তেমনি স্থূল নয় । জৈবিক প্রয়োজনে তাঁর আধ্যাত্মিক মন গড়ে উঠে নি। প্রকৃতির ধ্যান — কল্পনায় তিনি ঈশ্বরকে আবিষ্কার করেছেন । বিভূতিভূষণের দেবতা কোন সম্প্রদায় বিশেষের দেবতা নয় : " আজ ওবেলা যখন শালগ্রাম পূজা

করছিলাম , তখনই আমার মনে হল এই ঘরের বদ্ধ ও অমুক্তির পরিবেষ্টনীর মধ্যে ভগবান নেই , তাঁকে আজ বিকেলে খুঁজব সুন্দরপুরের কিংবা নতিডাঙ্গার বাঁওড়ের ধারে মাঠে , নীল আকাশের তলায় , অস্তবেলার পাখীদের কলকাকলীর মধ্যে " [১৬৬] বিভূতিভূষণ প্রকৃতির মধ্যে , বিশ্বসৃষ্টির মধ্যে , মানুষের মধ্যে ঈশ্বরের স্বরূপ উপলব্ধি করেছেন । তিনি যে দেবতার আরাধনা করেছেন , সেই দেবতার শক্তি যেমন অসীম , তেমনি তাঁর করুণাও অপার । তাঁকে ভয় করার কিছু নেই , কারণ তিনি তাঁর শক্তি প্রদর্শন করেন না ধ্বংসের জন্য , বরং সৃষ্টিই তাঁর লক্ষ্য । তাঁর আশীর্বাদ সম্পূর্ণ বিশ্বকে অস্তিত্বের অমৃতধারায় সিক্ত করে চলেছে : " কতবার এই ক্ষান্তবর্ষণ মেঘথমকানো সন্ধ্যায় এই মুক্ত প্রান্তরের সীমাহীনতার মধ্যে কোন দেবতার স্বপ্ন যেন দেখিয়াছি — এই মেঘ , এই সন্ধ্যা , এই বন , কোলাহলরত শিয়ালের দল , সরস্বতী হ্রদের জলজ পুষ্প , মঞ্জী , রাজু পাঁড়ে , ভানুমতি , মহালিখারূপের পাহাড় , সেই দরিদ্র গোঁড়-পরিবার , আকাশ , ব্যোম সবই তাঁর সুমহতী কল্পনায় একদিন ছিল বীজরূপে নিহিত — তাঁরই আশীর্বাদ আজিকার এই নবনীলনীরদমালার মতই সমুদয়

বিশ্বকে অস্তিত্বের অমৃতধারায় সিক্ত করিতেছে — এই বর্ষা-সন্ধ্যা তাঁরই প্রকাশ , এই মুক্ত জীবনানন্দ তাঁরই বাণী , অন্তরের অন্তরে যে বাণী মানুষকে সচেতন করিয়া তোলে । সে দেবতাকে ভয় করিবার কিছুই নাই — ওই বিশাল ফুলকিয়া বইহারের চেয়েও , ঐ বিশাল মেঘভরা আকাশের চেয়েও সীমাহীন , অনন্ত তাঁর প্রেম ও আশীর্বাদ । যে যত দীনহীন , যে যত ছোট , সেই বিরাট দেবতার অদৃশ্য প্রসাদ ও অনুকম্পা তার উপর তত বেশী "।[১৬৭]

বিভূতিভূষণের আধ্যাত্মিক চেতনার সঙ্গে বেদ উপনিষদের সাদৃশ্য আছে । প্রাচীন বৈদিক ঋষিরা প্রকৃতি চেতনার পরম পরিণাম মহৎ মিস্টিক বোধের উপলব্ধিতে মুগ্ধ হয়েছেন । বেদের সংহিতা অংশে দেখা যায় যে প্রকৃতির মধ্যে যেখানে কোন শক্তির ক্রিয়ার আবিষ্কার করা হয়েছে সেখানে তার উপর দেবত্ব আরোপ করা হয়েছে : " প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্য পন্ডিতেরা প্রায় সকলেই অভিমত প্রকাশ করেছেন যে প্রাকৃতিক অভিভূত করেছিল যে তাঁরা প্রত্যেকটি প্রাকৃতিক বস্তুকে দেবতারূপে কল্পনা করেছেন "[১৬৮]

অধ্যাপক Winternitz বলেছেন " Many of the hymns are not addressed to a sun god , nor to a

moon god , nor to a fire-god , nor to a god of heavens , nor to storm-gods and water deities , nor to a goddess of the dawn and earth goddess but the shining sun itself , the gleaming moon in the nocturnal sky , the fire blazing on the earth or on the alter or even the lightning shooting forth from the cloud , the bright sky of day , the starry sky of night , the roaring storms, the flowing water of earth --- all these natural phenomena are as such , glorified , worshipped and invoked . Only gradually is accomplished in the songs of the Rigveda itself the transformation of these natural phenomena in to mythological figures , in to gods and goddesses , such as Surya (Sun) , Soma (Moon) , Agni (Fire) , Dyaus (Sky) , Maruts (Storm) , Vayu (Wind) , Apas (Water) , Usas (Dawn) and Prithivi (Earth) , whose names still indubitably indicate what they

originally were . So the songs of Rigveda prove indisputably that the most prominent figures of mythology have proceeded from personifications of most striking natural phenomena " .[১৬৯]

শ্রদ্ধেয় সমালোচক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন : " পথের পাঁচালী ' ' অপরাজিত ' দুই খণ্ড — বিভূতিভূষণের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ । এই তিন খন্ডে বিভক্ত উপন্যাস একটি কল্পনা প্রবন , আধ্যাত্ম দৃষ্টি—সম্পন্ন জীবনের ক্রমাভিব্যক্তির মহাকাব্য নামে অভিহিত হইতে পারে "।[১৭০]

শুধু সাহিত্যেই নয় ব্যক্তিগত জীবনেও বিভূতিভূষণের আধ্যাত্মিক মনের প্রকাশ বারবার ঘটেছে । বিভূতিভূষণ এই আধ্যাত্মিক মনের পরিচয় ভালভাবেই পেয়েছিলেন । বিভূতিভূষণের এমনি এক কাছের মানুষ বিশ্বনাথ পালের ভাষায় : " তাঁর জীবনের শেষ দশ বছর যখন বারাকপুরে তাঁর গ্রামে তাঁর বাড়িতে থাকছেন , বেড়াচ্ছেন , স্কুল করছেন তখন যেন বেশী করে ভগবৎ চিন্তায় বিভোর হয়ে যাচ্ছেন । বাঁশবনে বেড়াতে বেড়াতে হঠাৎ তাঁর ভগবানের কথা মনে আসছে "।[১৭১]

বিভূতিভূষণের আধ্যাত্মিক চেতনার উন্মেষ তার বাল্য কালেই হয় । প্রথমা স্ত্রী গৌরী দেবীর মৃত্যুর পর তা গভীরতা লাভ করে , প্রকৃত পক্ষে এখন থেকেই তাঁর আধ্যাত্মিক চেতনার উন্মেষ ।

তিনি প্রকৃতি , মানুষ ও পৃথিবীর প্রতি ধূলিকণার মধ্যে ঈশ্বরের ঐশী সত্বার অনুভব করেছেন । এমনকি তাঁর জীবন চর্চার মধ্যেও আধ্যাত্মিক চেতনার প্রকাশ পড়েছে :" তাঁর জীবনচর্যা , কথাবার্তার মধ্যেও এই অধ্যাত্ম - চেতনার প্রতিফলন ঘটেছে বারে বারে "। [১৭২]

অপুর জীবনের ব্যাখ্যা করলে সমালোচকের উক্তিটির সার্থকতা সহজেই প্রতিপন্ন হয় । অপু সাধারণ হয়েও অসাধারণ তাঁর অধ্যাত্ম দৃষ্টি লোকায়ত জীবনের মধ্যে ধরা দেয় না , সাধারণ চেতনাকে ছাড়িয়ে সে দৃষ্টির প্রসার সূক্ষ্ম ঐশী চেতনা লোকে । অপুর আধ্যাত্মিক মন গড়ে উঠেছে নিসর্গ দৃষ্টির সাহায্যে।সে নির্জনে বসে পৃথিবীর আধ্যাত্মিক রূপ আবিষ্কার করে । ফুল ফল আলোছায়ার মধ্যে সে তার ভগবানকেই খুঁজে পায় " আজকাল নির্জনে বসিলেই তাহার মনে হয়,এই পৃথিবীর একটা আধ্যাত্মিক রূপ আছে , এর ফুল-ফল , আলোছায়ার মধ্যে জন্মগ্রহণ করার দরুন এবং

শৈশব হইতে এর সঙ্গে ঘনিষ্ট পরিচয়ের বন্ধনে আবদ্ধ থাকার দরুন এর প্রকৃত রূপটি আমাদের চোখে পড়ে না । এ আমাদের দর্শন ও শ্রবণ গ্রাহ্য জিনিসে গড়া হইলেও আমাদের সম্পূর্ণ অজ্ঞাত ও ঘোর রহস্যময় , এর প্রতি রেনু যে অসীম জটিলতায় আচ্ছন্ন — যা কিনা মানুষের বুদ্ধি ও কল্পনার অতীত এ সত্যটা হঠাৎ চোখে পড়ে না "।[১৭৩]

অপুর দুটো চোখ ছাড়াও যেন আর একটা অতিরিক্ত চোখ আছে । সে সেই তৃতীয় নেত্রের দৃষ্টির সাহায্যে অসীম রহস্যময় দেবতার দর্শন পায় : " আকাশের রং আর এক রকম–দূরের সে গহন হিরাকসের সমুদ্র ঈষৎ কৃষ্ণাভ হইয়া উঠিয়াছে — তার তলায় সারা সবুজ মাঠটা , মাধবপুরের বাঁশবনটা কি অপূর্ব , অদ্ভুত , অপার্থিব ধরণের ছবি ফুটাইয়া তুলিয়াছে ! ..... ও যেন পরিচিত পৃথিবীটী নয়, অন্য কোন অজানা জগতের কোনও অজ্ঞাত দেবলোকের "।[১৭৪]

নদীর ধারে বসে আসন্ন সন্ধ্যায় মৃত্যুর নবরূপ আবিষ্কার করে অপু । সে ভাবে যুগে যুগে জন্ম মৃত্যু চক্র কোন বিশাল আত্মা দেবশিল্পীর হাতে আবর্ত্তিত হচ্ছে । অপুর আধ্যাত্মিক দৃষ্টি ভঙ্গী বাস্তব জীবন ভিত্তিক ; বাস্তব

জীবনের বাধা বিঘ্ন ও বিভিন্ন সমস্যা অতিক্রম করে তার এ দৃষ্টি-ভঙ্গী বহুদূর বিসর্পিত । প্রকৃতির অন্তর রাজ্যের পরিচয় উদ্ঘাটনের মধ্য দিয়ে তার আধ্যাত্মিকতার উৎপত্তি । সমালোচকের ভাষায় : " প্রকৃতি-বর্ণনা , শৈশব-চিত্র ও বাস্তবতার স্তর বাহিয়া আধ্যাত্মিকতার উত্তুঙ্গ শৃঙ্গারোহণ — এই ত্রিদিব প্রভাবের অনবদ্য ভাব পরিণতি বিভূতিভূষণের উপন্যাসকে বরনীয় করিয়াছে "।[১৭৫]

বিভূতিভূষণের জীবন পরিণতির পথে এগিয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর অধ্যাত্ম চেতনা তাঁর বোধকে অধিকার করেছে । ইছামতী উপন্যাসে তা লক্ষ্য করা যায় । ভবানী বাঁড়ুয্যে নিসর্গ ও মানব প্রকৃতিকে গেঁথে দিয়ে সেখানে এক পরম সত্তার দর্শন লাভ করেছে । বিভূতিভূষণের কাছে জগৎ সৃষ্টি যেন ' দেবতার কাব্য ' 'দেবযান' উপন্যাসে তিনি বিশ্ব কর্মকান্ডের নিয়ন্তা এক মহাশক্তির বন্দনা করেছেন।

বিভূতিভূষণের ঈশ্বর কবির ঈশ্বর থেকে সাধকের বা সন্তের ঈশ্বরে ক্রমশঃ পরিণতি লাভ করেছে । ' অপরাজিত ' ও ' দৃষ্টি প্রদীপে ' র ঈশ্বর , কবির ঈশ্বর , ইছামতীর ঈশ্বর , সন্ন্যাসীর ঈশ্বর ।

প্রত্যেক সাহিত্যিকের ভিতরে একজন দার্শনিক

থাকেন , যে দার্শনিক মানুষটি জীবনকে যথার্থরূপে দেখেন ও দেখাতে চান । বিভূতি চিন্তায় (পথের পাঁচালী , অপরাজিত এবং ইছামতী উপন্যাসে) রবীন্দ্রনাথের ' বলাকা ' এবং ফরাসী দার্শনিক ' বার্গসঁ ' এর দর্শনের ছায়াপাত ঘটেছে । ' পথের পাঁচালী ' , ' অপরাজিত ' ও ' ইছামতী ' গ্রন্থে বিভূতিভূষণ যে চলমান কাল প্রবাহের সুর ধ্বনিত করেছেন , কালের সেই নিরবচ্ছিন্ন গতিবেগকে আমরা রবীন্দ্রনাথের বলাকা কাব্যে পূর্বেই পেয়েছি । চলমান কালের প্রেক্ষাপটে পরিবর্তনশীল জীবনের পাঁচালী বিভূতিভূষণ শোনালেন । অপু পথিক দেবতার উদাত্ত আহ্বানে ঘর ছাড়া হয়েছে । পথিক দেবতা হিন্দু সমাজে পূজ্য বিশেষ দেবতা নন , বিভূতিভূষণের দার্শনিক মনের সৃষ্ট এক কাল্পনিক দেবতা , যিনি অপুর জীবনকে পরিচালনা করেছেন । বিভূতিভূষণ হিন্দু দর্শনের বৃত্তাকার কালের গতিপথকে নবরূপ দিয়েছেন । তাঁর কাল চেতনাও হিন্দু দর্শনের অনুরূপ চক্রাকার। হিন্দু ধর্মের কাল চেতনা ও গতি ধারনা যেখান থেকে শুরু হয় শেষে সেখানেই ঘুরে ফিরে আসে । বিভূতি উপন্যাসেও দেখা যায় যে অপু সীমার গন্ডী ছাড়িয়ে অসীম জগতে বিস্তৃত হতে চায় আবার ফিরেও আসতে চায়

নিশ্চিন্দিপুরে ।

বিভূতিভূষণের পথিক দেবতা বিহারীলালের সারদা ও রবীন্দ্রনাথের জীবনদেবতারই উত্তরপুরুষ । বিহারীলালের সারদা রবীন্দ্রনাথের জীবনদেবতা যেমন তাঁদের সৃষ্টির প্রেরণা দিয়েছে , বিভূতিভূষণের পথিক দেবতা তেমনি বিভূতিভূষণের অপুকে চলার প্রেরণা দিয়েছে ও নব-নব বৈচিত্র্য উপভোগের সুযোগ করে দিয়েছে । নীল আকাশের পটভূমিতে পত্রশূন্য গাছ দেখে অপু অরণ্যের ভাষা বুঝতে পারে । আকাশটা মনে মনে যে ছবি আঁকে , যে চিন্তা যোগায় তার গতি গোমুখী গঙ্গার মত অনন্তের দিকে , সে সৃষ্টিস্থিতি-লয়ের কথা বলে , যেন সে আকাশটা পুনর্জন্মের বাণী নিয়ে আসে । সে ভাবে " এই সব শান্ত সন্ধ্যায় ইছামতীর তীরের মাঠে বসিলেই রক্তমেঘস্তূপ ও নীলাকাশের দিকে চাহিয়া চারিপাশের সেই অনন্ত বিশ্বের কথাই মনে পড়ে। বাল্যে এই কাঁটাভরা সাঁইবাবলার ছায়ায় বসিয়া মাছ ধরিতে ধরিতে সে দূর দেশের স্বপ্ন দেখিত — আজকাল চেতনা তাহার বাল্যের সে ক্ষুদ্র গন্ডী পার হইয়া ক্রমেই দূর হইতে দূরে আলোকের পাখায় চলিয়াছে .....

ঐ অসীম শূন্য কত জীবলোকে ভরা — কি তাদের অদ্ভুত ইতিহাস । অজানা নদী তটে প্রণয়ীদের কত অশ্রুভরা আনন্দ তীর্থ — সারা শূন্য ভরিয়া আনন্দ — স্পন্দনের মেলা ইথারের নীল সমুদ্র বাহিয়া বহু দূরের বৃহত্তর বিশ্বের সে সব জীবন ধারার ঢেউ প্রাতে , দুপুরে , রাতে , নির্জনে একা বসিলেই তাহারা মনের বেলায় আসিয়া লাগে — অসীম আনন্দ ও গভীর অনুভূতিতে মন ভরিয়া উঠে — পরে সে বুঝিতে পারে শুধু প্রসারতার দিকে নয় — যদিও তা বিপুল ও অপরিমেয় — কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে চেতনা স্তরের আর একটা dimension যেন তার মন খুঁজিয়া পায় — এই নিস্তব্ধ শরত-দুপুর যখন অতীতকালের এমনি এক মধুর মুগ্ধ শৈশব-দুপুরের ছায়াপাতে স্নিগ্ধ ও করুণ হইয়া উঠে তখনই সে বুঝিতে পারে চেতনার এ স্তর বাহিয়া সে বহুদূর যাইতে পারে — হয়ত কোন অজ্ঞাত সৌন্দর্যময় রাজ্যে , দৈনন্দিন ঘটনার গতানুগতিক অনুভূতিরাজি ও একঘেয়ে মনোভাব যে রাজ্যের সন্ধান দিতে পারিতই না --- কোনদিন !

নদীর ধারে আজিকার এই আসন্ন সন্ধ্যায় মৃত্যুর নবরূপ সে দেখিতে পাইল । মনে হইল , যুগে যুগে এ

জন্মমৃত্যুচক্র কোন্ বিশাল-আত্মা দেবশিল্পীর হাতে আবর্তিত হইতেছে — তিনি জানেন কোন্ জীবনের পর কোন্ অবস্থার জীবনে আসিতে হয় , কখনও বা বৈষম্য — সবটা মিলিয়া অপূর্ব রস সৃষ্টি- বৃহত্তর জীবন সৃষ্টির আর্ট "[১৭৬] .....

' দুঃখের নিশীথে ' অপুর প্রাণের আকাশে সত্যের যে নক্ষত্ররাজী ফুটে উঠেছে, তা সে তার রচনার মাধ্যমে প্রকাশ করার সংকল্প করে । সে ভাবে :

" যে বিশ্বের সে একজন নাগরিক , তা ক্ষুদ্র , দীন বিশ্ব নয় । লক্ষ কোটী আলোক বর্ষ যার গণনার মাপকাঠি দিকে দিকে অন্ধকারে ডুবিয়া ডুবিয়া - নক্ষত্রপুঞ্জ , নীহারিকাদের দেশ , অদৃশ্য ঈথারের বিশ্ব যেখানে মানুষের চিন্তাতীত কল্পনাতীত দুরত্বের ক্রম বর্ধমান পরিধি পানে বিস্তৃত — সেই বিশ্বে সে জন্মিয়াছে ..... কত নিশ্চিন্দিপুর , কত অপর্ণা, কত দুর্গাদিদি-জীবনের ও জন্ম মৃত্যুর বীথিপথ বাহিয়া ক্লান্ত ও আনন্দিত আত্মার সেকি অপরূপ অভিযান-শুধু আনন্দে , যৌবনে , জীবনে , পুণ্যে ও দুঃখে , শোকে ও শান্তিতে — এই সবটা লইয়া যে আসল বৃহত্তর জীবন — পৃথিবীর জীবনটুকু যার ক্ষুদ্র ভগ্নাংশ মাত্র — সে জীবনের অধিকার হইতে কাহারও বঞ্চনা করিবার

শক্তি নাই — তার মনে হইল সে দীন নয় , দুঃখী নয় , তুচ্ছ নয় — এটুকু শেষ নয় , এখানে আরম্ভও নয় । সে জন্ম জন্মান্তরের পথিক আত্মা , দূর হইতে কোন সুদূরের নিত্য নূতন পথহীন পথে তার গতি। এই বিপুল নীল আকাশ , অগন্য জ্যোতির্লোক " সপ্তর্ষি মণ্ডল , ছায়াপথ বিশাল অ্যান্ড্রোমিডা নীহারিকার জগৎ বহির্ষদ পিতৃলোক এই শত, সহস্র, শতাব্দী তার পায়ে চলার পথ --- তার ও সকলের মৃত্যুদ্বারা অস্পৃষ্ট সে বিরাট জীবনটা নিউটনের মহা সমুদ্রের মত সকলেরই পুরোভাগে অক্ষুন্নভাবে বর্ত্তমান --- নিঃসীম সময় বাহিয়া সে গতি সারা মানবের যুগে যুগে বাধাহীন হউক "। [১৭৭]

চোদ্দ

রোমান্টিকতা , বাস্তবতা : দ্বান্দ্বিক দর্শন

সাহিত্য নিছক বাস্তব নয় । সাহিত্য বাস্তবতার সঙ্গে রোমান্টিকতার সহজ মিতালী । কথা সাহিত্য বাস্তব জীবনের আলেখ্য হলেও তাতেও রোমান্টিকতার স্বপ্নিল আবেশ অল্প বিস্তর থেকেই যায় । এমনকি কঠোর বাস্তববাদী লেখকেরাও রোমান্টিকতাকে তাঁদের উপন্যাস --- দেহ থেকে নির্মূল করতে পারেন না ।

বাংলা কথা সাহিত্যে বিভূতিভূষণের রোমান্টিকতা একটু ভিন্ন ধরনের । তিনি রোমান্স রসের আমদানী করেছেন মূলতঃ প্রাকৃতিক বর্ণনা ও রূপলোকের অবেষ্টন রচনার মধ্যে দিয়ে পথের পাঁচালী ও অপরাজিত উপন্যাসে শিশুমনের রোমান্স অনেকবার প্রতিহত হয়েছে বয়স্ক মনের কাছে । হরিহর শিশু অপুর কৌতূহলী মনকে বার বার অবদমিত করে। বড় বড় কানওয়ালা খরগোশ দেখে অপু বিস্ময়সূচক প্রশ্ন করলে হরিহর সেই প্রশ্নের উত্তরকে

এড়িয়ে যায় ও বিরক্তও হয় : " কি জানি বাবা, তোমার কথার উত্তর দিতে আমি আর পারিনে । সেই বেরিয়ে অবধি শুরু করেচো --- এটা কি , ওটা কি --- কি গেল বনের মধ্যে তা কি আমি দেখেচি ? নাও এগিয়ে চল দিকি"।[১৭৮]

সর্বজয়া বাস্তববাদী চরিত্র । তার কাছে স্বামী --- কেবল মাত্র আশ্রয়দানের অধিপতি । ফুলের সাজিকেও সে মসলা রাখার পাত্র রূপে ব্যবহার করে । স্বপ্ন দেখলেও সর্বজয়া রোমান্টিক নয় । শিশুর সরস সতেজ মন , সর্বজয়ার বাস্তববাদী মনের কাছে নিত্যই পিষ্ট হয়ে গেছে ।

রোমান্টিকতা ও বাস্তবতার দ্বন্দে রোমান্টিক মনোভাবের পরাজয়ের একটি চিত্র পাই পথের পাঁচালীর একাদশ পরিচ্ছেদে । দুর্গা অপুর কুড়িয়ে পাওয়া কাঁচের টুকরোকে সর্বজয়া হীরে মনে করে আশাবাদী হয় । কিন্তু বাস্তবতার প্রবল ঝড়ে সর্বজয়ার রোমান্টিক বাসনা অচিরাৎ উবে গেল কর্পূরের মত। ' অক্রূর সংবাদ ' ও ' অপরাজিত ' উপন্যাসে অপুর রোমান্স বিলাসী মন বাস্তবের রূঢ় আঘাতে বার বার আহত হয়েছে । অপরাজিততে দেখা যায় অপুর জীবনের প্রবলতা । পথ চলতে গেলে এখন পদে পদেই আঘাত , দেহমনে রক্ত

ঝরে । অপর্ণার সঙ্গে অপুর দাম্পত্য জীবনে যে রোমান্সের ধারা বয়ে চলছিল মৃত্যু এসে তা কেড়ে নিয়ে গেল ।

অপুর রোমান্স বিলাসী মন চাকরীর অভাবে , স্কুল জীবনের বিভিন্ন সমস্যা সর্বোপরী প্রিয়জনকে হারানোর বেদনায় প্রতিহত হয়েছে । কিন্তু এসব সত্বেও অপু জন্ম রোমান্টিক । রবীন্দ্রনাথের ' রক্তকরবী ' নাটকে রক্ত করবী পুষ্পটি সহস্র বাধার ভেতর দিয়েও সতেজ প্রাণের অমর অস্তিত্ব প্রকাশ করে । তেমনি অপুর রোমান্টিক মন বাস্তব জীবনের শত আঘাতেও মরে যায় নি । অপরাজিতর শেষ দিকে অপুর নিরুদ্দেশ যাত্রা তার চির রোমান্টিক সত্তার বিজয় বার্তারই বার্তাবহ ।

পনেরো

আশ্রিতার পাঁচালী

বিভূতিভূষণ কতখানি মানবদরদী ছিলেন তার এক বড় প্রমাণ পাওয়া যায় পথের পাঁচালী ও অপরাজিত উপন্যাসে কয়েকটি আশ্রিতা নারীর ব্যথাতুর জীবনের প্রতি লেখকের মমত্ববোধের মধ্যে । একদিক থেকে দেখতে গেলে দেখা যায় পথের পাঁচালী উপন্যাসটি যেন আশ্রিতার পাঁচালী । এই আশ্রিতার তালিকায় যাঁর নাম সর্বাগ্রে তিনি হলেন ইন্দির ঠাকুরুন ।

মানুষ স্বাধীনতা চায় । পরাধীনতার চেয়ে বড় যন্ত্রণা আর কিছু নেই । আশ্রিতজনের চেয়ে হতভাগ্য আর বোধ হয় কেউ নেই । ' পথের পাঁচালী ' উপন্যাসের ' বল্লালী বালাই ' অংশের নায়িকা-স্থানীয়া চরিত্র ইন্দির ঠাকুরুন এক ভাগ্য বঞ্চিতা আশ্রিতা নারী । ভাই হরিহরের সংসারে তিনি যেন গলগ্রহ , অন্ততঃ সর্বজয়ার কাছে । সর্বজয়ার খোঁটা তাঁর জীবনকে ব্যতিব্যস্ত করে তোলে । যে বয়সে শান্তির

প্রয়োজন সে বয়সে শান্তি নেই , অশান্তির আগুনে পুড়ে যাচ্ছে তাঁর মন । ঘরের মানুষ তাঁকে পর ভাবে । সব সময় তাঁকে নিয়ে দূর দূর ছাই ছাই , কোন স্বাধীনতাই নেই । শুধু অতীতের হারিয়ে যাওয়া দিনগুলির স্মৃতি রোমন্থন করে ক্ষণিক সুখ সাগরে ভাসার বাসনা ।

ইন্দির ঠাকরুণের জীবনটা বড় অসহায় । তাঁর স্বামীও তাঁকে জীবনসঙ্গী করেনি :

" স্বামী বিবাহের পর কালেভদ্রে এ গ্রামে পদার্পণ করিতেন । এক-আধ রাত্রি কাটাইয়া পথের খরচ ও কৌলিন্য সম্মান আদায় করিয়া লইয়া , খাতায় দাগ আঁকিয়া পরবর্তী নম্বরের শ্বশুরবাড়ী অভিমুখে তল্পী-বাহক সহ রওনা হইতেন , কাজেই স্বামীকে ইন্দির ঠাকুরুন ভাল করে মনে করিতেই পারে না । "[১৭৯]

বাপমায়ের মৃত্যুর পর ভাই এর সংসারে দু-মুঠো অন্নের বরাত তার ভাগ্যে বেশিদিন হল না , কারণ অল্প বয়সে ভাইয়ের মৃত্যু হল । হরিহরের পিতা রামচন্দ্র রায় যেদিন ভিটে তুললেন সেদিন থেকেই ইন্দির ঠাকুরুন এসংসারে প্রবেশ করলেন । তারপর কতদিন কেটে গেছে কত গোলক চক্রবর্তী , ব্রজ চক্রবর্তী কালের স্রোতে

ভেসে গেছে শুধু ইন্দির ঠাকুরুন তাঁর ভাঙ্গা কপাল নিয়ে আজও বেঁচে আছেন। হরিহরের সংসারে যেখানে ইন্দির ঠাকুরুন বয়সের দিক থেকে সবচেয়ে বড় সেখানে তিনিই সবচেয়ে উপেক্ষিতা। ইন্দির ঠাকুরুন সকলের কাছে একটি বোঝা। জামাই চন্দ্র মজুমদার , হরিহর সর্বজয়া এমন কি শেষে গ্রামের মানুষেরও আশ্রিতা রূপেই তাঁকে দেখা যায় । ' বল্লালী - বালাই ' অংশের শেষ দিকে অনেকদিন পর যখন ইন্দির ঠাকুরুন হরিহরের ঘরে তার হারানো ভিটায় ফিরে এসে সর্বজয়ার কাছে ব্যাকুলভাবে ঠাঁই পাবার ভিক্ষে করতে লাগলেন তখন আশ্রিতার ব্যথা যে কত তা বোঝা যায় :

" সে হঠাৎ একেবারে কাঁদিয়া বলিল — ও বৌ , অমন করে বলিস নে — একটুখানি ঠাঁই দে আমারে — কোথায় যাবো আর শেষ কালডা বল্ দিকিনি — তবু এই ভিটেটাতে — "[১৮০]

কঠিন হৃদয় সর্বজয়া তাকে তবুও ঠাঁই দিল না । আশ্রিতা --- ইন্দির ঠাকুরুন আশ্রয় হারাল ।

ইন্দির ঠাকুরুন শুধু নিশ্চিন্দিপুরের অতীত ইতিহাসের প্রবীনা সাক্ষীই নন , বিভূতিভূষণ তাঁর মধ্যে যেমন মহাকালের চলমান ধারায় অপুর আবির্ভাবের প্রাক্‌লগ্নের

পরিচয় দিয়েছেন তেমনি তাঁর মধ্যে প্রকাশ করেছেন এক অসহায় ও আশ্রিতা নারীর জীবন --- যন্ত্রনাকে । সর্বজয়া যে সংসারের কর্তৃ ঠাকুরুন সে সংসারে ইন্দির ঠাকুরুন উপেক্ষিতা ও আশ্রিতা অবশ্যই । জীবন রঙ্গমঞ্চ থেকে এহেন ইন্দির ঠাকুরুন যেদিন বিদায় নিলেন সেদিনই তাঁর আশ্রিতা জীবনের অবসান ঘটল ।

ইন্দির ঠাকুরুনকে যত সহজে আশ্রিতা বলে প্রমান করা যায় , সর্বজয়াকে আশ্রিতা বলা ততখানিই শক্ত । সর্বজয়া তার সংসারে নিজের শাসন চালিয়েছে , অপরের কর্তৃত্ব তাকে সহ্য করতে হয়নি । তার আশ্রিত জীবনের সূচনা হরিহরের মৃত্যুর পরে । স্বামীকে হারিয়ে যেদিন থেকে সর্বজয়া ধনীগৃহে রাঁধুনির কর্মে নিযুক্ত হল সেদিন থেকেই সে আশ্রিতা ।

এর আগে কিন্তু একবারও মনে হয় নি যে সর্বজয়ার মত এমন তেজস্বী রমনীর এমন দুর্ভাগ্য ঘটবে । কুন্দনন্দিনীর স্বপ্নে যেমন তার জীবনের আগামী বিপর্যয়ের বীজ বপন করেছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র , বিভূতিভূষণও তেমনি সর্বজয়ার ভবিষ্যৎ জীবনের অশান্তির বীজ বুনেছেন হরিহরের মৃত্যুতে । পথের পাঁচালী উপন্যাসের শেষদিকে

আমরা সর্বজয়ার মধ্যে আশ্রিতা নারীকে খুঁজে পাই একথা সত্য কিন্তু এখনও সে কারও বোঝা হয়ে ওঠেনি । এখানে সে সম্পুর্ণ পরাশ্রয়ী নয় কারণ কাজে কর্মে এখনও সে সক্রীয় । অবশ্য একথা সত্য যে নিশ্চিন্দিপুরে নিজের সংসারে সর্বজয়াকে আমরা তার দীন কুটিরে সম্রাজ্ঞীর ভূমিকায় দেখতে পাই , তা এখন আর পাই না ।

অপরাজিত উপন্যাসে সর্বজয়ার মধ্যে আমরা তার আগের ক্ষাত্রতেজ খুঁজে পাইনা , এখন স্রোতস্বিনী যেন স্রোত হারা । কাজে কর্মে মন নেই , কর্মহীন পূর্ণ অবকাশে শুধু অপুর কথা মনে পড়ে । এখন অপু সর্বজয়ার উপর নির্ভরশীল নয় , সর্বজয়াই এখন অপুর উপর নির্ভরশীল হয়ে উঠেছে । অবশ্য একথা সত্য যে অপরাজিত উপন্যাসের প্রথম দিকে সর্বজয়া মনসাপোতায় স্বাধীন হয়েছে । কিন্তু পরে সেই স্বাধীনতাও তাকে স্বাধীন করতে পারেনি । জীবন সায়াহ্নের সর্বজয়া তরুলতার মত অবলম্বন চেয়েছে ।

ইন্দির ঠাকুরুন ও সর্বজয়ার আশ্রিত জীবনের মধ্যে পার্থক্য আছে । ইন্দির ঠাকরুণের আশ্রিত জীবন কথা মনকে করুন রসে ভরিয়ে দেয় , অন্যদিকে সর্বজয়ার

আশ্রিত জীবন ট্রাজেডির পরিচায়ক । ইন্দির ঠাকুরুন যেন জন্ম আশ্রিতা । সুতরাং এহেন জন্ম আশ্রিতার দুঃখ কষ্ট গা সওয়া হয়ে গেছে । সংগ্রামী নারী সর্বজয়ার জীবন গোধূলির পর নির্ভরতার বাসনা। ট্রাজেডিরই পরিচায়ক ।

ষোল

পথের পাঁচালী ও লোকসংস্কৃতি

' পথের পাঁচালী ' উপন্যাসের কেন্দ্রীয় পটভূমি গ্রাম । পল্লীপ্রকৃতি যেমন এখানে তার রূপ রস — বর্ণ — বৈচিত্র্যে প্রকাশিত হয়েছে , তেমনি স্পষ্টভাবে প্রকাশ পেয়েছে এর লোকায়ত জীবনধারা ও লোকঐতিহ্যের । পল্লীবাংলার নিজস্ব সম্পদ লোকসংস্কৃতির বিচিত্র তথা বিশাল ভান্ডারের পরিচয় পাওয়া যায় উপন্যাসটির পাতায় পাতায় । অধ্যাপক সুভাষ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাষায় : " ' পথের পাঁচালী ' উপন্যাসটি লোকায়ত জীবন ধারায় সমস্ত পরিচয় বহন করে আছে । ' পথের পাঁচালী ' উপন্যাসে সর্বত্রই ছাড়িয়ে আছে লৌকিক উপাদান ও লোক ঐতিহ্যের স্পর্শ " [১৮১]

পথের পাঁচালী উপন্যাসে লোক সংস্কৃতির বিভিন্ন উপাদান --- লোকবিশ্বাস , লোক --- উৎসব , ছড়া , ব্রতকথা , রূপকথা , কিংবদন্তী , প্রবাদ-প্রবচন যেন ছবির ক্যানভাসে ধরা পড়েছে । উপন্যাসটিতে লোকসংস্কৃতির

বিভিন্ন উপাদান পাওয়া গেলেও ছড়ার স্থানই প্রধান , অর্থাৎ সংখ্যার দিক থেকে ছড়াই প্রাধান্য লাভ করেছে । ইন্দির ঠাকরুণের মুখনিঃসৃত ছড়াগুলি উপভোগ্য ও জীবন রসে সিক্ত । দুর্গার কাছে ইন্দির ঠাকরুণ তার বহুদিনের শেখা ছড়াগুলি আবৃত্তি করে :

" ও লালিতে চাঁপ কালিতে একটি কথা শুন্‌সে ,
রাধার ঘরে চোর ঢুকেছে — " [১৮২]

ছড়া আবৃত্তি করে ইন্দির ঠাকরুণ তার দুঃখদুর্ভর মনটাকে হাল্কা করে অনুরূপভাবে সর্বজয়া ও দুর্গার মুখ থেকেও আমরা ছড়া শুনতে পাই । শিশু অপুকে ঘুম পাড়াতে গিয়ে সর্বজয়া বলে :

" আয়রে পাখী — ই — ই লেজ ঝোলা , আমার খোকনকে নিয়ে — এ — এ গাছে তোলা " [১৮৩] .....

দুর্গা এক ঝড়বৃষ্টির দিনে বৃষ্টি থামানোর জন্য ছড়া আবৃত্তি করে :

" নেবুর পাতায় করমচা ,
হে বৃষ্টি ধরে যা — " [১৮৪]

এই ছড়া আবৃত্তি করলে বৃষ্টি থেমে যাবে , দুর্গার নিষ্পাপ শিশুমনে এই ধারণা আছে । চড়ক উৎসবে

নিশ্চিন্দিপুর গ্রামের শিশুহৃদয় মগ্ন হয়ে ছড়া আবৃত্তি করে :

" স্বগগো থেকে এলো রথ
নামলো খেতু তলে
চব্বিশ কুটী বান বর্ষা শিবের সঙ্গে চলে ---
সত্যযুগের মড়া আর আওল যুগের মাটি
শিব শিব বলরে ভাই ঢাকে দ্যাও কাঠি " [১৮৫]

ব্রতকথার মধ্যে পুণ্যিপুকুর ব্রত , সাবিত্রী ব্রত , সেঁজুতি ব্রত --- প্রভৃতির উল্লেখ আছে । দুর্গা পুন্যিপুকুর ব্রতে আবৃত্তি করে :

" পুন্যিপুকুর পুষ্পমালা কে পূজেরে দুপুরবেলা ? আমি সতী লীলাবতী ভাই এর বোন্ ভাগ্যবতী --- " [১৮৬] সেঁজুতি ব্রতে দুর্গার আল্পনার মধ্যে লোকশিল্পের পরিচয় পাওয়া যায় ।

বিভূতিভূষণ গ্রাম বাংলার পথে পথে হেঁটে বাংলার নিজস্ব সম্পদ লোক ঐতিহ্যের সঙ্গে পরিচিত হয়ে সেই মূল্যবান সম্পদ সমূহকে আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন । পথের পাঁচালী উপন্যাসে লৌকিক উপাদানের বর্গীকরণ করে উক্ত উপাদান গুলিকে চুম্বকের আকারে তুলে ধরার চেষ্টা করছি :

' পথের পাঁচালী ' উপন্যাসে বিধৃত লৌকিক উপাদান

(পেপারব্যাক সংস্করণ --- সপ্তম মুদ্রন অবলম্বনে)

লোকভাষা ও লোকশব্দ

১.	' মাটির ছোবা '	পৃষ্ঠা ১
২.	' নাল ফুলের '	পৃষ্ঠা ২
৩.	ছেঁচতলায়	পৃষ্ঠা ৮
৪.	' আচ্ছয়ের জন্যি '	পৃষ্ঠা ১৫
৫.	' টো টো টোকলা '	পৃষ্ঠা ২৭
৬.	' সকড়ী হাত '	পৃষ্ঠা ৩০
৭.	' খেগে যা না '	পৃষ্ঠা ৩৪
৮.	' দ্যাখ দিখি কাণ্ড-কেন বাপু দিক করিস '	পৃষ্ঠা ৪৬
৯.	' গলুই এ চুপ '	পৃষ্ঠা ১৫২
১০.	' নাউ '	পৃষ্ঠা ১৫৭
১১.	' ইস্টিশান ! ইস্টিশান '	পৃষ্ঠা ১৬৬
১২.	নারকেলের ফোঁপল	পৃষ্ঠা ১৭৩
১৩.	মুই মাত্তিও যাইনি ধত্তিও যাইনি	পৃষ্ঠা ৬৫

১৪. টেলিগিরাপের তার পৃষ্ঠা ৭৬

১৫. উদ্‌ঘুট্টি পৃষ্ঠা ৭৬

১৬. গব্‌রাটে পৃষ্ঠা ৯৬

১৭. ' বেত্তোর্তে ' পৃষ্ঠা ১০১

১৮. ' হান্ডুল পান্ডুল ' পৃষ্ঠা ১০১

১৯. ' হতি না হতি মোরে ' পৃষ্ঠা ৮৮

২০. ' পূন্নিমের দিনটা ' পৃষ্ঠা ১৭৫

লোকাচার , লোক - বিশ্বাস ও লোকসংস্কার

১. ' কালপুরের পীরির দরগায় সিন্নি দেবেন
--- বড় রক্ষে করেছেন রাত্তিরে '।
পৃষ্ঠা ৮

২. ' অনখ সময়ে না খেয়ে চলে গিয়ে তারপর
গেরস্তর একটা অকল্যাণ বাধুক '।
পৃষ্ঠা ১৮

৩. ' কুশী করিয়া গঙ্গাজল লইয়া ডাক দিল '।
পৃষ্ঠা ২১

৪. ' কপালের মাঝখানে একটা টিপ পরাইয়া দিত '

পৃষ্ঠা ৪৬

৫. "ভয় কিরে ! রাম রাম — রাম রাম রাম —
নেবুর পাতায় করমচা হে বিষ্টি ধরে যা —
নেবুর পাতায় করমচা হে বিষ্টি ধরে যা —"

পৃষ্ঠা ৫১

৬. " তুলসীতলায় প্রদীপ দিতে দিতে গলায় আঁচল দিয়া প্রণাম করিয়া বলিল --- ঠাকুর নারকোল ওরা শত্তুরতা করে কুড়ুতে যায়নি সে তো তুমি জানো , এ গাল যেন ওদের না লাগে "

পৃষ্ঠা ৫৩

৭. "রানী বলিল — আহা , তা বুঝি আর জানি নে ?একজন মড়া হবে । তাকে বেধেঁ নিয়ে যাবে শ্মাশানের সেই ছাতিম তলায় । [redacted] তাকে আবার বাঁচাবে, তারপর মড়ার মুণ্ড নিয়ে আসবে — ছড়া বলতে বলতে আসবে — ওর সব মন্তর আছে "

পৃষ্ঠা ১১৬

৮. ' আজ ওরাঁ সব বেরিয়েছেন কিনা '
পৃষ্ঠা ১১৭

৯. ' রাম রাম-রাম রাম-' পৃষ্ঠা ১১৭

১০. ' লক্ষ্মীর আলতাপরা পায়ের দাগ আঁকা আঙ্গিনায় ' পৃষ্ঠা ১২৬

১১. ' মা , সিদ্ধেশ্বরী স — পাঁচ আনার ভোগ দেবো , ভাল খবর এনে দাও মা '
পৃষ্ঠা ১৩১

১২. পূর্ণিমা কি চতুর্দ্দশী পৃষ্ঠা ১৬০

১৩. ' বউনি হয়নি ' পৃষ্ঠা ৬২

১৪. ' কাপড় ছাড়বো মা ? আমার এখানা ওবেলার কাপড় ' পৃষ্ঠা ৬৫

১৫. ' বিলাতী আমড়া পাড়িবার অপরাধে ডাইনীটা জেলেপাড়ার কোন্ এক ছেলের প্রাণ কাড়িয়া লইয়া কচুর পাতায় বাঁধিয়া জলে ডুবাইয়া রাখিয়াছিল ' পৃষ্ঠা ৬৪

১৬. ' ছত্তরে খেতে হয় ' পৃষ্ঠা ১৮৪

১৭. ' একটি মাদুলি পান ' পৃষ্ঠা ৭

রূপকথার প্রয়োগ

১. " রূপকথার রাজ্য ? শ্যাম লঙ্কার দেশে বেঙ্গমা - বেঙ্গমীর গাছের নীচে , নিবার্সিত রাজপুত্র যেখানে তলোয়ার পাশে রাখিয়া একা শুইয়া রাত কাটায় । " পৃষ্ঠা ২৫

২. ' ঐ সব দেশের রাজপুত্তুরদের কথাই সে শোনে ' পৃষ্ঠা ৩০

৩. ' রূপকথার রাজপুত্র ও রাজকন্যার হীরামুক্তার অলঙ্কারের ঘটা সে অনেকবার শুনিয়াছে ' পৃষ্ঠা ৪৪

৪. ' সেঁজুতির আল্‌পনা আঁকার মন্ত্রের সঙ্গে ' পৃষ্ঠা ১২৬

লৌকিক ছড়া

১. " ও ললিতে - চাঁপকলিতে একটা কথা শুনসে, রাধার ঘরে চোর ঢুকেছে --- " পৃষ্ঠা ৫

২. " লাথি ঝাঁটা পায়ের তল
ভাত পাথরটা বুকের বল " পৃষ্ঠা ১৭

৩. " আয় রে পাখি-ই-ই লেজঝোলা ,
আমার খোকনকে নিয়ে - এ - এ গাছে তোলা "
(ছেলেভুলানো ছড়া) পৃষ্ঠা ৪৬

৪. " স্বগ্‌গো থেকে এলো রথ
নামলো খেতুতলে
চব্বিশ কুটী বানবর্ষা শিবের সঙ্গে চলে ---
সত্যযুগের মড়া আর আওল যুগের মাটি ,
শিব শিব বল রে ভাই ঢাকে দ্যাও কাঠি "
পৃষ্ঠা ১১৬

৫. " হলুদ বনে বনে -
নাক-ছাবিটি হারিয়ে গেছে সুখ নেইকো মনে "
পৃষ্ঠা ১১৯

৬. " শ্যামলঙ্কা --- বাট্‌না বাটে মাটিতে
লুটায় কেশ " পৃষ্ঠা ১৩১

৭. " মুণির চিন্তা চিন্তামণি নাই অন্য আশা
নিষ্কর্মা লোকের চিন্তা তাস আর পাশা ।
ধনীর চিন্তা ধন আর নিরেনব্বই এর ধাক্কা ,

যোগীর চিন্তা জগন্নাথ , ফকিরের চিন্তা মক্কা ,
গৃহস্থের চিন্তা বজায় রাখতে চারিচালের ঠাট্‌টা
শিশুর চিন্তা সদাই মাকে, পশুর চিন্তা পেট্‌টা "
পৃষ্ঠা ১৯৭

লোক উৎসব / লোক --- পার্বণ

১. ' পৌষ পার্ব্বণের দিন ' পৃষ্ঠা ৩
২. ' গোঁসাই পাড়ায় চড়কের ঢাক এখনও
বাজিতেছে , মেলা এখনও শেষ হয় নাই '
পৃষ্ঠা ১৯
৩. ' চড়কের মেলা ' পৃষ্ঠা ১৬৩

লৌকিক দেবতা ও লৌকিক দেবী

১. ' করুণাময়ী বনদেবীরা বণের তুচ্ছ ফুলফল
মিষ্টি মধুতে ভরাইয়া রাখেন ' পৃষ্ঠা ৪৩
২. ' সিদ্ধেশ্বরী ' পৃষ্ঠা ১৩১
৩. ' পঞ্চানন্দ ঠাকুর গ্রামের দেবতা ' পৃষ্ঠা ৮১

৪. ' বনলক্ষ্মী ' পৃষ্ঠা ৮৭

প্রবাদ

১. ' পটের বিবি ' পৃষ্ঠা ৬০
২. ' মুখচোরার রাজা ' পৃষ্ঠা ১৪৩
৩. ' হাঁ --- করা ছেলে ' পৃষ্ঠা ৭০
৪. মাকাল ফল পৃষ্ঠা ৭৮
৫. ' হাঘরে হাড়হাবাতে ' পৃষ্ঠা ৯১

কিংবদন্তী

১. " কোন এক সময়ে ঐ মন্দিরে বিশালাক্ষী দেবী সেই রকম ছিলেন । তিনি ছিলেন গ্রামের মজুমদার বংশের প্রতিষ্ঠিত দেবতা , এক সময়ে কি বিষয়ে সফল মনস্কাম হইয়া তাঁহারা দেবীর মন্দিরে নরবলি দেন। তাহাতে রুষ্টা হইয়া দেবী স্বপ্নে জানাইয়া যান যে তিনি

মন্দির পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন ,
আর কখনো ফিরিবেন না " পৃষ্ঠা ৮১

লোক ঔষধ

১. ' পাথরকুচির পাতা তুলিয়া বাটিয়া
আঙুলে বাঁধিয়া দিল ' পৃষ্ঠা ৭২

২. ' কাপড়ে ফুঁ পাড়িয়া চোখে ভাপ দিতে
লাগিল ' পৃষ্ঠা ৭৯

পাঁচালী

১. " রাজা বলে শুন শুন মুনির নন্দন ।
কহিব অপূর্ব কথা না যায় বর্ণন ।
সোমদত্ত নামে রাজা সিন্ধুদেশে ঘর ।
দেবদ্বিজে হিংসা সদা অতি --- " পৃষ্ঠা ৩১

ধাঁধা

১. ' বালুচরের বালুর চরে একটা কথা কই
মোষের পেটে ময়ূরছানা দেখে এলাম সই '
পৃষ্ঠা ১০৩

লোক - শিল্পের উদাহরণ

১. ' তালপাতার চাটাইখানা ' পৃষ্ঠা ১০৭
২. ' বেতের প্যাঁটরা কড়ির আলনা ' পৃষ্ঠা ৭৯
৩. ' পল্‌তার বড়া ' পৃষ্ঠা ১২৬
৪. ' সেঁজুতির আলপনা ' পৃষ্ঠা ১২৬

ব্রতকথার উদাহরণ

১. " পুণ্যি পুকুরের ব্রত করিতেছে । উঠানে ছোট্ট চৌকণা গর্ত্ত কাটিয়া তাহার চারিধারে ছোলা , মটর ছড়াইয়া দিয়াছিল --- ভিজে মাটিতে সেগুলির অঙ্কুর বাহির হইয়াছে --- চারিদিকে

কলার ছোট বোগ পুঁতিয়া ধারে পিটুলি গোলার আলপনা দিতেছে পদ্মলতা , পাখী , ধানের শীষ , নতুন ওঠা সূর্য্য " পৃষ্ঠা ৫২

২. ' সেঁজুতির আলপনা আঁকার মন্ত্রের সঙ্গে ' পৃষ্ঠা ১২৬

৩. ' কলুইচন্ডী ব্রতের ' পৃষ্ঠা ৮৩

সতেরো

চিত্রানুষঙ্গ

পথের পাঁচালী ' উপন্যাসে চিত্রের এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে । গ্রন্থটি চিত্র সর্বস্ব মূলক । উপন্যাস রচনায় লেখক বর্ণনাত্মক ভঙ্গী আশ্রয় নিয়েছেন । মানুষের সুখ --- দুঃখ , কান্না হাসি , আশা নিরাশার কাহিনী লেখক চিত্রের সাহায্যে বর্ণনা করেছেন।

আলোচ্য উপন্যাসে উপন্যাস দেহটি থেকে চিত্রগুলিকে বাদ দেওয়া যায় না , কারণ চিত্রগুলি উপন্যাসের অলঙ্কার নয় , নিঃশ্বাস — প্রশ্বাসের মতই এখানে চিত্রগুলি স্বাভাবিক । বঙ্কিম চন্দ্রের উপন্যাসে চিত্র যেন উপন্যাসের অলঙ্করণ ; সেখানে চিত্রগুলি বাহ্যিক ও অতিরিক্ত অংশ । তাঁর উপন্যাসে চিত্রগুলিকে বাদ দিলেও উপন্যাসের কিছু ক্ষতি হয় না -। ' বিষবৃক্ষ ' উপন্যাসের কিছু উদাহরণ দিয়ে দেখান যেতে পারে যে চিত্র সমষ্টি বাইরের অলঙ্করণে যতটা সাহায্য করেছে , কেন্দ্রিয় কাহিনীতে চিত্রের ভূমিকা

ততখানি নেই । " নগেন্দ্র দেখিতে দেখিতে গেলেন , নদীর জল অবিরল চল্ চল্ চলিতেছে — ছুটিতেছে বাতাসে নাচিতেছে — রৌদ্রে হাসিতেছে — আবর্ত্তে ডাকিতেছে । জল অশ্রান্ত-অনন্ত-ক্রীড়াময় । জলের ধারে তীরে তীরে মাঠে মাঠে রাখালেরা গোরু চরাইতেছে , কেহবা বৃক্ষের তলায় বসিয়া গান করিতেছে , কেহবা তামাকু খাইতেছে , কেহবা মারা মারি করিতেছে , কেহ কেহ ভুজা খাইতেছে । কৃষকে লাঙ্গল চষিতেছে , গোরু ঠেঙ্গাইতেছে , গোরুকে মানুষের অধিক করিয়া গালি দিতেছে , কৃষাণকেও কিছু কিছু ভাগ দিতেছে । ঘাটে ঘাটে কৃষকের মহিষীরাও কলসী , ছেঁড়া কাঁথা , পচা মাদুর , রূপার তাবীজ , নাকছাবি , পিতলের পৈঁচে , দুই মাসের ময়লা পরিধেয় বস্ত্র , মসী নিন্দিত গায়ের বর্ণ , রুক্ষকেশ লইয়া বিরাজ করিতেছে । তাহার মধ্যেই কোন সুন্দরী মাথায় কাদা মাখিয়া মাথা ঘষিতেছে । কেহ ছেলে ঠেঙাইতেছেন , কেহ কোন অনুদ্দিষ্টা , অব্যক্তনাম্নী প্রতিবাসিনীর সঙ্গে উদ্দেশ্যে কোন্দল করিতেছে , কেহ কাষ্ঠে কাপড় আছড়াইতেছে । " [১৮৭]

উক্ত বর্ণনাটি বাহ্যিক অলঙ্করণ মাত্র , মূল বিষয় নয় । এর সঙ্গে ' পথের পাঁচালী ' উপন্যাসে দুর্গার আমখাওয়ার দৃশ্যটি

তুলনা করলেই দেখা যায় যে সেই চিত্রটি উপন্যাসের কত প্রয়োজনীয় অংশ --- " মায়ের ডাক আর একবার কানে গেলেও দুর্গার এখন উত্তর দিবার সুযোগ নাই , মুখ ভর্তি । সে তাড়াতাড়ি জারানো আমের চাক্‌লা গুলি খাইতে লাগিল । পরে এখনও অনেক অবশিষ্ট আছে দেখিয়া কাঁঠাল গাছটার কাছে সরিয়া গিয়া গুঁড়ির অড়ালে দাঁড়াইয়া সেগুলি গোগ্রাসে গিলিতে লাগিল " [১৮৮] এই বর্ণনাটির সাহায্যে দুর্গার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করা হয়েছে । বঙ্কিম চন্দ্রের ' বিষবৃক্ষে ' র বর্ণনাটির সঙ্গে উক্ত উপন্যাসের নাড়ীর যোগ নেই , কিন্তু পথের পাঁচালীর উক্ত চিত্রটির সঙ্গে গ্রন্থের নাড়ীর যোগ আছে । শরৎচন্দ্রের ' শ্রীকান্ত ' চিত্র সর্বস্ব মূলক উপন্যাস কিন্তু ' পথের পাঁচালী ' তে চিত্র যতখানি সক্রিয় ও সজীব শ্রীকান্ত উপন্যাসে ততখানি নয় । শরৎচন্দ্র নরনারীর অন্তরঙ্গ মনের পরিচয় দিতে গিয়ে চিত্র অপেক্ষা হৃদয়ানুভূতির উপর অধিক নির্ভরশীল , অন্যদিকে বিভূতিভূষণ ' পথের পাঁচালী ' উপন্যাসে মানুষের অন্তর মনের পরিচয় দিতে গিয়েও চিত্রের সাহায্য নিয়েছেন ।

' পথের পাঁচালী ' গ্রন্থে চিত্রের ভূমিকা প্রধান । গোটা গ্রন্থটাই --- খণ্ড খণ্ড চিত্রের সমষ্টি । লেখক খণ্ড খণ্ড চিত্রের

ফুল দিয়ে গ্রন্থরূপ মালাটি গেঁথেছেন , সুতরাং ফুলগুলি ছিঁড়েদিলে মালাটির আর কিছুই বাকি থাকে না । অপুর পাঠশালার দৃশ্যটিও উপভোগ্য । " গুরু মশায় দোকানের মাচায় বসিয়া দাঁড়িতে সৈন্ধব লবন ওজন করিয়া কাহাকে দিতেছেন , কয়েকটি বড় বড় ছেলে আপন আপন চাটাইএ বসিয়া নানরূপ কৃস্বর করিয়া কি পড়িতেছে ও ভয়ানক দুলিতেছে । তাহার অপেক্ষা আর একটু ছোট একটি ছেলে খুঁটিতে ঠেস দিয়া আপন মনে পাততাড়ীর তালপাত মুখে পুরিয়া চিবাইতেছে । আর একটি বড় ছেলে , তাহার গালে একটা আঁচিল , সে দোকানের মাচার নীচে চাহিয়া --- কি লক্ষ্য করিতেছে । তাহার সামনে দুজন ছেলে বসিয়া শ্লেটে একটা ঘর আঁকিয়া কি করিতেছিল " [১৮৯] অপুর চেতনা বিকাশে তার পাঠশালর এই দৃশ্যটি এক প্রয়োজনীয় অংশ । ইন্দির ঠাকুরুণের চালভাজা খাওয়ার দৃশ্যটি আরও জীবন্ত ও প্রয়োজনীয় । এখানে দুর্গার মাতৃমন প্রকাশিত হয়েছে মাত্র একটি বাক্যে — ' তা হোক পিতি তুই খা ।'

লেখক আবার কখনো অলঙ্করনের জন্যও চিত্রের সাহায্য নিয়েছেন — " মাঠের ঝোপঝাড়

গুলো ....." [১৯০]

আলোচ্য উপন্যাসটির চিত্র সর্বস্বতার উদাহরণ দিতে হলে সমস্ত গ্রন্থটিই তুলে ধরতে হয় । এখানে শুধু চিত্রের ব্যবহারই নেই , চিত্রবহুলতাও আছে । উপন্যাসটি চিত্রের মাধ্যমেই যেন বেড়ে উঠেছে , চিত্রের খণ্ডখণ্ড মাংসপিন্ডের যোগে গড়ে উঠেছে গ্রন্থটির দেহ । প্রশ্ন হতে পারে যে চিত্র সর্বস্বতা কি ' পথের পাঁচালী ' উপন্যাসের একটি ত্রুটির দিক নয় ? উত্তরে বলা যায় যে চিত্র সর্বস্বতা — এই উপন্যাসের বৈশিষ্ট্য হলেও একটি ত্রুটিপূর্ণ দিকও বটে । মনস্তত্ত্বের পরিচয় উপন্যাসে যত বেশী থাকে , উপন্যাস ততই সার্থক হয়ে উঠে । লেখক এখানে মনস্তত্ত্ব ব্যাখ্যার চেয়ে চিত্রের সাহায্য বেশী নিয়েছেন , যাতে আন্তরিক দিকটিকে উপেক্ষা করা হয়েছে বলেই মনে হয় ।

অবশ্য এসব স্বত্ত্বেও বলতে হয় যে ' পথের পাঁচালী ' - উপন্যাসে লেখক চিত্রের ব্যবহার করেছেন উপন্যাসের জীবনের প্রয়োজনে । এই উপন্যাসে চিত্র উপন্যাস দেহের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত হয়ে উপন্যাসকে গতিমুখর করেছে । ' পথের পাঁচালী '- উপন্যাসের সঙ্গে চিত্রের যেন রক্ত মাংসের সম্পর্ক ।

আঠারো

সখ্যভাব : সখ্য প্রীতি

বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্যে সখ্যরস পঞ্চরসেরই অন্যতম রস । বিভূতি সাহিত্যে সখ্যরস এক মণোহরতম প্রকাশ । সখ্য রসে ঐশ্বর্য্যের ভাব না থাকাই উচিত , ঐশ্বর্য্যের গরিমায় এ রসের স্ফুরন ঘটে না । বিভূতিভূষণের সখ্যরসে অহংবোধ নেই , আছে সমপ্রাণতা । তাঁর রচনায় শুধু মধ্য বয়সী চরিত্রের মধ্যেই নয় , শিশু এবং বৃদ্ধের মধ্যেও সখ্যরস প্রবাহিত । তিনি প্রেমকেও দেখেছেন সখার দৃষ্টিতে — একথা অযৌক্তিক নয় ।

পথের পাঁচালী , অপরাজিত , আরণ্যক , দৃষ্টিপ্রদীপ প্রভৃতি উপন্যাসে ও ছোট গল্পে সখ্য রসের ধারাটি সুস্পষ্ট ভাবে প্রকাশ পেয়েছে । অপুর মধ্যে সখ্যভাব যথেষ্ট পরিমানে লক্ষ্য করা যায় । দুর্গা একাধারে অপুর ভগিনী ও সহচরী । তার সঙ্গে অপুর ভাই বোন সম্পর্ক ছাড়াও অন্য আর একটা সম্পর্ক লক্ষ্য করা যেতে পারে । যাকে সখা

সখীর সম্পর্ক বললে ভূল হয় না । উভয়ের সম্পর্কে বয়সের তারতম্য কোন জড়তা বা দূরত্ব আনতে পারেনি । তারা পরস্পর পরস্পরের হাত ধরে মুক্ত ভাবে বনে জঙ্গলে ঘুরে বেড়ায় , খেলা করে , একে অপরের দুঃখে ব্যাথিত হয় । অপুও পটুর বন্ধুত্ব জাঁ ক্রিস্তফের এবং অটোর বন্ধুত্বের কথা মনে করিয়ে দেয় । অমলা অপুর বন্ধুই , যদিও উভয়ের মধ্যে বয়সের তারতম্য আছে । গুলকী , কথকঠাকুর , নরোত্তম বাবাজী ইত্যাদিদের সঙ্গেও অপুর সম্পর্ক যেন সখা সখীর । বৃদ্ধ নরোত্তম বাবাজীর ও অপুর সম্পর্কের মধ্যে সখ্য ভাবের অনাবিল সুন্দর প্রকাশ ঘটেছে । অপুর বয়সের সঙ্গে নরোত্তম বাবাজীর বয়সের যথেষ্ট পার্থক্য আছে । কিন্তু বয়সের পার্থক্য সমপ্রাণতার ভাবে বৈষম্যের প্রাচীর খাড়া করতে পারেনি । :- " এই বয়োবৃদ্ধতার জন্যই অপুর কেমন যেন মনে হয় --- বৃদ্ধ তাহার সতীর্থ , এখানে আসিলে তাহার সকল সঙ্কোচ , সকল লজ্জ্যা আপনা হইতেই ঘুচিয়া --- যায় ।"[১৯১]

অপু বৃদ্ধের সঙ্গে মনখুলে কথা বলতে সঙ্কোচ বোধ করে না । অন্য যায়গায় যে কথা ' রহিয়া গেল মনে '

এখানে ' সেকথা যেন বলা যায় ' নরোত্তম দাস অপুর মধ্যেই তার গৌরকে খুঁজে পান ।

লীলা এবং অপুর সম্পর্ক আসলে সখ্য ভাবেরই এক মনোহর প্রকাশ । উভয়ের সম্পর্কে কোন মলিনতা নেই । লীলা অপুর চেয়ে বিত্তশালী পরিবারের হলেও তার মধ্যে কোন অহংকার নেই । উভয়ের মধ্যে অবাধ মেলামেশা । অপরাজিত উপন্যাসেও তাদের মধ্যে সখ্য সখীর সম্পর্ক ছাড়া অন্য কোন সম্পর্ক পাওয়া যায় না । তারা পরস্পর পরস্পরের মধ্যে ভাব বিনিময় করে । অবশ্য লীলার সঙ্গে অপুর সম্পর্কের মধ্যে সখীত্ব ছাড়াও স্বল্প পরিমানে হলেও নর-নারীর হৃদয়ের স্বাভাবিক আকর্ষণের চিত্রও অসুলভ নয় , লীলাকে দেখে অপুর বুক ঢিপ ঢিপ করা অসুস্থ লীলার হাত নিজের হাতে নেওয়া ইত্যাদি । তাহলেও বন্ধুত্বের ভাব ছাড়িয়ে এভাব আরও গভীরে চলে গেছে একথা মানতে বাধে । অপু লীলার মধ্যে তার ছেলেবেলার সাথীকেই আবিষ্কার করেছে , প্রকৃতি প্রেমীকাকে নয় — অসুস্থ লীলা — উত্তপ্ত ললাটে , কানের পাশের কুন্তলে স্নেহের প্রলেপ দিতে গিয়ে অপু বলেছে — " তুমি আমি ছেলেবেলার সাথী , লীলা — আমরা কেউ কাউকে ভুলব না "[১৯২]

' অপরাজিত ' উপন্যাসে অনিল ও প্রণবের সঙ্গে অপুর যে বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে তা শেষ পর্যন্ত অক্ষুন্ন ছিল। অনিল অপুর জীবনে এক নূতন অধ্যায় খুলে দিয়েছে । বন্ধু প্রণবের দৌতকার্যে অপুর জীবনে অপর্ণা এলো , যে অপর্ণা তার বিবাহিতা স্ত্রী ও বান্ধবী । অপু অপর্ণার সম্পর্কে স্বামী স্ত্রীর সম্পর্ক ছাড়াও সখা সখীর মধুর সম্পর্কও ফুটে উঠেছে ।

বিভূতিভূষণের সখ্যভাব মানব সম্পর্কের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না , প্রকৃতির সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের মধ্যেও সখ্যভাব আরোপ করা যেতে পারে । বিভূতিভূষণ খেলার সাথীর মত প্রকৃতির সঙ্গে মিশতে চেয়েছেন । বিভূতি মনের সখ্য ভাবকেই অপু , সত্যচরণ রূপ দিয়েছে ।

উনিশ

পথের পাঁচালী ও দৃষ্টি প্রদীপ : তুলনা মুলক আলোচনা

ড. সুকুমার সেন দৃষ্টিপ্রদীপের ভূমিকায় ' পথের পাঁচালী ' ও ' অপরাজিতে ' র সঙ্গে ' দৃষ্টিপ্রদীপ ' এর কিছু সাদৃশ্য দেখতে পেয়ে নিম্নলিখিত কথাগুলি বলেছেন : " বিভূতিভূষণের প্রথম দুখানি উপন্যাস ' পথের পাঁচালী ' ও ' অপরাজিত ' , যে ধারাবাহিক রচনা অর্থাৎ বই দুটি যে একই নায়কের প্রথম ও দ্বিতীয় বয়সের কাহিনী সে কথা পাঠকদের অজানা নয় । কিন্তু তাঁর তৃতীয় উপন্যাস ' দৃষ্টিপ্রদীপ ' যে প্রথম বই দুটির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক যুক্ত সে কথা হয়ত সাধারণ পাঠকের কাছে নতুন সংবাদ হতে পারে । ' দৃষ্টিপ্রদীপ ' যে ' অপরাজিতর ' পরে লেখা হয়েছিল তাতে সংশয় নেই , তবে সন্দেহ করি এই বিষয়ে যে ভাবে লেখা হয়েছিল তার কিছু প্রতিচ্ছায়া — দৃষ্টিপ্রদীপে মাঝে মাঝে রয়ে গেছে ।

এখানে দেখা যাক্ পথের পাঁচালী ও অপরাজিতর সঙ্গে দৃষ্টিপ্রদীপের মিল কোথায় ও কিসে। নায়কের নামে যে পার্থক্য আছে সেকথা বলা বাহুল্য কিন্তু একটু তলিয়ে দেখলে এরকম মিল , এমনকি স্পষ্ট মিল খুঁজে পাওয়া যায় । আগেকার উপন্যাস দুটিতে নায়কের নাম ' অপু ' । ভালোনাম যদিও তার অপূর্বকুমার , কিন্তু বলতে পারি তার রাশ-নাম যে অপরাজিত তাতে সন্দেহ কি । তৃতীয় উপন্যাসে নায়কের নাম ' জিতু ' । সম্ভবত তার ভালো নাম লেখক ভেবেছিলেন , জিতেন্দ্র । কল্পনা করতে বাধা কি যে তার রাশ-নাম একই।— ' অপরাজিত ' । অপু আর জিতু অপরাজিত নামটির যথাক্রমে পূর্ব ও পরার্ধ ভেঙ্গে তৈরি ডাকনাম । নামদুটির সঙ্গতি আছে । পথের পাঁচালী ও অপরাজিতর নায়ক অপূর্ব সুন্দর দেখতে --- " কি গায়ের রং কি মুখের শ্রী , কি সুন্দর স্বপ্নমাখা চোখদুটি "। দৃষ্টি প্রদীপের নায়ক জিতুর গায়ের রং ভালো নয় , তবে তার দাদা ও বোন ফরসা ছিলবটে । পথের পাঁচালীতে অপুরা এক ভাই এক বোন , দৃষ্টি প্রদীপে তারা দুভাই এক বোন । মায়ের ভূমিকায় বিশেষ পরিবর্তন নেই , তবে দৃষ্টি প্রদীপে ভূমিকাটি অধিকতর বাস্তব । (একথা দৃষ্টি প্রদীপের প্রায় সকলের

ভূমিকা সম্বন্ধেই বলা চলে) জিতুর পিতা খুব স্নেহ পরায়ন নন । তিনি ভালমানুষ তবে মদ্যাসক্ত । " বাবা অত্যন্ত মদ খান --- এবং যেদিন খুব বেশী করে খেয়ে আসেন , সেদিন আমাদের বাংলা ছেড়ে পালাতে হয় "। তাঁর পরিনামও অনুরূপ বাস্তব তবে অত্যন্ত নিষ্ঠুর । পথের পাঁচালীর পোষাকে তিনি অকৃতার্থ --- পাড়াগেঁয়ে ভালোমানুষের রোমান্টিক আদর্শ এবং ঝাপসা । দৃষ্টি প্রদীপের জ্যাঠাইমা অত্যন্ত নিষ্ঠুর চরিত্র । অপরাজিতয় তাঁর প্রকৃতি বদল হয়নি তবে উগ্রতার ঝাঁজ কমে স্বভাব সঙ্গত হয়েছে । দৃষ্টি প্রদীপে নায়কের অল্প বয়স সুন্দরী মেয়ের উপর দৃষ্টিপাত অনেক কম , তার ফলে তেমন ভূমিকার সংখ্যাও বেশী নয় । তবে একটি চরিত্র দুটি উপন্যাসেই রয়েছে । অপরাজিতয় যে পটেশ্বরী দৃষ্টিপ্রদীপে সেই ই হিরন্ময়ী । তবে হিরন্ময়ীর সঙ্গে শেষ পর্যন্ত জিতুর বিয়ে ঘটেছে । এখন দৃষ্টিপ্রদীপ নামকরনের সার্থকতা বিচার করি । তিনটি উপন্যাস যিনি এক সঙ্গে পড়বেন তিনি বুঝবেন যে ' পথের পাঁচালী ' নামটি তৃতীয় বইটির পক্ষে বোধকরি সর্বাধিক সঙ্গত হত । প্রথম বইটিতে পথে চলার ব্যাপারের চেয়ে পথের ডাকেরই জোর বেশী । অপুর পাঁচালির সেখানে তো সবে শুরু। অন্যদিকে

দৃষ্টি প্রদীপ নামটিতে অসঙ্গতি নেই । অপু ভাবুক ছেলে কিন্তু তার চোখের ঘোর খুব বেশী । আশে-পাশে যা কিছু তার চোখে পড়ে গাছপালা , নদীখাল , রোদ-মেঘ , — সবই তার আঁখি-মজায় , তার মন টানে । তার অজান্তে মনে সর্বদা যেন গুঞ্জরিত ছিল রবীন্দ্রনাথের গানের এই ছত্রটির ভাব -

কোথাও আমার হারিয়ে যাওয়া নেই
মানা মনে মনে ।

দৃষ্টিপ্রদীপে ' জিতু ' কতকটা যেন epileptic , মাঝে মাঝে তার মনের খেই হারিয়ে যায় , সে অন্যের অদৃশ্য নানা দৃশ্য দেখে , মৃত ব্যক্তির সঙ্গে তার কথাবার্তা হয় । এক কথায় তার আধ্যাত্ম দৃষ্টির টর্চ যেন মাঝে মাঝে হঠাৎ জ্বলে উঠে । এই রকম বলেই তাই বইটার নাম হয়েছে ' দৃষ্টিপ্রদীপ ' অপরাজিতর অপুর এ দৃষ্টিশক্তি যেন বিলুপ্ত । তবে পথের পাঁচালীতে অবশ্যই এ দৃষ্টির ইঙ্গিত আছে : " হঠাৎ এক একদিন ওপারের সবুজ খড়ের জমির শেষে নীল আকাশটা যেখানে আসিয়া দূর গ্রামের সবুজ বনরেখার উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে সেদিকে চাহিয়া দেখিতেই তাহার মনটা যেন কেমন হইয়া যাইত — সে সব কথা — প্রকাশ করিয়া বুঝাইয়া বলিতে জানিত না । শুধু তাহার দিদি ঘাট হইতে উঠিলে সে

বলিত ঐ যে ? ঐ গাছটার পেছনে ? কেমন অনেকদূর , না ? দুর্গা হাসিয়া বলিত — অনেক দূর — তাই দেখাচ্ছিলি ? দূর তুই একটা পাগল "। ' পথের পাঁচালী ' আত্মকথার ভঙ্গিতে যেন পরহস্তের রচনা , অপরাজিত পুরোপুরি পরহস্তের রচনা , দৃষ্টিপ্রদীপ কিন্তু সম্পূর্ন আত্মকথার ভঙ্গিতে রচিত । এ ভঙ্গি উপন্যাসের বিষয়ের পক্ষে ঠিকই হয়েছে । মোটকথা তিনটি উপন্যাসই লেখকের আত্মকথা মূলক এবং আত্ম ভাবনা সন্দীপিত । তবে লেখকের অভিজ্ঞতার দিক দিয়ে দৃষ্টিপ্রদীপ বোধ করি বই তিনটির মধ্যে সবচেয়ে সত্য ঘেঁসা রচনা । জীবনের পারিপার্শ্বিকের প্রতি ঝোঁক এবং টান আছে কিন্তু উচ্ছ্বাস নেই , বর্ণনার ঘণঘটাও নেই । দৃষ্টিপ্রদীপের জিতু পথের পাঁচালীর অপুর মতো আত্মভোলা এবং অপরাজিতর অপুর মতো আত্মবিশ্বাসী নয় । দৃষ্টিপ্রদীপে জিতুর দৃষ্টি অপুর দৃষ্টির তুলনায় অনেকটা স্বচ্ছ । পরলোক আর ধর্ম আমাদের কাছে প্রায় একই বিষয় । জিতুর দৃষ্টিপ্রদীপে যেমন পরলোকের ছবি মাঝে মাঝে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে তেমনি তার চিন্তার পাকে পাকে ঠাকুর দেবতার ভাবনাও মাথা তুলেছে । একটি মাত্র এবং সেটি গুরুতর , ছাড়া জিতুর অধ্যাত্ম এষনা

দৃষ্টিপ্রদীপ উপন্যাসের কাহিনীর পক্ষে নেহাৎ পাদপুরকের মতো । ব্যতিক্রমটি হল মালতীর বাবার প্রতিষ্ঠিত বৈষ্ণব — আখড়ার প্রায় বর্ষকাল যাপন । এই মালতীই হল দৃষ্টিপ্রদীপ উপন্যাসের নায়িকা স্থানীয় যদিও সে গল্পের শেষের দিকে দেখা দিয়ে সমাপ্তির বেশ কিছুকাল আগেই পরলোকের নেপথ্যে চলে গেছে । অপরাজিতর লীলাও অনেকটা তাই , তবে কাহিনীর আদ্যন্ত সে ব্যেপে আছে । লীলাকে পরিপূর্ণভাবে ভালবেসেও অপুর হঠাৎ পাওয়া কিশোরী বধু অপর্নাকে ভালবেসে তাকে নিয়ে ঘর করতে কিছু বাধেনি । দৃষ্টিপ্রদীপের মালতীকে সে ছেড়ে এসেছিল কিন্তু তাকে মুহূর্তের জন্যও ভুলতে পারেনি । তথাচ হিরন্ময়ীকে বিয়ে করতে জিতু খুব ইতস্ততঃ করেনি । আসল কথা অপু — জিতুর মনে প্রবল টান ছিল তেরো — চোদ্দ বছরের কিশোরী মেয়ের দিকে । উদ্ভিন্ন — যৌবনা তরুণীদের সে অবশ্যই খুব ভালোবাসত , তবে সে ভালোবাসা সৌন্দর্যের আসক্তি , যেন ভক্তের আরতি ও প্রদক্ষিণ । বেদীর দিকে হাত বাড়াবার ভরসা হত না " ।[১৯৩]

শ্রদ্ধেয় সুকুমার সেনের উক্ত মন্তব্যটির কিছু কিছু ক্ষেত্রে সত্য হলেও সম্পূর্ণ সত্য নয় বলেই মনে হয় । তিনি

যতখানি বাহ্যিক দিক থেকে ' পথের পাঁচালী ' ' অপরাজিত ' র সঙ্গে দৃষ্টিপ্রদীপের আত্মীয়তা আবিষ্কার করার প্রয়াস করেছেন ততখানি আন্তরিক দিক থেকে নয় বলেই মনে করি । কয়েকটি বিভিন্ন কারণে আমি শ্রদ্ধেয় সমালোচকের সঙ্গে একমত নই । সেই কারণগুলি হল নিম্নলিখিত ।

অপরাজিতর লীলার সঙ্গে দৃষ্টিপ্রদীপের মালতীর কিছু কিছু মিল থাকলেও লীলার সবখানি মালতীর মধ্যে নেই বা মালতীর সবখানি লীলার মধ্যেও পাব না। মালতীকে জিতু দেখেছে তার প্রণয়ীরূপে । মালতীর সঙ্গে ঘর বাঁধার স্বপ্ন দেখে সে , অপুর সঙ্গে লীলার সম্পর্কের মধ্যে পুরোপুরি প্রেমিক প্রেমিকার সম্পর্ক খুঁজে পাব না ।

মালতী ও লীলার চেহারার মধ্যেও পার্থক্য আছে । মালতী বিভূতিভূষণের ভাষায় :

" মালতী উজ্জ্বল শ্যামাঙ্গী বটে , কিন্তু বেশ সুশ্রী । ওর টান টান করে বাঁধা চুল ও ছেলে মানুষের মত মুখশ্রীর একটা নবীন , সতেজ সুকুমার লাবণ্য- বিশেষ করে যখন মুখে ওর বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখা দেয় , কিংবা একটা অদ্ভুত ভঙ্গীতে মুখ উঁচু করে হাসে — তখন সে বিজয়িনী , তখন

সে পুরুষের সমস্ত দেহ , আত্মাকে সুন্দরী মৎস্য নারীর মত মুগ্ধ করে কুলের কাছের অগভীর জল থেকে টেনে বহুদূরের অথৈ জলে নিয়ে যেতে পারে "।[১৯৪]

বিভূতিভূষণের ভাষায় লীলা অনিন্দ্যসুন্দরী " লীলার সঙ্গে এ পর্যন্ত দেখা কোন মেয়ের তুলনা হয়না , হাওয়া অসম্ভব। লীলার রূপ মানুষের মত নয় যেন , দেবীর মত রূপ , মুখের অনুপম শ্রীতে , চোখের ও ভ্রূর ভঙ্গিতে , গায়ের রং – এ গলার সুরে , গতির ছন্দে "।[১৯৫]

কিন্তু লীলার প্রতি অপুর ভালবাসা সখীর প্রতি সখার ও বোনের প্রতি ভাই এর মত । " লীলা তাহার বাল্যের সাথী, তাহার উপর মায়ের পেটের বোনের মত একটা মমতা , স্নেহ ও অনুকম্পা , একটা মাধুর্যভরা ভালবাসা "।[১৯৬]

মালতীর প্রতি জিতুর যে ভালবাসা তা থেকে পৃথক নয় ঈশ্বরের প্রতি জিতুর যে ভক্তি " সেদিন দেখলুম ঈশ্বরের প্রতি সত্যিকার ভক্তির প্রকৃতি মালতীর প্রতি আমার ভালবাসার চেয়ে পৃথক নয় "।[১৯৭]

লীলার রূপ বর্ণনায় বিভূতিভূষণ বলেছেন : " লীলার রূপ মানুষের মত নয় যেন , দেবীর মত রূপ,

মুখের অনুপম শ্রীতে , চোখের ও ভ্রূর ভঙ্গিতে , গায়ের রং এ , গলার সুরে , গতির ছন্দে " [১৯৮]

মালতীর মধ্যে শান্ত সমাহিত এক ধ্যানী মূর্তির দর্শন পাই । তাঁর মধ্যে একটা ধৈর্যের ভাব আছে : " মালতীর স্বভাব কি মধুর । কি খাটুনিটা খাটে আখড়ায় — একদিন উঁচু কথা শুনি নি ওর মুখে — কারও উপর রাগ দেখিনি " [১৯৯]

অন্যদিকে লীলা শান্ত নয় , সে তেজী মেয়ে । বিমলেন্দুর ভাষায় : ' দিদি খুব তেজী মেয়ে '। লীলা মালতীর মত অত খোলা মনেরও নয় । মালতীর প্রতি জিতুর ভালবাসা প্রিয়ার প্রতি প্রিয়র টান , " মালতী একটা মধুর স্পপ্নের মত , বেদনার মত, কতদিন কানে শোনা গানের সুরের মত মনে উদয় হয় "।[২০০]

এখানে একটু ভেবে দেখলে দেখতে পাব যে যেখানে মালতীর মধ্যে জিতু দেবত্ব আরোপ করেছে সেখানে অপু লীলার সৌন্দর্যের মধ্যে দেবীর সাদৃশ্য খুঁজে পেলেও লীলাতে কোন দেবীত্ব আরোপ করেনি । লীলার রূপের মধ্যে এমন একটা সৌন্দর্য আছে যা দেবীর রূপের মতই নিখুঁত ও বিরল । মালতী বৈষ্ণবের আখড়ার মেয়ে , লীলা নগর

সভ্যতার , মালতী যেখানে ভারতীয় সাহিত্যে বিশেষত বৈষ্ণব সাহিত্যের ভক্ত , লীলা সেখানে আধুনিক পাশ্চাত্য বিষয়ের অনুরাগী । মালতী অপরাজিতর নির্মলা , শরৎচন্দ্রের শ্রীকান্তের রাজলক্ষ্মী ও কমললতার আত্মীয় , লীলা সবটুকু না হলেও আত্ম অভিমানে ও নমনীয়তায় রবীন্দ্রনাথের ' যোগাযোগে ' র কুমুদিনীর কথা স্মরণ করায়। ' অপরাজিত ' র ' পটেশ্বরী ' ও ' দৃষ্টি প্রদীপের ' ' হিরন্ময়ী ' এক নয় । বয়সের দিক থেকে উভয়ের মিল থাকলেও চরিত্র বৈশিষ্ট্যে অমিলের মাত্রাই বেশী । রূপের মধ্যেও উভয়ের পার্থক্য যথেষ্ট । পটেশ্বরী সুন্দর নয় " রং উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ , তবে তাহাকে দেখিয়া সুন্দরী বলিয়া কোনদিনই মনে হয়নাই অপুর "। [২০১]

সেখানে হিরন্ময়ী জিতুর চোখে : " দেখলাম অত্যন্ত লাবণ্যময়ী , ওর চোখদুটি অত্যন্ত ডাগর টানা টানা জোড়া ভুরু দুটি কালো সরু রেখার মত , কপালের গড়ন ভারী সুন্দর, চাঁচা, ছোট, অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি। মাথায় একরাশ ঘন কালো চুল "। [২০২] হিরন্ময়ীর হাসি জিতুকে মুগ্ধ করে দেয় । " আমি মুগ্ধদৃষ্টিতে ওর হাসিতে উদ্ভাসিত সুকুমার লাবণ্য ভরা মুখের দিকে চেয়ে রইলাম — চোখ আর ফেরাতে

পারিনে ! — কি অপূর্ব হাসি ? কি অপূর্ব চোখমুখের শ্রী ! "[২০৩]

হিরন্ময়ী চঞ্চল ও প্রানোত্তাপে সঞ্জীবিত , পটেশ্বরী সেরকম নয় । অপরাজিতর পটেশ্বরী অপুর প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে কিন্তু তার মধ্যে প্রকৃত প্রেম নেই । অপুর কাছে পটেশ্বরীর আচরণ অশুচি মনোভাবরূপ দেখা দিয়েছে । পটেশ্বরীর সেবা গ্রহণ করে অপু কৃতজ্ঞ কিন্তু তার মধ্যে কোন প্রেমিকাকে অপু আবিষ্কার করেনি বরং দু-একবার পটেশ্বরীর অপু-নির্ভরতাকে অপু অপবিত্র মনোভাব রূপেই দেখেছে । " এসবের জন্য সে মনে মনে মেয়েটির উপর কৃতজ্ঞ কিন্তু এ সব জিনিস যে বাহিরের দিক হইতে এরূপ ভাবে দেখা যাইতে পারে , এ কথা পর্যন্ত তাহার মনে কখনও উদয় হয় নাই — সে জানেই না , এধরনের সন্দিগ্ধ ও অশুচি মনোভাবের খবর "[২০৪]

হিরন্ময়ীর প্রতি জিতুও আকৃষ্ট হয়েছে , হিরন্ময়ীও জিতুর প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে । হিরন্ময়ীর মধ্যে জিতু এক প্রেমিকাকেই খুঁজে পেয়েছে । হিরন্ময়ীও জিতুর মধ্যে নিজের দয়িতকে আবিষ্কার করেছে । পটেশ্বরীকে অপু কখনও নিজের প্রেমিকা রূপে গ্রহণ করেনি , তার প্রতি

কৃতজ্ঞ হয়ে তাকে সাহায্য করেছে মাত্র । অন্যদিকে জিতু হিরন্ময়ীকে নিজের জীবন সঙ্গীরূপে গ্রহণ করেছে ও তার সঙ্গে ঘরও বেঁধেছে । হিরন্ময়ীর মধ্যে এক প্রেমিকা নারীর পূর্বরাগ ফুটে উঠেছে । মুগ্ধ নায়িকার বিভিন্ন স্তর — পূর্বরাগ , মান , প্রেম বৈচিত্র্য , প্রভৃতি সুন্দর ভাবে প্রকাশ পেয়েছে ।

' পথের পাঁচালী ' র অপু ও দৃষ্টিপ্রদীপের জিতুর মধ্যে অনেক ক্ষেত্রে মিল আছে । উভয়েই ভাবুক । উভয়ের নামের মধ্যেও হয়ত সাদৃশ্য আছে কিন্তু এই দুটি চরিত্রের অমিলের মাত্রাও কম নয় । অপু দেখতে অপূর্ব সুন্দর , তার ভাল নাম ' অপূর্ব ' সার্থক : " কি গায়ের রং কি মুখের শ্রী কি সুন্দর স্বপ্নমাখা চোখ দুটি -" [১০৫] জিতুকে সুন্দর বলা যায়না । অপুর চেয়ে জিতু বেশী Practical. অপুর মধ্যে কবিত্ব আছে , জিতুর মধ্যে আধ্যাত্মদৃষ্টি ও পারলৌকিক চেতনার সমন্বয় ঘটেছে । অবশ্য অপুর মধ্যেও আধ্যাত্মিক চেতনার প্রকাশ ঘটেছে । প্রকৃতির ব্যাখ্যার মধ্যে দিয়ে তার আধ্যাত্মিক মনের স্ফুরণ আর মানব জীবনের প্রেক্ষাপটে জিতুর আধ্যাত্মিক জগৎ গড়ে উঠেছে । দৃষ্টিপ্রদীপে জিতুর মধ্যে যে অধ্যাত্ম দৃষ্টির টর্চ মাঝে মাঝে জ্বলে উঠেছে

অপরাজিততে অপুর এ দৃষ্টিশক্তি বিলুপ্ত তাও বলা যায় না । আধ্যাত্মিক চেতনার মধ্যে অপুর এই দৃষ্টিশক্তির পরিচয় কি পাওয়া যায় না ? ' পথের পাঁচালী ' ' অপরাজিত ' প্রভৃতি উপন্যাসে অপুর মধ্যে যে নিসর্গ চেতনার পরিচয় পাওয়া যায় ' দৃষ্টিপ্রদীপের ' জিতুর মধ্যে তাই যেন বিকসিত হয়ে পরলোক চেতনায় পরিণতি লাভ করেছে । আসলে অপু ও জিতু উভয়ের মধ্যে রয়েছে অলৌকিক শক্তি ।

' দৃষ্টিপ্রদীপে ' র নাম পথের পাঁচালী হলে বইটির সঙ্গত নাম হত বলে মনে হয় না । ' পথের পাঁচালী ' তে শুধু পথের ডাকই নেই , পথচলার কথাও আছে । ' পথের পাঁচালী ' শুধু অপুর পথ চলার পাঁচালীই নয় , ইন্দির ঠাকুরুণ , হরিহর , সর্বজয়ারও বটে । এই উপন্যাসে বিভূতিভূষণ বিভিন্ন চরিত্রগুলির সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে দৈহিক ও মানসিক পরিবর্তনের বিভিন্ন স্তরের পরিচয় দিয়েছেন । ১২৪০ সালের ছিপছিপে চেহারার — হাস্যমুখী তরুনীর সঙ্গে পঁচাত্তর বৎসরের বৃদ্ধার তুলনা করে লেখক ইন্দির ঠাকুরুণের জীবনের যৌবন থেকে বৃদ্ধাবস্থায় উত্তরনের কথাই বলেছেন — এতেকি পথ চলার কথা বুঝতে পারা

যায় না । অবশ্য লেখক বর্ণনার মাধ্যমে ইন্দির ঠাকরুণের পথ চলার ইঙ্গিত দিয়েছেন , প্রত্যক্ষ রূপে দেখান নি । কিন্তু সর্বজয়া , হরিহর ও অপুর পথ চলার প্রত্যক্ষ রূপ ও অভিজ্ঞতার প্রকাশ কি ঘটেনি ? সর্বজয়ার গ্রামের জীবন যাপন প্রণালী ও শহরের জীবনাচরণ প্রণালীর মধ্যে জীবন পথের দুটো স্তরের প্রকাশ কি ঘটেনি ? তাতে কি পথ চলার ধ্বনি জাগেনি ? হরিহর কি জীবনের শেষদিন পর্যন্ত বুঝতে পারেনি যে তার বাউন্ডুলে উদাসীন স্বভাব সংসার জীবনে টিঁকবে না ? হরিহরের মধ্যে উদাসীন ব্যক্তিত্ব থেকে সংসারী ব্যক্তিত্বের উত্তোরন কি একেবারেই হয়নি ? অপুর পথ চলা কি একেবারেই হয়নি পথের পাঁচালীতে ? নিশ্চিন্দিপুর থেকে কাশী , কাশী থেকে বর্দ্ধমান এসব কি পথ চলা নয় ?

' পথের পাঁচালী ' উপন্যাসে পথের দেবতার আহ্বান স্থিতি থেকে গতিতে নয় , গতি থেকে গতিতে । " মূর্খবালক , পথ তো আমার শেষ হয়নি " — এখানে পথের দেবতা অশেষ পথের কথাই বলেছে । পথতো আমার শেষ হয়নি বলতে অপুকে পথের দেবতা সচেতন করে দিলেন যে এতদিন সে যতটা পথ হেঁটেছে , সেখানেই তার পথ শেষ হয়নি এতেই প্রমান হয় যে অপু পথে চলেছে ।

শ্রদ্ধেয় সমালোচক সুকুমার সেনের মন্তব্যটির বিভিন্ন দিকদিয়ে সমালোচনা করা হল । সমালোচনার প্রেক্ষাপটে ড. সেনের বিপরীত ধারনাকেই প্রতিষ্ঠা করার প্রয়াস করে বিভিন্ন যুক্তির সাহায্যে আমার নিজস্ব মত প্রকাশ করেছি । মন্তব্যটির তেজস্বীতা দানের জন্য ' পথের পাঁচালী ' ' অপরাজিত ' র সঙ্গে দৃষ্টিপ্রদীপের কয়েকটি প্রধান চরিত্রের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের তুলনামূলক আলোচনা করে দেখানো হল যে তাদের মধ্যে আন্তরিক মিল আসলে নেই । বিভূতিভূষণের প্রায় সমস্ত উপন্যাসের বীজ নিহিত রয়েছে তাঁর প্রথম উপন্যাস পথের পাঁচালীর মধ্যে , তাবলে একথা বলা ভুল যে তাঁর সমস্ত উপন্যাস পথের পাঁচালীর পুনরাবৃত্তি । ' পথের পাঁচালী ' র পরিবর্তী পদক্ষেপ ' অপরাজিত ' ' দৃষ্টিপ্রদীপ ' নয় ।

কুড়ি

পথের পাঁচালী উপন্যাসের বিভিন্ন চরিত্রাবলী

' পথের পাঁচালী ' উপন্যাসের বিভিন্ন চরিত্র ও তাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য : সমালোচনা ও বিচার ।

যে সকল গুণ ও বৈশিষ্ট্যের আলোকে একটি উপন্যাস সার্বিক সুন্দর ও সার্থক উপন্যাসে উন্নীত হয় , তার একটি বিশিষ্ট দিক হল সেই উপন্যাসের বিভিন্ন চরিত্র ও তাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের মূল্যায়ন করা । গল্প অথবা উপন্যাসের গতি বৃদ্ধি করে সেই গল্পস্থিত বিভিন্ন চরিত্রাবলী , তাদের বৈশিষ্ট্য , কার্যাবলী , গভীরতা ওজস্বিতা , সর্বোপরী গতিমুখরতা ।

আমাদের বর্তমান আলোচ্য উপন্যাস — ' পথের পাঁচালী ' র বিভিন্ন দিকের আলোচনার প্রেক্ষাপটে এর বিভিন্ন চরিত্রাবলীর পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনার প্রয়োজন আছে । বিভূতি সাহিত্যের এক বিশেষ সম্পদ — চরিত্র রূপায়ণ তার কলা কুশলতা এবং চারিত্রিক

প্রাণময়তা কিভাবে বিভূতিভূষণের গল্প উপন্যাসকে সমৃদ্ধশালী এবং অর্থপূর্ণ করে তুলেছে , তার মূল্যায়ণ করতে হলে কথাসাহিত্যিক বিভূতিভূষণের গল্প — উপন্যাসের চারত্রিক বৈশিষ্ট্য নিয়ে আলোচনা করতেই হয় ।

এই আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা ' পথের পাঁচালী ' ' অপরাজিত ' ' দৃষ্টিপ্রদীপ ' প্রভৃতি উপন্যাসের বিশেষ বিশেষ চরিত্রগুলির চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের দিকগুলি তুলে ধরে এই সব উপন্যাসের চারিত্রিক মূল্যায়নে অগ্রসর হব এবং এই পথ ধরে বিভিন্ন আলোচনার মাধ্যমে সমালোচনা এবং বিচার — এই দুইয়ের মানদন্ডে বিভূতি সাহিত্যের পরম সম্পদ তার বিভিন্ন উপন্যাসের চারত্রিক মাধুর্য , লাবণ্য এবং অমরত্বের দিকগুলি চুম্বকের আকারে তুলে ধরবার চেষ্টা করব ।

বক্ষমান আলোচনার প্রারম্ভিক ভূমিকা হিসেবে বিভূতি সাহিত্য সমালোচক অধ্যাপক তিমির বরণ
চক্রবর্তীর সারগর্ভ মন্তব্যটি উদ্ধৃত করবার প্রয়োজন বোধ করি : " বিভূতিভূষণ প্রধাণত সামাজিক মানুষের ইতিহাস রচয়িতা । তাঁর সাহিত্য সাধারণ মানুষের সুখ দুঃখের পাঁচালী । তাঁর সাহিত্যের ভিতর দিয়ে চিরন্তন দুঃখবাদের

এক করুণ সুর অন্তঃসলিলা ফল্গুর মতো প্রবাহিত । এই কারুণ্যই তাঁর সাহিত্যকে এতোখানি মাধুর্যমন্ডিত করেছে । ইংরাজীতে একটা কথা আছে --- " Our sweetest songs are those that tale of saddest thoughts " অশ্রুসিক্ত কাহিনীই আমাদের জীবন ইতিহাসের শ্রেষ্ঠ তথা মধুর সঙ্গীত । সীতার বনবাসের কাহিনী পাঠে আমাদের চোখ তাই অশ্রুসজল হয়ে ওঠে । সূক্ষ্ম জীবনানুভূতি , প্রত্যক্ষবোধ , বাস্তবতা প্রভৃতি বিশিষ্ট গুণে বিভূতি সৃষ্ট সাহিত্য অলঙ্কৃত । বিভূতিভূষণের ব্যক্তিগত জীবনের সিক্ত অভিজ্ঞতা তাঁকে জীবন সম্বন্ধে গভীরতা দান করেছিল । ম্যাথু আর্ণল্ডের ভাষায় বলা যায় : ' Literature is the criticism of life ' . সাহিত্য জীবনেরই প্রতিফলন ; জীবন বোধ বিরহিত যে সাহিত্য তা সার্থক সাহিত্য সৃষ্ট নয় । বিভূতি সাহিত্যের সর্বত্রই জীবন আর জীবনবোধের সূক্ষ্ম প্রতিফলন । আর এই প্রতিফলনের সার্থক রূপায়ন দেখি তাঁর নারী ও পুরুষ চরিত্রগুলিতে । বিভূতিভূষণের উপন্যাসের কেন্দ্রীয় নারী চরিত্রগুলির মধ্যে প্রায় কেউই অসাধারন হয়ে ওঠেনি । এদের অধিকাংশ চরিত্রেই অতি সাধারন গোছের ' অশিক্ষিতা ,

অপ্রগলভা ও সরল স্বভাবা ' । এর ব্যতিক্রম যে নেই তা নয় । দু একটি ব্যতিক্রম আছে , যেমন ' অপরাজিত ' এর লীলা এবং ' আরণ্যক ' এর ভানুমতি চরিত্র । এই দু-একটি ব্যতিক্রম ছাড়া বিভূতি সাহিত্যের প্রায় সব নারী চরিত্রই অত্যন্ত সাদাসিধে , সহজ সরল অনাড়ম্বর তথা সাধারন বাঙালী ঘরের নারী চরিত্রের আদর্শে রূপায়িত অর্থাৎ নারীচরিত্র বলতে বিভূতিভূষণ যা বুঝতেন , সেই সব আদর্শের অধিকারিনী । রোমান্টিক প্রেম অথবা অতিমাণবিক প্রেম এদেরকে রোমাঞ্চিত করেনি , পক্ষান্তরে সাধারণ গৃহস্থালী ঘরের দয়া — মায়া — প্রেম — প্রীতি — স্নেহ রসের গুনে এই চরিত্রগুলি মহৎ থেকে মহত্বর হয়ে উঠেছে । এরা মোটামুটি একই ধরনের , একই স্ব'ভাবের , একই রঙের তথা বৈশিষ্ট্যের । অর্থাৎ এদের চারিত্রিক রূপ বা ধর্ম প্রায়ই অপবিবর্তিত থাকে । সমালোচকের উদ্ধৃতি উদ্ধৃত করে বলাচলে , " শরৎচন্দ্রের নারী চরিত্রের মত শেষ পর্যন্ত সুগতীর তাৎপর্য বহ বা সুদূর প্রসারী সম্ভাবনাময় কোনকিছু করে বসে না । এরা বরাবর যা ছিল চিরকাল তাই রয়ে যায় । চরিত্র হিসেবে এরা Static , dynamic নয় । এদের জীবনের মৌল বৈশিষ্ট্য Becoming নয়

Being "- অর্থাৎ নতুন সম্ভাবনাময় হয়ে ওঠা নয় , যা হয়ে আছে তাই । এ চরিত্র জানে না কোন বিদ্রোহ , জানেনা কোন জটিল যুক্তি তর্কের কচ কচালি । এরা চিরশান্ত , চির শীতল , চির মধুময় ।

পুরুষ চরিত্রাবলীর ক্ষেত্রে কিন্তু একথা আদৌ খাটে না । অর্থাৎ যে যুক্তির মাপকাঠিতে বিভূতিভূষণের নারী চরিত্রাবলীকে সাধারণ বলা যায় , সেই যুক্তিতে কিন্তু বিভূতি সাহিত্যের পুরুষ চরিত্রগুলিকে আদৌ সাধারণ বলা যায় না । সামান্য পরিমানে তারা প্রায় সকলেই অসাধারণ । প্রকৃতির দিক দিয়ে এরা ঠিক আর পাঁচজন সাধারনের মত নয় । এরা কেউ কেউ একটু ক্ষেপাটে ধরনের বা বাউন্ডুলে প্রকৃতির । কারো ভিতরে ঈষৎ আদর্শবাদের সন্ধান পাওয়া যায় , কেউ আবার হয়ত চির উদাসী — আত্মভোলা — গোছের । অর্থাৎ এদের যা কিছু অসাধারনত্ব , তা সবই হলো প্রধানতঃ চরিত্রগত । এরা প্রায় সকলেই সাধারণ , নিম্ন মধ্যবিত্ত অথবা অতি দরিদ্র শ্রেনীর মানুষ । তবে একথা ঠিক যে , এই সব বাউন্ডুলে , দরিদ্র শ্রেনীর দল আমাদের হৃদয়ে এমন এক চিরসত্য আবেদন জাগিয়ে তোলে যা কোনদিনই ভুলবার নয় " [২০৬]

সর্বজয়া : সর্বজয়ার মধ্যে ভারতীয় নারীর সনাতন ধর্মই রক্ষিত হয়েছে । সেধর্ম আদর্শ গৃহিনী ও স্নেহশীল জননীর । গৃহিনীরূপে সর্বজয়া যথেষ্ট সার্থক । গৃহিনী-পনার উপর যদি কোন রকমের পুরষ্কার দেওয়ার রীতি প্রচলিত থাকত তাহলে বাংলা সাহিত্যে সর্বজয়া সেই পুরষ্কারের প্রথম দাবিদার । হরিহরের সংসারে সর্বজয়া যেদিন প্রবেশ করল সেদিন থেকে সংসারের সমস্ত দায়িত্ব সে নিজেই বহন করে চলেছে । অভাবী সংসারের হলাহল পান করে সকলের জন্য সে সুধার আয়োজন করেছে ।

সর্বজয়া অশিক্ষিতা ,সঙ্কীর্ণ হৃদয়া , মুখরা , স্বার্থপর নারী । ইন্দির ঠাকুরুণকে সে উৎপীড়ন করে । নিজের সন্তান দুর্গাকে ইন্দির ঠাকুরুণ তার কাছ থেকে কেড়ে নিচ্ছে — এমন ধারনাও তার আছে । অপু শিক্ষালাভ করে বড় হবে তা সর্বজয়া চায় না , সে চায় গ্রামে থেকে পুরুতগিরি করে তার অপু জীবন কাটায় । সর্বজয়া বাংলার পল্লী বধূর চিরন্তন প্রতিনিধি । বাংলার ঘরে ঘরে সর্বজয়ার মত এমন সহনশীল পল্লীবধু দেখা যায় , যাদের রোমান্টিক স্বপ্ন রান্নাঘরে বিনষ্ট হয়ে যায় ।

সর্বজয়া চিরন্তনী মা । রবীন্দ্রনাথের আনন্দময়ী অথবা

শরৎচন্দ্রের বিশ্বেশ্বরীর মত আদর্শ জননী নয় সে । দোষে গুনে জড়ানো , স্নেহ-মমতায় পরিপূর্ণ — যাকে বলে ঘরোয়া মা সর্বজয়া তাই । নিজের সন্তানের প্রতি তার ভালবাসা সমরূপ নয় । দুর্গার চেয়ে অপুর উপরেই তার ভালবাসা অধিক । তাহলেও দুর্গাকে সে কম ভালবাসে না । এক ঝড় বৃষ্টির রাত্রে দুর্যোগের হাত থেকে ছেলে মেয়েকে রক্ষা করার সময় সর্বজয়ার মাতৃ মূর্তির চরম প্রকাশ দেখা যায় । নিশ্চিন্দিপুরে এক বর্ষা মুখর দিনে ' মন উচাটন নিঃশ্বাস সঘন ' মাতৃ হৃদয়ের আকুলতা লক্ষ্য করা যায় । অপুর উপর সর্বজয়ার ভালবাসা গভীর ও নিখাদ । পথের পাঁচালী ও অপরাজিত উপন্যাসে সর্বজয়ার স্নেহ সজল মাতৃরূপ রত্নদ্যুতিতে আশ্চর্য মহিমা লাভ করেছে ।

হরিহর — হরিহরের মধ্যে সর্বজনীন পিতৃহৃদয় ধরা পড়েছে । পিতার মধ্যে নিজের সন্তানের প্রতি স্নেহ — মমতা–ভালবাসা — যে সব মানবিক বৃত্তিগুলির আমরা আশা করি , সে সব রয়েছে হরিহরের মধ্যে । হরিহর বাউন্ডুলে কিন্তু সংসার সম্পর্কে সম্পূর্ণ অনাসক্ত নয় । বিয়ের পর প্রথম দশবছর সে সংসার সম্পর্কে উদাসীন থাকলেও পরে পুরোদস্তর সংসারী হয়ে পড়ে । তার যাযাবর

বৃত্তি (বিয়ের পর) প্রকৃতপক্ষে সংসার পলায়ন নয় , দরিদ্রগ্রস্ত সংসারটাকে পড়তি অবস্থা থেকে সুঅবস্থায় ফেরানোর জন্যই । হরিহর চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য :

" আশার ছলনে ভুলি কি ফল লভিনু , হায়
তাই ভাবি মনে ?
জীবন - প্রবাহ বহি কাল - সিন্ধু পানে ধায়
ফিরাব কেমনে ?
দিন দিন আয়ুহীন , হীনবল দিন দিন
তবু এ আশার নেশা ছুটিল না ? এ কি দায় "

হরিহরের মধ্যে সংসার অভিজ্ঞতার সঙ্গে সঙ্গে রয়েছে একটা শিল্পীমন । তার কথকবৃত্তি , গ্রন্থ সংগ্রহের প্রবণতা — তারই ইঙ্গিত বহন করে । হরিহরের মধ্যে শিল্পীর যে মার্জিত বোধ ও দার্শনিক সুলভ উদাসীনতা ছিল তাই অপু চরিত্রে বহু বিচিত্রতায় ধরা পড়েছে । হরিহরের মধ্যে আমরা ভক্ত ও ভগবানের লীলারসেরও আস্বাদ পাই । ভগবান তার ভক্তির পরীক্ষা করে । হরিহর দুঃখকে ভগবানের প্রসাদরূপে গ্রহণ করে । দুঃখে বিচলিত হয় না । যেদিন ভগবানের ডাক এলো সেদিন ভক্ত হরিহর মৃত্যুর অন্তরে প্রবেশ করে ভগবৎ দর্শণরূপ অমৃত লাভ করল ।

দুর্গা :- পথের পাঁচালী উপন্যাসে এক অবিস্মরনীয় চরিত্র দুর্গা । পথের পাঁচালীর পথে তার পথচলা অদীর্ঘ কালের হলেও , মৃত্যু তার অস্তিত্ব মুছে ফেলতে পারেনি । উপন্যাসের অনাটকীয় পরিবেশে দুর্গাই নাটকীয় পরিবেশের অবসর সৃষ্টি করে দিয়েছে । দুর্গার মত এত উচ্ছল , এত প্রাণবন্ত চরিত্র গ্রন্থটিতে আর নেই । অপু এ উপন্যাসের কেন্দ্র – চরিত্র হলেও , দুর্গা এ উপন্যাসের অলঙ্কার । সমালোচকের ভাষায় : " অপু এ উপন্যাসের প্রাণ – কিন্তু দুর্গাই উপন্যাসের লাবন্য । নিশ্চিন্দিপুরের গ্রামের জল মাটি দিয়ে তৈরি এই দুর্গা প্রতিমাই পথের পাঁচালীর অধিষ্ঠাত্রী দেবী ।"[১০৭] দুর্গাকে বাদ দিয়ে অপু শুধু অসহায় নয় , সারা বইটাই নিস্প্রাণ । ' অপরাজিত ' তে দুর্গাবিহীন অপু যেন ছিন্নমূল । সমালোচকের ভাষায় : " ' পথের পাঁচালী ' তে অপুর মূল বাঁধা আছে । সে মূলে দিদি । উৎসাহে , সাহচর্যে , স্নেহে , সান্ত্বনায় সে অপুর সঙ্গে কত নিরন্তর ! কিন্তু ' অপরাজিত ' তে ? অপু কী ছিন্নমূল ! উদ্বাস্ত ! সেখানে সঙ্গী অনিল বা সঙ্গিনী লীলা , এমনকি স্ত্রী অপর্ণার স্নেহ সাহচর্য আছে বটে , কিন্তু সে সবই তো দু-দন্ডের । অপু সেখানে দু-দন্ডের শান্তির

ভাড়াটে । তার কারণ এরা কেউই দুর্গার মত স্থায়ী — অবিরত নয় । তারই অভাবে সহায় সম্বলহীন অপু ঘটনাস্রোতে ভাসমাণ , এক তৃণখণ্ড মাত্র । তার কোন মানুষী নোঙর নেই । দিদির মত জমা-খরচ মেলানর কোন পাকা মহাজন নেই ।" [২০৮]

শ্রী চট্টোপাধ্যায়ের মতে অপরাজিততে মহাকাল দুর্গার অভাবকে পূর্ণ করেছে " যদিও আমরা সবাই জানি — দুর্গার এই বিরাট অভাবকে , ফাঁককে বিভূতিভূষণ আর এক বিরাটতর নিরন্তরতায় ভরে দিয়েছেন । তারই নাম মহাকাল । সে উপলব্ধিকে শুধু অপু নয় , অপুর পাঠকরাও উত্তীর্ণ , আশ্বস্ত । " [২০৯] কিন্তু তার মত গ্রহণ যোগ্য বলে মনে হয়না । দুর্গার অভাবকে কেউ ভরে দিতে পারেনি , পারা যায়ওনা । মহাকাল এক অদৃশ্য শক্তি তার কোন সজীব সত্তা নেই । দুর্গার মত সে আমাদের ঘরের মানুষ নয় । তাকে আমরা ভালবাসতে বা আপন করতে পারিনা । দুর্গার স্মৃতি অপুর মন থেকে কেউ মুছে ফেলতে পারেনি — মহাকালও না । ' দুর্গা-অপুর ' জোগান সম্পুরকই নয় , তার নিজস্বতা আছে । সে স্বতন্ত্র ও স্বয়ংসম্পুর্ণ । বাংলা উপন্যাসে দুর্গার দোসর নেই । ' পুঁই মাচা ' গল্পের ক্ষেন্তি

দুর্গার সগোত্র হলেও , দুর্গা তার চেয়ে ভিন্ন ।

দুর্গার মধ্যে শিশুর যে রূপটা চোখে পড়ে তা হল চঞ্চলতা ও অবাধ্যতা । সে সাধারণ গ্রাম্য বালিকা হলেও " "জৈব আনন্দে ও প্রাণশক্তির চাঞ্চল্যে ভরপুর "। [২১০] দুর্গা চরিত্রের আড়ালে যে তত্ত্বটি উঁকি মারে তার নাম দেওয়া যেতে পারে সীমা জগতের তত্ত্ব । দুর্গা একটা নির্দিষ্ট সীমানায় ধরা দেয় । অপুর মত সে রূপকথার রাজ্য আবিষ্কার করতে পারে না । শ্যামলঙ্কার দেশে ব্যঙ্গমা ব্যঙ্গমীর গায়ের নীচে সুপ্ত রাজপুত্রের ছবিও তার স্মৃতিতে ভাসে না , জনস্থান মধ্যবর্তি প্রস্রবন — পর্বত বনঝোপে স্নিগ্ধ গন্ধে , না জানার ছায়া নেমে আসা ঝিকিমিকি সন্ধ্যায় সেই স্বপ্নলোকের ছবি তাকে অবাক করে না । নিশ্চিন্দিপুরের মাঠে ঘাটে , বনে জঙ্গলে ঘুরে ঘুরে সে সংগ্রহ করে বিভিন্ন প্রকারের ফল ফুল । প্রকৃতি দেবীর অন্তরের হাতছানি সে পায়নি । 'পথের পাঁচালী 'তে শুধু গতির কথাই নেই যতির কথাও আছে । দুর্গা সেই গতিরই ধারক ও বাহক ।

দুর্গার অকাল মৃত্যুর পেছনে কয়েকটি কারণ আছে । প্রথমতঃ দুর্গা এই উপন্যাসের এতই গুরত্ব পূর্ণ চরিত্র হয়ে উঠছিল যে তার তুলনায় অপুও নিস্প্রভ হয়ে পড়ছিল ।

অপু — হৃদয়ের সঙ্গে লেখক — হৃদয় একাত্ম । সুতরাং অপুর গুরুত্ব বাড়াতে গিয়ে দুর্গা প্রতীমাকে অকালে বিসর্জন দিতে হল । দ্বিতীয়তঃ দুর্গার মৃত্যু ঘটানোর পেছেনে মানুষের ইচ্ছার অপূর্ণতার কথাও ব্যঞ্জিত হয়েছে । তৃতীয়তঃ নিশ্চিন্দিপুর ছাড়া দুর্গাকে অন্য পরিবেশে মানাত না । তাই তার মৃত্যু ঘটাতে হয়েছে । পথের পাঁচালী উপন্যাসে প্রথমে দুর্গা ছিল না । বিভূতিভূষণ এক স্থানে দুর্গা সম্পর্কে বলেছেন যে নিজের কেউ নয় অন্য যায়গা থেকে জুড়ে দেওয়া । বিভূতি জীবণীকার সুনীল কুমার চট্টোপাধ্যায় বলেছেন : " বিভূতিভূষণ তখন ভাগলপুরে । একদিন রঘুনন্দন হলে দাঁড়িয়ে আছেন । দেখেন সামনে একটি মেয়ে । কপালের রুক্ষ চুলগুলো বাতাসে উড়ছে , চোখে একটা অদ্ভুত বিহ্বল দৃষ্টি । বিভূতিভূষণের বড় ভাল লাগল । মনে হলো , এই মেয়েটিকে তিনি immorlal করে যাবেন । আর তার থেকে দুর্গার পরিকল্পনা । " [২১১] আর একটি সূত্র দেন জিতেন্দ্রকুমার চক্রবর্তী — তিনি বনগ্রাম নিবাসী বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের কাছ থেকে জানতে পারেন যে বিভূতিভূষণের সর্ব কনিষ্ঠ ভগিনীর নাম ছিল সরস্বতী — ডাকনাম মণি — তিনি এই বোনটিকে বড়

ভালবাসতেন এবং আদর করে দুর্গা বলে ডাকতেন । আদর্শবাদ ও বাস্তববাদের যুগল ভাবনায় বিভূতিভূষণ দুর্গা চরিত্রের সৃষ্টি করেছেন । আর্তের প্রতি করুণায় , ভালবাসায় সে যেমন তার আদর্শবাদী মনের পরিচয় রেখেছে তেমনি পরের দ্রব্য চুরি করায় , ভাইয়ের সঙ্গে ঝগড়া করায় ও সাধারণ ফুল — ফল সংগ্রহে , পুতুল খেলায় বাস্তববাদী সাধারণ চরিত্রের দোষগুণ সহ দেখা দিয়েছে । মেঘনাদ প্রমীলাকে হারিয়ে লঙ্কাবাসী ' সপ্ত দিবানিশি ' বিষাদে কেঁদেছিল আর নিশ্চিন্দিপুরের দুর্গা প্রতিমার বিরহে ' পাড়ার লোকে উঠান ভাঙ্গিয়া পড়িল '।

অপু :- অপু শিশু , অপু কবি , অপু দার্শনিক ; অপু বৈজ্ঞানিক , অপু সাধারণ মানুষ , অপু চিরপথিক যাযাবর । অপুকে বহুরূপীর সঙ্গে তুলনা করে বলতে ইচ্ছে করে ' এক অঙ্গে এতরূপ দেখিনি তো আগে ' বিভূতি মন নিংড়ে অপুর জন্ম । তাই তার চরিত্রের এত জৌলুশ , এত বর্ণ বৈভব , এত অলঙ্কার ।

অপু শিশুপ্রাণ । বিভূতিভূষণের শিশু বিশ্বে অপু সম্রাট । অপুর শিশুমন চিত্রনে বিভূতিভূষণ এক দক্ষ শিল্পী । কর্ণার্জুনের যুদ্ধে অপু তৃপ্ত হয় না , সে মনে মনে

কৃত্রিম যুদ্ধের পরিকল্পনা করে । নিশ্চিন্দিপুরের রাঙামাটির পথটি শিশু অপুর পদধ্বনিতে মুখরিত । শিশু অপুর কৌতূহলে অবাধ বিস্তার লক্ষ্য করা যায় । রূপকথার প্রতি আকর্ষণ স্যান্যাল মশায়ের গল্প সে দুর্ভিক্ষের — ক্ষুধার আগ্রহে গিলতে থাকে ।

অপু কবি । কবি যেমন পরিচিত দেশটায় অমরাবতীর নিঃশেষ সৌন্দর্য্য নিয়ে আসে , অপুও তেমনি আপন কল্পনা শক্তির সাহায্যে নিশ্চিন্দিপুরের পরিচিত বিবর্ণ দেশটাতে কল্পলোকের জাল বিস্তার করে । কঠোর বাস্তব লোকের মধ্যে যে রূপলোকের স্বপ্ন মাধুরী লুকিয়ে আছে তারই অবগুন্ঠন খুলে দিয়েছে অপু । তাহার ' নিসর্গ দৃষ্টি প্রধানত কবির দৃষ্টি '। ' তার কাব্য মাধুর্যের কাব্য ' ' তার গানের সুর রাখালিয়া গানের অথবা বৈষ্ণবের একতারার সুর '। বিন্দুর মধ্যে সিন্ধুদর্শনের ক্ষমতা আছে অপুর । শ্রীকৃষ্ণের মত সে ক্ষুদ্র বালুকণার মধ্যে বিশ্বরূপকে দেখিয়েছে । শৈশব থেকেই অপু কল্পনা প্রবণ । সে গল্প লেখে , কর্ণের দুঃখে ব্যথিত হয় , নিশ্চিন্দিপুরের শ্যাম পল্লীপ্রকৃতি , ইছামতীর নির্জনতায় তার কবি মনকে রঙিন করে রাখে । অপু বিখ্যাত ইংরেজ কবি ওয়ার্ডসওয়ার্থের

Prelude এর There was a boy কে স্মরণ করিয়ে দেয় । পার্বত্য ঝরণার গান, তারার ভাষা তারও হৃদয়ে গিয়ে পৌঁছায়।

A gentle shock of mild surprise
Has carried far into his heart the voice
of mountain torrents .

আক্ষরিক ভাবে অপুকে বৈজ্ঞানিক বলা না গেলেও , তার মনটা বৈজ্ঞানিকের মতই কৌতূহল প্রবণ । চিন্তার রাজ্যে সে আইনষ্টাইনের মত চেতনা জগতের আর একটা ডাইমেনশন আবিষ্কার করে । অপুর দৃষ্টি বিজ্ঞানীর দৃষ্টি ।

অপুর মন দার্শনিকের মত তন্ময় বিভোর । অসীম বিশ্বটা তাকে ডাকে হাতছানি দিয়ে । জগৎকে সে দেখে বিশেষ চোখে । মহাদেবের মত তৃতীয় নেত্রের দৃষ্টিতে সে অজানাকে জানার দ্বারে নিয়ে আসে । ডাকঘরের অমলের মত সে অসীমের হাতছানিতে মুগ্ধ হয় । তার মধ্যে আধ্যাত্মিক চেতনাও রয়েছে । সে সরবে তার আধ্যাত্মিক চেতনা ঘোষনা করেনি , কিন্তু প্রকৃতির প্রতি আকর্ষণের মধ্যে তার মধ্যে অন্তঃসলিলা ফল্গু স্রোতের মতই ঐশী চেতনা প্রবাহিত হয়েছে । ' পথের পাঁচালী 'তে অপুর যে

দার্শনিকতার সূচনা পর্ব , ' অপরাজিত ' উপন্যাসে সেই দার্শনিকতারই বিকাশ কাল । ' অপরাজিত ' উপন্যাসে অপু প্রকৃতির মধ্যে আধ্যাত্মিক জীবনের স্বরূপ আবিষ্কার করে :

" আজকাল নির্জনে বসিলেই তাহার মনে হয় , এই পৃথিবীর একটা আধ্যাত্মিক রূপ আছে , এর ফুল ফল , আলোছায়ার মধ্যে জন্মগ্রহণ করার দরুন এবং শৈশব হইতে এর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের বন্ধনে আবদ্ধ থাকার দরুণ এর প্রকৃত রূপটি আমাদের চোখে পড়ে না । এ আমাদের দর্শন ও শ্রবণ গ্রাহ্য জিনিষে গড়া হইলেও আমাদের সম্পূর্ণ অজ্ঞাত ও ঘোর রহস্য ময় , এর প্রতি রেনু যে অসীম জটিলতায় আচ্ছন্ন — যা কিনা মানুষের বুদ্ধি ও কল্পনার অতীত , এ সত্যটা হঠাৎ চোখে পড়েনা । " [২১২]

" সন্ধ্যার পূরবী কি গৌরীরাগিনীর মত বিষাদ ভরা আনন্দ , নির্লিপ্ত ও নির্বিকার — বহুদূরের ওই নীল কৃষ্ণাভ মেঘরাশী , ঘন নীল , নিথর , গহণ আকাশটা মনে যে ছবি আঁকে , যে চিন্তা যোগায় , তার গতি গোমুখী গঙ্গার মত অনন্তের দিকে , সে সৃষ্টি — স্থিতি — লয়ের কথা বলে , মৃত্যুপারের দেশের কথা কয় , — ভালবাস — বেদনা — ভালবাসিয়া হারানো — বহুদূরের এক প্রীতিভরা পুনর্জন্মের

বাণী..... ।"[২১৩]

কেবল কবিত্বে মায়া অঞ্জন ও দার্শনিকের উদাস খেয়ালী মন নিয়ে অপুর আবির্ভাব ঘটেনি , সে জন্ম মৃত্যু শাসিত মর্ত জীবনেরও বার্তাবহ । মায়ের উপর অভিমান , দিদির সঙ্গে ঝগড়া প্রভৃতির মধ্যে অপুর সাধারন মাণসেরই পরিচয় পাওয়া যায় । অপু স্বপ্ন বিলাসী নয় , বাস্তব জীবনের সঙ্গে তার যথেষ্ট যোগ আছে । ' অপরাজিত ' উপন্যাসে সে বারবার জীবনের জটিলতার মধ্যে জড়িয়ে পড়ে। হোস্টেল জীবন ও চাকরী জীবনের রূঢ় অভিজ্ঞতা , মা-অপর্ণাকে হারানোর বেদনা , লীলার অকালমৃত্যু — এসব নারকীয় পরিবেশ সৃষ্টি করে । দেওয়ানপুর স্কুলের দৈনন্দিন দুঃখকষ্টে সে আহত হয়েছে । সহপাঠী জানকীর সঙ্গে ঠাকুর বাড়ীর বদলি ভোগ খেয়ে দিন কাটাতে হয়েছে । কখনো খিদের অভাবে গা ঝিম-ঝিম করে । অপুর মধ্যে মুনি ঋষিদের মত একটা উদাসীনতার পরিচয় অবশ্যই পাওয়া যায় কিন্তু সেই সঙ্গে একথাও সত্য যে অপু জীবন সমস্যার ঝাঁঝ ভালভাবেই উপভোগ করেছে । অপুর মধ্যে একটা প্রেমিক সত্তা বরাবরই রয়ে গেছে । অপর্ণার মধ্যে সে আবিষ্কার করে গ্রাম্য প্রেমিকাকে । অপর্ণা তার চোখে প্রাচীন

পটে আঁকা — তরুণী দেবীমূর্তির ও দশমহাবিদ্যা ষোড়শী মূর্তির আদলে দেখা দিয়েছে । অপর্ণার মধ্যে যে সৌন্দর্য অপু দেখতে পেয়েছে , সেই সৌন্দর্য একটু সেকেলে , একটু প্রাচীন ধরণের । তবে এটাই খাঁটি বাংলার জিনিষ । এদেরই লক্ষ্মীর মত আলতা রাঙা পায়ের চিহ্ন পল্লীর চ্যুত বকুল বীথির ছায়ায় নদীঘাটের আসাযাওয়ার পথে পড়ে থাকে । এদেরই স্নেহ — প্রেম সুখ দুঃখের কাহিনীর সঙ্গে সে মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যের নায়িকাদের সাদৃশ্য খুঁজে পায় । অপর্ণা অপুর বধূ , প্রেমিকা নয় । লীলার উপর অপুর একটা আন্তরিক টান বরাবরই রয়ে গেছে । লীলা অপুর দৃষ্টিতে শুধু ছেলেবেলার সাথীই হয়ে থাকেনি , অপুর দৃষ্টিতে লীলা এক প্রেমিকা রূপেও প্রতিভাত হয়েছে । বিভূতিভূষণ নিজে বলেছেন যে লীলার প্রতি অপুর ভালবাসা গভীর অথচ আবেগহীন । সেই ভালবাসা মনে তৃপ্তি আনে , স্নিগ্ধ-আনন্দ আনে , কিন্তু শিরায় উপশিরায় রক্তের তাণ্ডব নিয়ে আসে না । লীলার প্রতি অপুর ভালবাসা মায়ের পেটের বোনের মত , স্নেহ — মমতা — অনুকম্পা মিশ্রিত একটা মাধুর্যভরা ভালবাসা । অথচ লীলার রোগশয্যায় অপুর আবেগহীন ভালবাসা আবেগ — তপ্ত হয়েছে । লীলার ডান

হাতখানা নিজের দুহাতের মধ্যে চেপে ধরেছে । লীলার সারাদেহও শিউরে উঠেছে , সে জীবনে যা কারোও কাছে পায় নি , তাই সে আজ অপুর কাছে পেয়েছে । শেষে অপুর চমক ভাঙ্গলে দেখতে পায় যে লীলা তার অশ্রুপ্লাবিত পান্ডুর মুখখানি তার বুকে লুকিয়েছে কখন । আসলে অপুর মধ্যে দুটো ভাবের দ্বন্দ্ব চলেছেই । একদিকে বাস্তব জীবনের বিভিন্ন সমস্যা তাকে যেমন উত্তেজিত করেছে , বিচলিত করেছে , অন্যদিকে তার মধ্যে যে দার্শনিক গোছের মানুষটা রয়েছে সে তাকে সকল দুঃখ , সমস্ত বেদনা থেকে উত্তীর্ণ করে মহত্তর ও বৃহত্তর জীবন — ভাবনায় প্রেরিত করেছে । অপু চরিত্রটি এক রহস্যাবৃত চরিত্র । বিভূতি সাহিত্য সমালোচক শ্রী তিমির বরণ চক্রবর্তীর ভাষায় :

" আম আঁটির ভেঁপু গল্পাংশের নায়ক 'অপু'র জীবনটিও এক অর্থে রহস্যবৃত। ' গতিবাদ ' ও আনন্দতত্ত্বের যুগল মিলনে সৃষ্ট এক অপূর্ব সুন্দর চরিত্র এই অপু চরিত্র। অপু — ছোট্ট একটি নাম , কিন্তু বৃহৎ এর ব্যাপ্তি , বিপুল এর প্রকাশ ।"[২১৪]

বিধাতার পরম বিষ্ময়কর সৃষ্টি অপু । প্রকৃতপক্ষে অপুর দুজনের প্রতি আকর্ষণ ছিল সর্বাধিক — দিদি দুর্গা ও

লীলা । দুর্গার প্রতি অপুর মনে গভীর টান ছিল । অন্যদিকে লীলার মুখের শেষ অনুরোধ রক্ষার্থে অপু পোর্তো প্লাতার ডুবো জাহাজের সোনার সন্ধানে চলে যায় । যদিও লেখক স্পষ্ট করে একথা বলেন নি কিন্তু আভাস দিয়েছেন । অপর্ণার দান কাজলকেও সে ছেড়ে গেছে ।

অপু চিরপথিক যাযাবর । নিরাসক্ত মহাকালের মতই সে উদাসীন । পথের দেবতার আহ্বানে সে গৃহের বন্ধন ত্যাগ করে , আত্মীয় পরিজনের মায়া কাটিয়ে নব নব বৈচিত্র্যের অভিসারে ছুটে চলেছে । রবীন্দ্রনাথের তারাপদর মতই সে বাঁধন হারা প্রাণ। তারাপদ যেমন সংসার জীবনের সমস্ত স্নেহ , মায়া , মমতা ত্যাগ করে উদাসীন জননী বিশ্ব পৃথিবীর ডাকে সাড়া দিল , অপুও তেমনি পথের দেবতার বাঁশী শুনে উন্মনা হয়ে যায় , উদাস ব্যাকুল প্রাণ তখন পথকেই ঘর মনে করে । নিশ্চিন্দিপুর থেকে কাশী , কাশী থেকে বর্ধমান , বর্ধমান থেকে মনসাপোতা , মনসাপোতা থেকে কোলকাতা , কোলকাতা থেকে নিশ্চিন্দিপুর আবার নিশ্চিন্দিপুর থেকে নিরুদ্দেশের পথ — এ সবই অপুর জীবনের যাত্রাপথ । শরৎচন্দ্রের শ্রীকান্ত ভবঘুরে । তার জীবন অভিজ্ঞতার পথে এসেছে রাজলক্ষ্মী , কমললতা ,

অভয়া , অন্নদা দিদি , ইন্দ্রনাথ আরও অনেকে । অপুর জীবন চলার পথে পরিচয় হয়েছে অনেকের সঙ্গে । এই পরিচয়বৃত্তে আছে দিদি , মা , বাবা , রাণুদি , পটু , নরোত্তম দাস , আতুরী বুড়ীর , লীলা , নির্ম্মলা , প্রণব , অপর্ণা , অনিল , কাজল আরো অনেকে । কিন্তু শ্রীকান্তের পথচলা ও অপুর পথচলা এক নয় । শ্রীকান্ত চিরপথিক নয় কিন্তু অপু চিরপথিক । অপুকে মহাকালের মানব সংস্করন বলা যেতে পারে । অপুকে কেউ বাঁধতে পারে নি । না নিশ্চিন্দিপুর , না কাজল । অপু চির সতেজ , চির সজীব । তার মধ্যে রয়েছে প্রবল প্রাণাবেগ সুতরাং :

" জীবনেরে কে রাখিতে পারে ?
আকাশের প্রতি তারা ডাকিছে তাহারে ।
তার নিমন্ত্রণ লোকে লোকে ।
নব নব পূর্বাচলে আলোকে আলোকে । "

উপসংহার

বর্তমান আলোচনা প্রসঙ্গে কথা সাহিত্যিক বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তাঁর অমর গ্রন্থ ' পথের পাঁচালী ' ও ' অপরাজিত ' সম্পর্কে বিভিন্ন দিক দিয়ে আলোচনা করে মূল্যায়ণ করা গেল । উক্ত মূল্যায়ণের মানদন্ডে তাঁর অন্যান্য উল্লেখযোগ্য উপন্যাস , আরণ্যক , দৃষ্টিপ্রদীপ প্রভৃতির আলোচনা প্রসঙ্গে দেখাতে চেষ্টা করেছি যে বিভূতি কথাসাহিত্য উপন্যাস শৈলীর কোন মূল্যে অথবা কোন আঙ্গিকের মাধ্যমে বাংলা কথাসাহিত্যের ইতিহাসে চিরস্থায়িত্বের আসনটি দখল করেছে । মূল্যায়ণের প্রেক্ষাপটে চুম্বকের আকারে যে সমস্ত মণি — মাণিক্য আহরণ করা হল তার একটি সার্বিক তত্ত্ব এবং তথ্যবহুল আলোচনার মূল্যায়ন তুলে ধরার প্রয়াস করছি উপসংহার অংশে ।

আমরা দেখেছি যে বাংলা কথাসাহিত্যে বিভূতিভূষণের এক স্বতন্ত্র স্থান আছে। সমসাময়িক সাহিত্যিকদের সঙ্গে তিনি সুর না মিলিয়ে এক নতুন সাহিত্য

ভুবন সৃষ্টি করেছেন ।

প্রকৃতির রূপকার বলে বিভূতিভূষণের খ্যাতি সর্বত্র । বাংলা কথাসাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্রের পর ও বিভূতিভূষণের আগে প্রকৃতি চেতনার খুব একটা স্পষ্ট রূপ দেখা যায় না । রবীন্দ্রনাথের নিসর্গচেতনা অতুলনীয় তাতে কোন সন্দেহ নেই । কাব্য কবিতা, ছোটগল্প প্রভৃতিতে তিনি যে গভীর নিসর্গ চেতনার পরিচয় দিয়েছেন , উপন্যাসে প্রকৃতির জন্য ততখানি জায়গা ছেড়ে দেন নি । রবীন্দ্র উপন্যাসে তাৎপর্য পূর্ণ নিসর্গচিত্র থাকলেও সেখানে প্রকৃতির আত্মিক সত্বার স্বকীয় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে বলে মনে হয় না । রবীন্দ্র উপন্যাসে মূল বিষয়ের সঙ্গে প্রকৃতির গূঢ় যোগ নেই। শরৎচন্দ্রের উপন্যাসে কোথাও কোথাও প্রকৃতির চিত্র পাওয়া গেলেও তাঁর উপন্যাসে সমাজ চেতনাই প্রধান । বিশ শতকের তৃতীয় দশক যখন জীবন সমুদ্র বিভিন্ন সমস্যায় সফেন তখন বিভূতিভূষণ জীবনের সেই বিক্ষুব্ধ মুহূর্তে সৃষ্টি করলেন এক শান্ত স্নিগ্ধ নিসর্গ — ভুবন । তাঁর নিসর্গ জগৎ সজ্জিত হয়েছে গ্রাম্য প্রকৃতির সরল সহজ ভাবধারায় আবার কোথাও অরণ্য প্রদেশের রহস্য রসাতুর রূপে । অরণ্য প্রকৃতি পৌষের চন্দ্রালোকিত মধ্যরাত্রির মত

কুহেলীকুহকে আচ্ছন্ন । বিভূতি প্রকৃতি একই সঙ্গে চিত্র ও সঙ্গীত ধর্মী । তিনি প্রকৃতিকে শুধু বালকের বিস্ময়ভরা দৃষ্টিতেই দেখেননি, গভীরেও চলে গেছেন । যেখানে আছে এক শিল্পীর প্রগাঢ় প্রজ্ঞা দৃষ্টি । মুগ্ধতার পথ বেয়ে তাঁর প্রকৃতি চেতনার উত্তোরন ঘটেছে অধ্যাত্মিকতার পথে ।

পথের পাঁচালীতে গ্রাম্য প্রকৃতি তার সমগ্র রূপ নিয়েই ফুটে উঠেছে । সাধারণ ফুল-ফল , লতা-পাতা পরিচিত হয়েও এখানে অপরিচিতের ব্যাঞ্জনায় উদ্ভাসিত । শরৎচন্দ্র গ্রামের প্রকৃতিকে নয় , সমাজকেই রূপ দিয়েছিলেন । গ্রামের সঙ্কীর্নতা ব্যাধি নিষ্ঠুরতার ছবি তিনি এঁকেছেন , কিন্তু বিভূতিভূষণ গ্রামের সবখানি জড়িয়েই গ্রামের প্রকৃতিকে ভালবেসেছেন । তিনি রুদ্র ও সুন্দর উভয় প্রকৃতিকেই রূপ দিয়েছেন ।

আমরা দেখেছি বিভূতিভূষণের কাল চেতনা তার সম সময়ের ইতিহাস নয় । তিনি সে সময়ের সামাজিক অর্থনৈতিক অথবা রাজনৈতিক সঙ্কটের চিত্র আঁকেন নি , চিরন্তন কালের অনিঃশেষ বহমানতারই কথা বলেছেন । পথের পাঁচালী ও অপরাজিত উপন্যাসে বিভূতিভূষণ মহাকালের শক্তি ও উদাসীনতার পরিচয় দিয়েছেন ।

মহাকালের রুদ্রাক্ষের মালা থেকে খসে পড়েছে সময় প্রতি মুহূর্তে কায়াহীন বেগে । সময়ের স্রোতে ভেসে চলেছে ইন্দির ঠাকুরুণ রামচাঁদ রায় , হরিহর , সর্বজয়া , অপু , দুর্গা , আরো অনেকে । এরা সব কালের পথের পথিক । কেউ অতীতের ঐতিহ্য বাহী, কেউ বা বর্তমান ভবিষ্যতের । চলমান কালের সঙ্গে চলমান জীবনের নিকট সম্পর্কের জীবন্ত দলিল উক্ত দুটি গ্রন্থ । নিরাসক্ত কালের প্রহরীর কাছে মানুষের জন্ম মৃত্যু ক্ষুদ্র ইতিহাস হলেও সে ইতিহাস লেখক দরদ দিয়েই রচনা করেছেন । রবীন্দ্রনাথ বলাকা কাব্যে জগতের নিরাকার গতি স্রোতকে এক আশ্চর্য্য দার্শনিক দৃষ্টি ভঙ্গীতে ফুটিয়ে তুলেছেন , বিভূতিভূষণ মানব জীবনের প্রেক্ষাপটে প্রবহমান কালকে প্রকাশ করেছেন।

উপন্যাসে লেখক নীড় ও আকাশের নিলীমাকে একাধারে ধরেছেন । এক দিকে খাঁচার পাখীর নিজের খাঁচাটির প্রতি মায়া , অন্য দিকে বনের পাখীর বৃহত্তর জগতের প্রতি উন্মুখতা — এক দিকে সর্বজয়া , দুর্গা প্রভৃতি দের গন্ডী বদ্ধ সংসার , আর একদিকে অপুর মহাবিশ্বের মহাপথে অনির্দেশ যাত্রার ইঙ্গিত । শৈশব জীবনের কাব্যকার বিভূতিভূষণ শিশু মনস্তত্ত্বের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষন করেছেন ।

শিশু মনের স্বাভাবিক বৃত্তিগুলি অপু , দুর্গার মধ্যে কাব্য সুন্দর দৃষ্টিতে প্রকাশ পেয়েছে ।

বিভূতিভূষণের সমাজ জিজ্ঞাসা একটি বিশেষ যুগের নয় , চিরন্তন কালের । বিভূতিভূষণ তাঁর সমসাময়িক ঔপন্যাসিকদের মত পাশ্চাত্য অনুসৃত উগ্র সমাজ জীবনের পরিচয় দেন নি । অধুনা প্রচলিত সমাজ চেতনা তাঁর রচনায় হয়ত নেই , কিন্তু মানুষের জীবনের অতল গভীর সমস্যাকেই তিনি রূপ দিয়েছেন । দারিদ্রের নিষ্ঠুর নিষ্পেষণে নিষ্পেষিত কাতর পল্লীকেন্দ্রীক মানব জীবনের ভাষাহীন বেদনাকে বিধবার অসহায় অবস্থা , নির্মম কৌলীন্য প্রথার নিষ্ঠুরতার চিত্রকে তিনি তাঁর সমাজ জীবনের প্রেক্ষাপট রূপে গ্রহণ করেছেন ।

বাহ্যিক আড়ম্বরের মূল্য দিয়ে বিভূতিভূষণ ও অপুর স্বদেশানুরাগকে পরিমাপ করা যায়না । অপুর দেশপ্রীতিতে চড়া রঙের বাহার না থাকিলেও , তা যেমন আন্তরিক তেমনি খাঁটী । মৃত্যু চেতনা বিভূতিভূষণের সাধারণ অপেক্ষা পৃথক ধরণের। তাঁর কাছে মৃত্যু ভীতিপ্রদ নয় , আধ্যাত্মিক অনুষঙ্গে প্রকাশিত ।

লোক জীবন ও লোক সংস্কৃতির প্রতি বিভূতিভূষণের

যে স্বাভাবিক টানের পরিচয় পাই ' পথের পাঁচালী ' উপন্যাসে বিভিন্ন প্রকারের ছড়া প্রবাদ প্রবচন , ধাঁধা ইত্যাদির মধ্যে । ' পথের পাঁচালী ' গ্রন্থে চিত্রের এক বিশেষ ভূমিকা দেখতে পাই । উপন্যাসটি যেন খণ্ডখণ্ড কয়েকটি চিত্রে গাঁথা । চিত্রগুলির ফলে উপন্যাসটি বর্ণনাত্মক হয়ে উঠেছে । এতে নাটকীয় মুহূর্তের আবির্ভাবে বাধা পড়েছে একথা সত্য , কিন্তু চিত্রগুলি উপন্যাসের রসহানি করেনি । একথা বলা যেত পারে । অপরাজিত উপন্যাসে এরূপ চিত্র-সর্বস্বতার পরিচয় পাই না ।

' পথের পাঁচালী ' ও ' অপরাজিত ' আসলে মানব জীবনের পাঁচালী । বিষ শতকের তৃতীয় দশকে যখন যুদ্ধোত্তর পরিবেশে মানুষের মন [redacted] বিভিন্ন কারনে দিশেহারা — উদ্ভ্রান্ত তখন বিভূতিভূষণ মানব মহিমার নূতন মূল্যবোধ আরোপ করলেন। বিভূতিভূষণের সমস্ত রচনায় ' গভীর উদার ' মানব প্রীতির স্বাক্ষর আছে । ' জীবন পলাতক ' সংজ্ঞায় বিভূতিভূষণের প্রতিভাকে শুধু ছোট করে দেখা হয় না । তাঁর প্রতিভাকেও অস্বীকার করা হয় । সাধারন উপন্যাসে যে সমাজ সচেতন বা মণঃসমীক্ষামূলক পদ্ধতির অবতারনা করা হয় , তারই

নিরিখে বিভূতিভূষণকে বিচার করলে ভুল হবে । বাংলা দেশের দরিদ্র , নিম্নমধ্যবিত্ত মানুষের সুখ-দুঃখ ব্যথা-বেদনা , দরিদ্র-বিড়ম্বনার চিত্র তিনি আন্তরিকতার সঙ্গে এঁকেছেন ।

' পথের পাঁচালী ' ও ' অপরাজিত ' উপন্যাসে আমরা দেখেছি উপন্যাসের নায়ক অপুর বিভিন্ন জীবন সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে ' অপরাজিত ' জীবন কাহিনী । বিভূতিভূষণ মানুষকে উগ্র রঙে আঁকেননি বা আঁকতে তিনি চানও নি । বিভূতিভূষণ মানব মনের বিভিন্ন বৃত্তিগুলিকে অসামান্য দক্ষতার সঙ্গে ফুটিয়ে তুলেছেন । মা , ছেলের বাৎসল্য ও মাতৃমণের বিচিত্র গতি তথা স্নেহশীলতা নারীমন ও মনস্তত্ত্বের বিচিত্র সাধ ও সাধনা তথা গতি প্রকৃতি আশ্চর্য কমনীয় রূপ লাভ করেছে ।

ভাইয়ের প্রতি বোন এবং বোনের প্রতি ভাইয়ের মনকেমনের ভাবে ' পথের পাঁচালীর ' প্রতিটি পৃষ্ঠা ভরা । ভাই-বোনের মধুর সম্পর্কে কখনও দাগ পড়েনি , এমনকি মৃত্যু ও বাধা স্বরূপ হয়ে ওঠেনি ।

বিভূতিভূষণের নারীদের মধ্যে আমরা রোহিনী , দেবী চৌধুরানী , শৈবলিনীকে পাবনা , পাবনা বিনোদিনী , লাবন্য অচলা , কিরন ময়ী , রাজলক্ষী , সাবিত্রী , রমা ,

ষোড়শী , বসন্ত , কুসুমকে । পুরুষদের মধ্যে পাবনা নগেন্দ্র , প্রতাপ , গোরা , অমিত , মহেন্দ্র , উপেন্দ্র , সতীশ , জীবানন্দ , বনোয়ারী , দেবু , শশী ডাক্তার বা খগেন বাবুকে । তা বলে দুঃখ করার কিছু নেই । ধাতুরিয়া , যুগল প্রসাদ , রাজু পাঁড়ে , কুন্তা , ভানুমতি , অপর্ণা , লীলা , ভবানী , তিলু এবং সর্বোপরী অপু আমাদের মন জয় করেছে ।

বিভূতি সাহিত্যে প্রকৃতির স্বকীয়তা স্বীকার করেও একথা বলা অন্যায় হবে না যে তাঁর কথা সাহিত্যের প্রাণ মানব জীবন । তাঁর কথা সাহিত্যে প্রকৃতি ও অধ্যাত্ম জীবনের উন্মেষ মানব জীবন সম্পর্কে গভীরতা উপলব্ধির উপাদান স্বরূপ । তুচ্ছ অবহেলিত মানুষেরা বিভূতি সাহিত্যে মহৎ গৌরবে আসীন । বিভূতিভূষণ রবীন্দ্রনাথের আকাঙ্ক্ষিত সেই ' নব দ্বৈপায়ন ' , যিনি আমাদের জীবনের ' ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুরুক্ষেত্রের মধ্যে ' ভীষ্ম , দ্রোণ , ভীমার্জ্জুনের অখ্যাত অজ্ঞাত আত্মীয়কে আবিষ্কার করেছেন ।

উপন্যাসের অন্যতম উপাদান উপকাহিনী । উপকাহিনী মূল কাহিনীর সঙ্গে সমান্তরাল গতিতে অগ্রসর হলেও পূর্ণাঙ্গ বা স্বয়ংসম্পূর্ণ নয় , মূল কাহিনীকে পুষ্ট ও

উজ্জ্বল করার উপাদান স্বরূপ । ' পথের পাঁচালী ' উপন্যাসে উপকাহিনীর উপাদান আবিষ্কার করতে যাওয়া এক বিতর্কের বিষয় সন্দেহ নেই , কিন্তু একথা বলা একেবারে অযৌক্তিক নয় যে পথের পাঁচালী উপন্যাসে উপকাহিনীর বীজ নিহিত । বল্লালী বলাই অংশে পথের পাঁচালী উপন্যাসের স্রষ্টা যদি কালের বেদিমূলে অর্ঘ্য নিবেদন করে থাকেন অর্থাৎ কালচেতনাই যদি এখানে মুখ্য হয় তা হলে উপকাহিনীর সম্ভাবনা থাকে না কিন্তু এই উপন্যাসে কালের গুরুত্ব স্মরণে রেখেও বলা যেতে পারে যে যদি বিভূতিভূষণ কালকে একটা idea রূপে গ্রহণ করে কাহিনী সৃষ্টি করতেন তা হলে তিনি উপন্যাস না লিখে কাব্য লিখতেন , ঔপন্যাসিক না হয়ে দার্শনিক হতেন । উপন্যাসের উপজীব্য মানবজীবন । বিভূতিভূষণ মানবজীবনেরই পাঁচালীকার একথা সবসময় মনে রাখতে হবে । যদি উপন্যাসের নায়ক কাল হয় তা হলে পথের পাঁচালীতে উপকাহিনীর সম্ভাবনা থাকে না । কারণ কাল প্রবাহের ভিন্ন ভিন্ন স্তরে বিভিন্ন মানুষের ও একজন মানুষের জীবনের বিভিন্ন স্তরের পরিচয় পাওয়া যায় এখানে । কিন্তু উপন্যাস যেহেতু বাস্তব মানুষের , বাস্তব জীবনের কাহিনী তাই মহাকাল নায়ক হতে পারে না ।

' অপুই ' ' পথের পাঁচালী ' ' অপরাজিত ' র নায়ক । অবশ্য অতিনায়ক বলে যদি কিছু থাকে তবে কালই সেই ভূমিকা নিয়েছে । অপু এই উপন্যাসের নায়ক তাহলে মূল কাহিনীর আরম্ভ সম্ভবত ' আম আঁটির ভেঁপু ' থেকে । ' বল্লালী বালাই ' এর ইন্দির ঠাকরুণের কাহিনীর প্রয়োজনীয়তা যতটা কাল প্রবাহের ক্রম রক্ষার্থেই ইন্দির ঠাকুরুণের কাহিনী সৃষ্টি করতেন লেখক তা হলে এ কাহিনী এতখানি প্রাণবন্ত হত না । ' বল্লালী বালাই ' এর মত এমন নিটোল , কাহিনীর এমন ঠাসবুনানি গ্রন্থের পরবর্তী দুটি অধ্যায়ে পাওয়া যায় বলে মনে হয় না । বল্লালী বালাই স্বতন্ত্র কাহিনীও নয় , মূল কাহিনীকে ফুটিয়ে তোলার জন্যই এ অংশের সৃষ্টি । ইন্দির ঠাকুরুণের কাহিনীর মধ্যে উপকাহিনীর সম্ভাবনা রয়েছে । তার বেদনাবিধূর জীবনের কাহিনী উপকাহিনীর আমেজ সৃষ্টি করে ।

বিভূতিভূষণের মনে গ্রাম ও শহর সম্পর্কে ধারণা একরূপ ছিল না । পল্লীপ্রকৃতি ও পল্লীজীবন তাঁকে যতখানি আকৃষ্ট করেছিল , সম্মোহিত করেছিল , নগর প্রকৃতি ও নগর জীবন ততখানি করেনি । অবশ্য একথা বলা যায় যে সব গ্রাম বিভূতিভূষণের মন কাড়ে নি ; নিশ্চিন্দিপুর অপুকে

যতখানি মুগ্ধ করেছিল মনসাপোতা ততটা পারে নি । তবে একথা সত্য যে বিভূতিভূষণ পল্লীজীবণকে একেবারে নির্মল করে , বিশুদ্ধ করেই গড়ে তোলেন নি , অল্পবিস্তর কলঙ্কেরও দাগ লাগিয়েছেন । ' পথের পাঁচালী ' র অত্যাচারী জমিদার অন্নদারায়ের কদর্য ব্যবহার পল্লীর স্নিগ্ধ শ্যামল পরিবেশে দুষিত আবহাওয়ার জন্ম দিয়েছে । সেজ ঠাকরুণের মত এমন রুক্ষ চরিত্র , পিতমের মত ঠগব্যক্তিরও অভাব নেই পল্লীগ্রামে । পল্লীপ্রকৃতির সৌন্দর্যের পরিচয় যেমন লেখক দিয়েছেন , তেমনি পল্লীর কদর্যতাকেও এড়িয়ে যাননি তিনি । শরৎচন্দ্রের রচনায় পল্লীসমাজের দলাদলীর সংঘর্ষ সরল পল্লীজীবনকে ঘোরালো করে তুলেছে । রাজনৈতিক দিকটি পল্লীপ্রকৃতির শ্রীভ্রষ্ট করেছে ও আমাদের মনে ' ছায়াসুনিবিড় শান্তির নীড় ' পল্লীজীবনের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালবাসার বিপরীত ধারনাই জাগিয়ে দেয় । অন্যদিকে বিভূতিভূষণের পল্লীজীবনে দলাদলীর চিত্র নেই বরং পল্লীপ্রকৃতি এক অলৌকিক জগতের অধরা মাধুরীর স্পর্শ দেয় । কিন্তু তবু বিভূতিভূষণের পল্লীজীবন একেবারে নিস্কলুষ নয় । রুক্ষ দারিদ্র্য যে ' পথের পাঁচালী ' অপরাজিতর পল্লীজীবনে নেই তা বলা যায় না । ড. চৈতালী বন্দ্যোপাধ্যায় পথের

পাঁচালীর পল্লীজীবন সম্পর্কে বলেছেন " যে দারিদ্র্যের মধ্য দিয়ে তাদের দিন কাটাতে হচ্ছে --- সেই দারিদ্র্যের ভয়ংকরতাও পাঠকের চোখে পড়ে না । দারিদ্র্যের কঠোরতার থেকেও রোমান্টিকতাই বেশী ফুটে উঠেছে । ক্ষুধার্ত অপু খিদের মুখে বাসি চালভাজা খেতে চায় না অথচ সেই মহূর্তেই কইমাছ দেখে তার লোলুপতা বাড়ে না বরং কানে হাঁটা কইমাছ দেখার জন্য সে ব্যস্ত হয়ে পড়ে । " *

সমালোচকের উক্ত ধারনাটি একপেশে বলে মনে হয় , কারণ কেবল বালক অপুর চোখ দিয়ে নিশ্চিন্দিপুর গ্রামটিকে দেখলে গ্রামটির সবখানি দেখা হয় না । অপুর শিশু দৃষ্টিতে দারিদ্র্যতার রুক্ষতাও রোমান্টিক হয়ে উঠবে কিন্তু সর্বজয়া হরিহরের অভিজ্ঞ দৃষ্টিতে দেখলে [redacted] দারিদ্র্যের আঘাতে নিশ্চিন্দিপুর গ্রামের ব্যথাজীর্ণ বুকের যন্ত্রণা কি অনুভব করতে পারা যায় না ? দারিদ্র্যের নিষ্ঠুর নিষ্পেষণের হাত থেকে সংসারকে বাঁচাবার জন্য সর্বজয়ার প্রাণপণ প্রচেষ্টার কথা ভুললে চলবে না।

---

* বাংলা উপন্যাসে আঙ্গিকঃ বিভূতিভূষণ ও তারাশঙ্কর বইটি দ্রষ্টব্য

এক কথায় বলা যায় যে বিভূতিভূষণ পথের পাঁচালী ও অপরাজিত উপন্যাসে বিষামৃতে মিশ্রিত গ্রামজীবনেরই পরিচয় দিয়েছেন ।

নগর জীবনের প্রতি পথের পাঁচালী ও অপরাজিত উপন্যাসে বিভূতিভূষণের বিশেষ আকর্ষণ বা দরদ দেখতে পাই না । বিভূতিভূষণের শহর তাঁর পল্লীজীবনের তুলনায় রুক্ষ ও জটিল । অবশ্য একথা সত্য যে নগর জীবনের বিভিন্ন সমস্যার উত্তেজনা ও জীবনের উচ্চকিত কলরবে তার সাহিত্য সমুদ্র হয়ত সফেন হয়ে ওঠেনি , কিন্তু তা বলে তিনি যে নগর জীবনের ছোট খাট সমস্যার রূপ দেননি একথা বলা অন্যায় । সমুদ্রের বিরাট তরঙ্গের মত এ সমস্যার ঢেউ তটের বুকে বিরাট কম্পণ সৃষ্টি হয়ত করে না , কিন্তু নদ-নদীর ও ছোটখাট পুকুরের ঢেউয়ের মত এই সব সমস্যা তরঙ্গ জীবন তটে কলতান অবশ্যই সৃষ্টি করে ।

নিশ্চিন্দিপুরে সর্বজয়ার সংসারে অভাব থাকলেও সেখানে সংসার চালানো তার কাছে বিরাট সমস্যা হয়ে উঠে নি , কিন্তু কাশীতে , বর্দ্ধমানে সর্বজয়া বিভিন্ন সমস্যার ভারে পিষ্ট হয়েছে । সর্বজয়া এখানে ভালভাবেই অনুভব

করেছে যে এখানে নিশ্চিন্দিপুরের সরলতা নেই , জীবন এখানে মোটেই সহজ নয় এমনকি নারীর সতীত্ব ও সম্ভ্রম রক্ষার জন্য এখানে প্রয়াস করতে হয় , দৃঢ় হতে হয় । অপু বুঝতে পারে শহরের মানুষের মধ্যে নিশ্চিন্দিপুরের মানুষকে খুঁজে পাওয়া যাবে না ।

বিভূতিভূষণের জীবন দৃষ্টি কখনও সঙ্কীর্ণ নয় । তিনি হয়ত তাঁর সমকালীন সাহিত্য ধারার অনুসরণ করেন নি কিন্তু তাঁর নিজস্ব প্রতিভাশক্তির সহায়তার এক অভিনব সাহিত্য ভুবন সৃষ্টি করেছেন । একথা বলা অযৌক্তিক নয় যে বাংলা কথাসাহিত্যের জগতে বিভূতিভূষণ এক স্বতন্ত্র ভাবধারর কথাসাহিত্যিক । এই দিক দিয়েই তাঁর প্রতিভার মূল্যায়ণ করতে হবে । প্রকৃত শিল্পী সর্বদা নতুন কিছু সৃষ্টি করেন । বিভূতিভূষণ প্রকৃত শিল্পীর ধর্ম থেকে বিচ্যুত হন নি । যতদিন বাংলাসাহিত্য থাকবে ততদিন থাকবে ' পথের পাঁচালী ' , ততদিন বাঙালী মানসে বেঁচে থাকবে ' পথের পাঁচালী ' র স্রষ্টা :

" রিক্ততার বক্ষ ভেদি আপনারে করো উন্মোচন ।
ব্যক্ত হোক জীবনের জয় ,
ব্যক্ত হোক তোমা মাঝে অনন্তের অক্লান্ত বিস্ময় " ।

পরিশিষ্ট

কল্যানী দেবী (রমা বন্দ্যোপাধ্যায়) দ্বারা প্রতিষ্ঠিত

বিভূতি স্মৃতি সৌধ , গৌরীকুঞ্জ

ক্ষেত্র সমীক্ষণে সংগৃহীত প্রতিটি ফটোগ্রাফ স্বয়ং গবেষকের দ্বারা তোলা হয়েছে।

ঘাটশিলা স্থিত অপুর পথ

ঘাটশিলা স্থিত অপুর পথ

(১) গৌরীকুঞ্জ , ঘাটশিলা

বিভূতি স্মারক সমিতির উদ্যোগে
প্রতিষ্ঠিত
জনুট বিহারী সাক্ষরতা কেন্দ্র
বাবস্থাপনায়-সংস্কৃতি সংসদ
ডাহিনোড়া, ঘাটশিলা
প্রতিষ্ঠা: ১৬ ই আগষ্ট '৯৮

(২) গৌরীকুঞ্জ , ঘাটশিলা

বিভূতি সংস্কৃতি ভবন ও বিভূতিভূষণ
বন্দ্যোপাধ্যায়ের মর্মর মূর্তি , ঘাটশিলা

'পথের পাঁচালী'

'পথের পাঁচালী' বিভূতিভূষণ রচিত প্রথম উপন্যাস। এই উপন্যাসের গ্রন্থকর্ত্তারূপেই বিভূতিভূষণ সাহিত্য-জগতে প্রবিষ্ট হন। তৎপূর্ব্বে 'মেঘমল্লার' গল্প-গ্রন্থের কয়েকটি গল্প তৎকালীন বিখ্যাত সাময়িক-পত্র 'প্রবাসী' ও 'বিচিত্রা'য় প্রকাশিত হইয়াছিল। 'পথের পাঁচালী' বিভূতিভূষণের প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থও বটে, প্রথম উপন্যাসও বটে। 'পথের পাঁচালী' পুস্তক আকারে প্রকাশের পূর্ব্বে ধারাবাহিক রচনা হিসাবে নিয়মিত মাসিক কিস্তিতে 'বিচিত্রা'র দ্বিতীয় বর্ষের প্রথম সংখ্যা হইতে প্রকাশিত হইতে শুরু হয় (আষাঢ়—১৩৩৫)।

'পথের পাঁচালী'র 'বিচিত্রা'য় ধারাবাহিক রচনা হিসাবে প্রকাশকাল : আষাঢ় ১৩৩৫—আশ্বিন ১৩৩৬।

পুস্তক আকারে প্রথম প্রকাশ : পথের পাঁচালী, প্রথম সংস্করণ : মহালয়া আশ্বিন ১৩৩৬, (ইং ১৯২৯)। পৃ ৪২৭, কাপড়ে বাঁধাই। প্রকাশক রঞ্জন প্রকাশালয়, ২০৬নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, [রুম নং ১৬।১ শ্রীমাণি মার্কেট, দ্বিতল], প্রাপ্তিস্থান—ডি, এম, লাইব্রেরী, ৬১নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

'পথের পাঁচালী' পুস্তক আকারে প্রকাশের পূর্ব্বে রঞ্জন প্রকাশালয়ের তরফে ১৩৩৬ সালের কার্ত্তিক সংখ্যা 'বিচিত্রা' মাসিকপত্রের সূচীপত্রের চতুর্থ পৃষ্ঠার নীচে গ্রন্থটির নিম্নলিখিত বিজ্ঞাপন বাহির হয়—

পথের পাঁচালী

শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত বাঙ্গালা ভাষায় সম্পূর্ণ নূতন ধরণের উপন্যাস। প্রকৃতির স্বাধীন আবহাওয়া একটি শিশু-চিত্তকে কি ভাবে ধীরে ধীরে সংসার-সংগ্রামের উপযোগী করিয়া তুলিতেছে তাহাই বিচিত্র ইতিহাস অপরূপ ভঙ্গিতে বলা হইয়াছে। শিশু-মনের দুর্জ্ঞেয় রহস্য ইতিপূর্ব্বে আর কেহ এদেশে এরূপ ভাবে উদ্ঘাটিত করেন নাই; অন্য দেশেও কেহ করিয়াছেন কিনা আমাদের জানা নাই।

উপন্যাসখানি 'বিচিত্রা'য় ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হইতেছে। ইতিমধ্যেই সাহিত্য-রসিক মহলে ইহার সম্বন্ধে বিস্তর আলোচনা হইয়াছে।

আশ্বিনের মাঝামাঝি বাহির হইবে।

মূল্য তিন টাকা

রঞ্জন প্রকাশালয়

২০৬নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, [রুম নং ১৬।১ শ্রীমাণি মার্কেট, দ্বিতল]

প্রাপ্তিস্থান : ডি, এম, লাইব্রেরী, ৬১নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

পথের পাঁচালী গ্রন্থ বিষয়ক বেশ কিছু মূল্যবান পরিচিতি, বিভূতিভূষণের হস্তে লিখিত 'পাণ্ডুলিপি' ও কবিগুরু রবীন্দ্রনাথকে লেখা একখানি মূল্যবান পত্র। উক্ত তথ্যগুলি সংগৃহীত হয়েছে বিভূতি রচনাবলী (প্রথম খণ্ড), বি. ও ঘোষ - কলকাতা - ১২, প্রথম প্রকাশ, ২৮শে ভাদ্র ১৩৭৭ (২২০০) দ্বিতীয় মুদ্রণ, অগ্রহায়ণ ১৩৭৮, থেকে। সম্পাদক, শ্রীগজেন্দ্র কুমার মিত্র, শ্রীচণ্ডীদাস চট্টোপাধ্যায় এবং তারাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। পৃঃ ৪৪৫, ৪৪৯, ৪৫১, ৪৫৩-৪৫৪.

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়।
কর্মী সঙ্ঘ : "বাংলা"সাহিত্যিক।
৪৩নং বিশ্বনাথ দত্ত, কলিকাতা।

তারিখ

[illegible]। [illegible]।
৮০. ৭. ৪০.

কল্যাণীয়েষু,

আমিও ভেবেছিলুম বটে, তোমার কথা আমার। তবে চরকাপাত তত্ত্ব, তোমার প্রতি [illegible] আমার [illegible] তার। [illegible] যে 'পথের পাঁচালী' [illegible] কেবল [illegible] দিয়েছিলাম [illegible] বলছ কি তার? [illegible] দিয়েছি। [illegible] বেরুবে। [illegible] আমার [illegible] বোধ হয়, ওটা 'পাঁচালী' [illegible]। [illegible] আমার [illegible] আমার [illegible] পারছে না - তোমার [illegible]।

[illegible] আমার [illegible] তোমার [illegible]। [illegible] আমার [illegible] তোমার [illegible]।

আমার [illegible] তোমার [illegible] (সে [illegible] [illegible] [illegible]

পাণ্ডুলিপির আলোকচিত্র

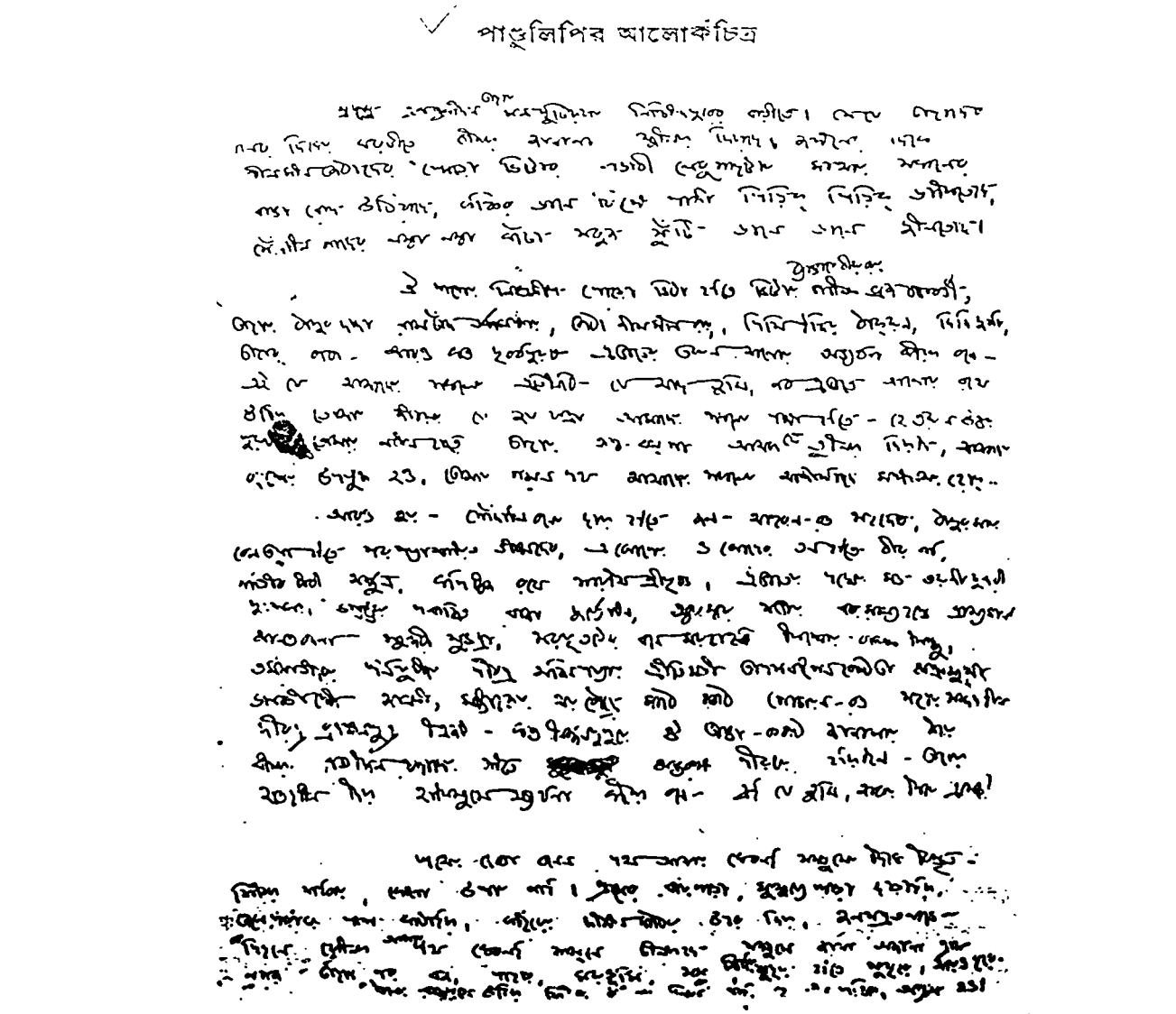

'পথের পাঁচালী'র পাণ্ডুলিপির শেষ পাতা। [১৯৪১ খ্রীঃ ডিসেম্বর মাসে বনগ্রামে শ্রীযুক্ত চণ্ডীদাস চট্টোপাধ্যায়কে
ারক হিসাবে রাখিবার জন্য প্রদান করেন।

'পথের পাঁচালী'র প্রচলিত সংস্করণের সঙ্গে পাঠভেদ আছে।

'আমার লেখা'

"আমার লেখা" রচনাটি প্রথমে 'নবাগত' গল্প-গ্রন্থে প্রকাশিত হয় (প্রকাশকাল: ২৫ জানুয়ারী, ১৯৪৪)। ১৯৪৫ সালের ৯ জুন কলিকাতা কেন্দ্র হইতে এক বেতার-ভাষণে তিনি রচনাটি প্রচার করেন। পরে 'গল্প-পঞ্চাশৎ' গ্রন্থের মুখবন্ধরূপে উহা মুদ্রিত হয় (পৌষ, ১৩৬৩, ইং ১৯৫৬)। বিভূতিভূষণের প্রবন্ধ, অভিভাষণ ও পত্র-সংগ্রহ একত্র করিয়া ১৩৬৮ সালের ২৮ ভাদ্র 'আমার লেখা' নামে একটি পুস্তক প্রকাশিত হয়। "আমার লেখা" রচনাটি উক্ত গ্রন্থের প্রথম রচনা হিসাবে মুদ্রিত হইয়াছিল। (দ্রঃ পুস্তক পরিচয়, মেঘমল্লার)।

চণ্ডীদাস চট্টোপাধ্যায়

'পথের পাঁচালী'

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথকে লেখা বিভূতিভূষণের পত্র

কলিকাতা
প্যারাডাইস লজ্
৪১, মৃজাপুর ষ্ট্রীট,
৮।১১[১৯৩১]

শ্রীচরণ কমলেষু,

আপনাকে কোনোদিন পত্র লিখিনি, এজন্য প্রথম পত্র লিখ্‌তে কেমন একটু ভয় ভয় করে। এবার ভেবেছিলাম আপনার সঙ্গে আর একবার দেখা করি, কিন্তু দার্জ্জিলিং থেকে ফেরবার কোনো সংবাদ পাইনি। আশা করি আপনার স্বাস্থ্য পূর্ব্বাপেক্ষা ভালো।

গত শ্রাবণ মাসে একবার জোড়াসাঁকোর বাড়ীতে গিয়ে আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করি, সে সময় আমার 'পথের পাঁচালী' সম্বন্ধে কিছু লিখ্‌তে আপনাকে অনুরোধ করেছিলাম, কিন্তু তখন আপনার শরীর ভালো ছিল না বলে তারপর এ নিয়ে আর কোনো কথা ওঠাইনি। আর একখানা ছোট গল্পের বই বার করেচি, সেখানাতে আগের লেখা গোটা দশেক গল্প আছে—দুটো ছাড়া বাকীগুলো প্রবাসীতে বার হয়েছিল। সব গল্পই 'পথের পাঁচালী' লিখ্‌বার আগে লেখা—অনেক ক্ষেত্রে ৬।৭ বছর আগেও লেখা। 'উপেক্ষিতা' গল্পটী বইয়ে দেওয়ার

ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু ওটা আমার সাহিত্যিক জীবনের প্রথম গল্প সে হিসেবে ওর প্রতি একটা মায়া আছে শুধু এই জন্যেই ওটা দিয়েচি।

আপনাকে একখানা 'পথের পাঁচালী' ও একখানা 'মেঘ মল্লার' পাঠালাম। আপনার সময় মত যদি কিছু লেখেন, তবে সৌভাগ্যবান বিবেচনা করবো। লেখাটা যদি কৃপা করে 'বিচিত্রা'তে পাঠান, তবে ভাল হয়, কেননা বইখানা 'বিচিত্রা'তেই প্রথম বার হয়েছিল। আপনাকে আর একবার দেখ্‌তে ইচ্ছে হয়, এর মধ্যে আর বোধহয় কল্‌কাতায় আস্‌বেন না?

'পথের পাঁচালী'র অনুবৃত্তি 'অপরাজিত' বলে উপন্যাসখানা সম্প্রতি প্রবাসীতে শেষ হয়েচে—বড়দিনের আগেই প্রকাশিত হবে। আপনি মাসিকের পাতায় উপন্যাস পড়েন না জানি—বইখানা বেরুলেই আপনাকে পাঠিয়ে দেবো—তবে সেবার সমালোচনা লিখ্‌বার জন্য আপনাকে বিরক্ত কোরবো না।

প্রণত

শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

পুঃ—'পথের পাঁচালী'র আর এক ভলুম এর পরে লিখ্‌বো। একটা শিশুমন বিশ্বের আলোয় তার পাপড়ী গুলি কিরূপে ধীরে ধীরে মেলচে, এর বিপুল রহস্যের প্রতি সচেতন হয়ে উঠ্‌চে—এই বইগুলিতে সেটাই বক্তব্য। খুব তুচ্ছ দৈনন্দিন ঘটনাগুলোকেও দিয়েচি এই জন্যে যে গোটা জীবনের স্মৃতির ভাণ্ডারে তাদের দান অমূল্য ও অক্ষয়। আপনার একটুও যদি ভাল লাগে, তবে আমি রচনা সার্থক বিবেচনা করবো।

CALCUTTA UNIVERSITY LIBRARY
CENTRAL LIBRARY BUILDING
CALCUTTA-700073

No L/244/Misc

The 18th June, 1998

TO WHOM IT MAY CONCERN

This is to certify that Mr Gautam Mukherjee S/o Mr Chandrangshu Mukherjee, a Ph D Student of Aligarh Muslim University has used this library for his study purpose to-day on 18.6.98.

(Asok Basu)
University Librarian

গবেষণা কর্মে ব্যবহৃত বিভিন্ন গ্রন্থাগারের প্রধানদের কাছ থেকে প্রাপ্ত প্রমাণপত্র।

अहस्तांतरणीय
NOT TRANSFERABLE

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

राष्ट्रीय पुस्तकालय, कलकत्ता
NATIONAL LIBRARY, CALCUTTA

सं./No. 75527 दिनांक/Date 19 JUN 1998

श्री/Mr. Amit Sri Smt. [illegible]
[illegible] 345 Market
[illegible] Calcutta [illegible] to the
पुस्तकालय के वाचनालय में प्रवेश करने दिया जाय।
Reading Rooms of the Library.

देने की तारीख से 1 वर्ष तक मान्य।
Valid for 1 year from date of issue.

पाठक के प्रतिरूप स्वाक्षर :
Specimen Signature of the Reader :

19.6.98
पुस्तकालयाध्यक्ष
Librarian

नि.पु./N.L. 26
[illegible]/MGIP (Pub. Unit), Sh[illegible] 53
2 LNU 92 23-7-92 -100 000.

To Whom it may concern

This is to certify that Mr. Goutam Mukherjee, the Researcd Scholar of Bengali in Aligarh Muslim University has used this Library for his research work from 3rd July to 14th July.

20.7.99

Librarian

Watarnara foundation

Phone-350-3743

BANGIYA SAHITYA PARISAD

243/1, Acharya Prafullachandra Road, Calcutta-700 006

Ref. No

Date 29/6/99

Goutam Mukherjee, the student of Aligar Muslim University, Department of Modern Indian language, attended at the Bangiya Sahitya Parisad Library Calcutta, for his research work from 22th june - 29th june 1999.

Bhattacharjee.

Librarian
BANGIYA SAHITYA PARISAD

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী

১) অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় - বাংলা সাহিত্যের - সম্পূর্ন ইতিবৃত্ত

২) কালিদাস রায় - বিভূতি বীথিকা

৩) গোপিকানাথ রায় - বিভূতিভূষণ : মন ও শিল্প

৪) চিত্তরঞ্জন ঘোষ - বিভূতিভূষণ

৫) চৈতালী বন্দ্যোপাধ্যায় - উপন্যাসে আঙ্গিক , বিভূতিভূষণ ও তারাশঙ্কর

৬) তারকনাথ ঘোষ - জীবনের পাঁচালীকার বিভূতিভূষণ

৭) তিমির বরণ চক্রবর্তী - বিভূতিভূষণ ও আম আঁটির ভেঁপু

৮) দ্বিজেন্দ্র নাথ রায় - সাহিত্য ও শিল্পলোক

৯) দীপ্তিময় সরকার - বিভূতিভূষণ : কবি ও প্রকৃতি সাধক

১০) পার্থজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়- বিভূতিভূষণ : বিচার ও বিশ্লেষণ

১১) বারিদ বরন ঘোষ - বিভূতি স্মৃতি

১২) বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় - অপরাজিত

অশনি সংকেত

আদর্শ হিন্দু হোটেল

আমার কথা

আরণ্যক

ইছামতী

উপেক্ষিতা

উৎকর্ণ

তৃণাঙ্কুর

দেবযান

দৃষ্টি প্রদীপ

পথের পাঁচালী

পুঁই মাচা

বিভূতি রচনাবলী

ভংশুল মামার বাড়ী

শ্রেষ্ঠ গল্প

সাহিত্য ও সময়

স্মৃতির রেখা

হে অরন্য কথাকও

১৩) বিশ্বনাথ পাল - বিভূতিভূষণ রূপে : অরূপে

১৪) যমুনা বন্দ্যোপাধ্যায় উপল ব্যথিত গতি

১৫) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর - পঞ্চভূত

১৬) রমেন্দ্র নাথ মল্লিক - বিভূতি সাহিত্য পরিক্রমা

১৭) রুশতি সেন - বিভূতিভূষণ : দ্বন্দ্বের বিন্যাস

১৮) সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় - বাংলা উপন্যাসের কালান্তর

১৯) সুনীল কুমার চট্টোপাধ্যায় -

প্রসঙ্গ - প্রসঙ্গতঃ বিভূতিভূষণ

বিভূতিভূষণ : জীবন ও সাহিত্য

বিভূতিভূষণ : দেশে বিদেশে

২০) সুভাষ বন্দ্যোপাধ্যায় -

বাংলা উপন্যাসের লৌকিক উপাদান

২১) হংস নারায়ন ভট্টাচার্য - হিন্দুদের দেব দেবী : উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ প্রথম পর্ব

ইংরাজী

1) Budhadeva Bose -
Modern Bengali Prose

2) Hudson - Hampshire Day

3) William Wordsworth - Prelude

4) Prof. Winternitz -
History of Indian Literature

পত্র / পত্রিকা

১) দেশ

২) পরিচয়

৩) প্রবাসী

৪) বিচিত্রা

৫) মালদহ মহিলা মহাবিদ্যালয় পত্রিকা

৬) মিলনী

৭) শনিবারের চিঠি

সূত্র নির্দেশিকা

(১) সুনীল কুমার চট্টোপাধ্যায় : বিভূতিভূষণ : জীবন ও সাহিত্য , পৃষ্ঠা ৩৭ , প্রথম প্রকাশ , সেপ্টেম্বর - ১৯৯৫

(২) গোপাল হালদার : পরিচয় , বাংলা সাহিত্যে বিভূতিভূষণ , ১৩৫৭ অগ্রহায়ণ

(৩) ডঃ অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় : বাংলা সাহিত্যের - সম্পূর্ন ইতিবৃত্ত , পৃঃ ৫৫৮ , একাদশ সংস্করণ ১৯৯১

(৪) ডঃ অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় : বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ন ইতিবৃত্ত , পৃঃ ৫৬২, একাদশ সংস্করণ

(৫) ডঃ অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় : বাংলা সাহিত্যের সম্পুর্ন ইতিবৃত্ত , পৃঃ ৫৫৯, একাদশ সংস্করণ

(৬) রমেন্দ্র নাথ মল্লিক : বিভূতি সাহিত্যে পরিক্রমা , ভূমিকাংশ , ডঃ অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

(৭) রমেন্দ্র নাথ মল্লিক : বিভূতি সাহিত্য পরিক্রমা , ভূমিকাংশ - অসিত্ কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

(৮) শ্রী তিমির বরণ চক্রবর্তী : বিভূতিভূষণ ও আম আঁটির ভেঁপু , পৃঃ ৫ প্রথম প্রকাশ , ১১ই জুলাই ১৯৮৩

(৯) সম্পাদনা বারিদ বরণ ঘোষ : বিভূতি স্মৃতি :পৃঃ ২৮, বনফুল , বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় , প্রথম

প্রকাশ, জানুয়ারী -
১৯৯০

(১০) ডঃ অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় : বাংলা সাহিত্যের সম্পুর্ণ ইতিবৃত্ত পৃঃ ৫৬০, একাদশ সংস্করণ

(১১) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : পঞ্চভূত , পৃঃ ৩৪ , পুণর্মুদ্রণ , ভাদ্র ,১৩৯৫

(১২) বিশ্বনাথ পাল : বিভূতিভূষণ : রূপে অরূপে পৃঃ ৫১ , প্রথম প্রকাশ ১৪ ই সেপ্টেম্বর , ১৯৯৩

(১৩) বিশ্বনাথ পাল : বিভূতিভূষণ : রূপে অরূপে পৃঃ ৫৬ , প্রথম প্রকাশ ১৪ ই সেপ্টেম্বর , ১৯৯৩

(১৪) বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় : তৃণাঙ্কুর , চতুর্থ মুদ্রণ , পৃঃ ৫৩ - ৫৪

(১৫) সম্পাদনা : বিভূতি স্মৃতি , মানুষ
বারিদ বরণ ঘোষ বিভূতিভূষণ, কালিদাস
রায় , প্রথম প্রকাশ ,
পৃঃ ২০

(১৬) সম্পাদনা : বিভূতিভূষণ : বিচার
পার্থজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় ও বিশ্লেষণ প্রকৃতি
চেতনা ও বিভূতি-
ভূষণের গল্প , অর্ধেন্দু
বিশ্বাস , প্রথম প্রকাশ,
জানুয়ারী , ১৯৯২
পৃঃ ১৩১

(১৭) দীপ্তিময় সরকার : বিভূতিভূষণ : কবি ও
প্রকৃতি সাধক , প্রথম
প্রকাশ , পৃঃ ৮২

(১৮) বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় : বিভূতি রচনাবলী ,
চণ্ডীদাস চট্টোপাধ্যায় উপেক্ষিতা , ১ম খণ্ড ,
সম্পাদিত পৃঃ৩৫০, প্রথম প্রকাশ,
২৮ শে ভাদ্র , ১৩৩৭

(১৯) বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় : বিভূতি রচনাবলী , ১ম
চণ্ডীদাস চট্টোপাধ্যায় খণ্ড , উপেক্ষিতা, পৃঃ
সম্পাদিত ৩৫১ , প্রথম প্রকাশ ,
২৮শে ভাদ্র , ১৩৩৭

(২০) বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় : বিভূতি রচনাবলী - ১ম
চণ্ডীদাস চট্টোপাধ্যায় খণ্ড , পুঁইমাচা , পৃঃ
সম্পাদিত ৩৩৮ , প্রথম প্রকাশ ,
২৮শে ভাদ্র ১৩৩৭

(২১) ডঃ তারকনাথ ঘোষ : জীবনের পাঁচালীকার
বিভূতিভূষণ , পৃঃ ৭২,
প্রথম প্রকাশ , চৈত্র
১৩৭৬

(২২) সুনীল কুমার চট্টোপাধ্যায় : বিভূতিভূষণ : দেশে
বিদেশে, পথের পাঁচালী,
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর পৃঃ৬২,
প্রথম প্রকাশ ,
জানুয়ারী - ১৯৯১

(২৩) সুনীল কুমার চট্টোপাধ্যায় : বিভূতিভূষণ : দেশে
বিদেশে, পথের পাঁচালী,

দিলীপকুমার রায় পৃঃ
৪৮ প্রথম প্রকাশ

(২৪) বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় : বিভূতি বীথিকা ,
কালিদাস রায়
ভূমিকাংশ

(২৫) চৈতালী বন্দ্যোপাধ্যায় : উপন্যাসে আঙ্গিক :
বিভূতিভূষণ ও
তারাশঙ্কর

(২৬) বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় : স্মৃতির রেখা , ৯ই
আগষ্ট ১৯২৭ ,

(২৭) বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় : স্মৃতির রেখা , ৯ই
আগষ্ট ১৯২৭

(২৮) বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় : স্মৃতির রেখা , ১৮ই
আগষ্ট ১৯২৭

(২৯) বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় : বিভূতি রচনাবলী ,
প্রথম খণ্ড : ভূমিকাংশ

(৩০) বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়: পথের পাঁচালী , নবম
মুদ্রণ পৃঃ ৪০ ,
পেপারব্যাক সংস্করণ

(৩১) Budhadeva Bose : Modern Bengali Prose, First edition

(৩২) সুনীল কুমার চট্টোপাধ্যায় : বিভূতিভূষণ : দেশে বিদেশে , অপরাজিত নীরেন্দ্র নাথ রায়

(৩৩) প্রমথ নাথ বিশী : বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ গল্প , ভূমিকা

(৩৪) শ্রী তিমির বরণ চক্রবর্তী : বিভূতিভূষণ ও আম আঁটির ভেঁপু ভূমিকাংশ , অধ্যাপক সুভাষ বন্দ্যোপাধ্যায়

(৩৫) শ্রী তিমির বরণ চক্রবর্তী : বিভূতিভূষণ ও আম আঁটির ভেঁপু পৃঃ ৮

(৩৬) বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়: পথের পাঁচালী , নবম মুদ্রণ , পৃঃ ৮৪ , পেপার ব্যাক সংস্করণ

(৩৭) বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়: অপরাজিত , পৃঃ ১০ , পঞ্চদশ মুদ্রণ

(৩৮) বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়: অপরাজিত , পঞ্চদশ মুদ্রণ , ফাল্গুন , ১৪০১ , পৃঃ ২৯৬

(৩৯) বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়: অপরাজিত , পঞ্চদশ মুদ্রণ , ফাল্গুন , ১৪০১ , পৃঃ ২৯৬ - ৯৭

(৪০) বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় : বিভূতি রচনাবলী , আরণ্যক , পঞ্চমখণ্ড , পৃঃ ৭২ প্রথম প্রকাশ ২রা ফাল্গুন , ১৩৩৭

(৪১) বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় : পথের পাঁচালী , নবম মুদ্রণ পৃঃ ১৪০ , পেপার ব্যাক সংস্করণ

(৪২) বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় : পথের পাঁচালী , নবম মুদ্রণ পৃঃ ১৪৩ , পেপার ব্যাক সংস্করণ

(৪৩) চিত্তরঞ্জণ ঘোষ : বিভূতিভূষণ , প্রথম প্রকাশ , ২৮ ভাদ্র ১৩৬৬ , পৃঃ ৯

(৪৪) বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় : পথের পাঁচালী , নবম মুদ্রণ পৃঃ ১৬৩ , পেপার ব্যাক সংস্করণ

(৪৫) প্রমথ নাথ বিশী : বিভূতি রচনাবলী , প্রথমখণ্ড ভূমিকাংশ। পেপার ব্যাক সংস্করণ

(৪৬) বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় : পথের পাঁচালী , নবম মুদ্রণ পৃঃ ১৭৫ , পেপার ব্যাক সংস্করণ

(৪৭) William Wordsworth: Prelude

(৪৮) বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় : তৃণাঙ্কুর , চতুর্থ মুদ্রণ , পৃঃ ২৬

(৪৯) Hudson : Hampshire day.

(৫০) সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় : দেশ পত্রিকা - ৪ ভাদ্র , ১৪০৬ , ২১শে আগষ্ঠ ৯৯ তারাশঙ্কর এবং তাঁর দেশদর্শন

(৫১) পার্থজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় সম্পাদিত : বিভূতিভূষণ : বিচার ও বিশ্লেষণ সময়ের -

চেতনা সময়ের
শিল্পরূপ : বিভূতিভূষণ,
গোপিকা নাথ রায়
চৌধুরী , পৃঃ ২০৯

(৫২) বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় : পথের পাঁচালী ,
ভূমিকাংশ জিতেন্দ্রনাথ
চক্রবর্তী, পৃঃ ৭
পেপার ব্যাক সংস্করণ

(৫৩) গোপিকানাথ রায় : বিভূতিভূষণ : মন ও
শিল্প পৃঃ ৮৮ ,
পরিমার্জিত ও
পরিবর্ধিত , তৃতীয়
সংস্করণ , বৈশাখ
১৪০৩ , এপ্রিল ১৯৯৬

(৫৪) বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় : পথের পাঁচালী , নবম
মুদ্রণ , পৃঃ ২০ , পৌষ
১৩৯৫ , পেপার ব্যাক
সংস্করণ

(৫৫) বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় : স্মৃতির রেখা ,
৬ - ১২ - ১৯২৭

(৫৬) সম্পাদনা বারিদ বরণ ঘোষ: বিভূতি স্মৃতি, অনাসক্ত
বিভূতিভূষণ, গজেন্দ্র
কুমার মিত্র , পৃঃ [redacted] ৩৫

(৫৭) বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় : উৎকর্ণ , দ্বিতীয় মুদ্রণ ,
পৃঃ ৯০

(৫৮) বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় : স্মৃতির রেখা , ৬ই
ফেব্রুয়ারী , ভাগলপুর বিভূতি রচনাবলী, প্রথম খণ্ড, প্রথম প্রকাশ ২৮ শে ভাদ্র ১৩৭৭, দ্বিতীয় মুদ্রণ অগ্রহায়ণ ১৩৭৮ পৃঃ ৩৭৩

(৫৯) বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় : পথের পাঁচালী , নবম
মুদ্রণ , পৃঃ ৩৮ ,
পেপার ব্যাক সংস্করণ

(৬০) বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় : পথের পাঁচালী , নবম
মুদ্রণ , পৃঃ ২১৫
পেপার ব্যাক সংস্করণ

(৬১) বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় : অপরাজিত , পঞ্চদশ
মুদ্রণ , পৃঃ ২৯৬

(৬২) বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় : স্মৃতির রেখা - বিভূতি
রচনাবলী , পৃঃ ৩৫৭ ,
প্রথম খণ্ড প্রথম প্রকাশ ২৮ শে ভাদ্র ১৩৭৭
দ্বিতীয় মুদ্রণ - ১৩৭৮ অগ্রহায়ণ

প্রথমখণ্ড, দ্বিতীয় মুদ্রণ,
অগ্রহায়ণ ১৩৭৮

(৬৩) বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়: স্মৃতির রেখা , বিভূতি রচনাবলী , পৃঃ ৩৫৭ , প্রথমখণ্ড, দ্বিতীয় মুদ্রণ, অগ্রহায়ণ ১৩৭৮

(৬৪) বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় : পথের পাঁচালী , নবম মুদ্রণ , পৃঃ ৪৭ , পেপার ব্যাক সংস্করণ

(৬৫) বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়: পথের পাঁচালী , নবম মুদ্রণ , পৃঃ ৪৭ , পেপার ব্যাক সংস্করণ

(৬৬) বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় : পথের পাঁচালী , নবম মুদ্রণ , পৃঃ ৪২ , পেপার ব্যাক সংস্করণ

(৬৭) বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়: পথের পাঁচালী , নবম মুদ্রণ , পৃঃ ২১৫ , পেপার ব্যাক সংস্করণ

(৬৮) বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়: অপরাজিত , পঞ্চদশ
মুদ্রণ , পৃঃ ২৯৮ ,
ফাল্গুন ১৪০১

(৬৯) বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়: অপরাজিত , পঞ্চদশ
মুদ্রণ , পৃঃ ২৯৬

(৭০) বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়: অপরাজিত , পঞ্চদশ
মুদ্রণ , পৃঃ ২১০

(৭১) বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় : অপরাজিত , পঞ্চদশ
মুদ্রণ , পৃঃ ২৯৯

(৭২) বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় : স্মৃতির রেখা, বিভূতি রচনাবলী
প্রথম খণ্ড, প্রথম প্রকাশ ২৮শে ভাদ্র ১৩৭৭
দ্বিতীয় মুদ্রণ, অগ্রহায়ণ ১৩৭৮
হেমন্ত

(৭৩) বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়: স্মৃতির রেখা , পৃঃ ৯২

(৭৪) বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় : ইছামতী , পৃঃ ৩০৭

(৭৫) বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়: পথের পাঁচালী , নবম
মুদ্রণ , পৃঃ ২৯ ,
পেপার ব্যাক সংস্করণ

(৭৬) চিত্তরঞ্জণ ঘোষ : বিভূতিভূষণ , পৃঃ ৬৮
প্রথম প্রকাশ
১২ই সেপ্টেম্বর ১৯৫৯

(৭৭) সুনীল কুমার চট্টোপাধ্যায় : বিভূতিভূষণ : দেশে
বিদেশে,পথের পাঁচালী,
মোহিতলাল মজুমদার, পৃ: ৫৮
(৭৮) চিত্তরঞ্জণ ঘোষ : বিভূতিভূষণ , পৃঃ ৬৮
(৭৯) বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় : পথের পাঁচালী ,
পেপার ব্যাক সংস্করণ ,
নবম মুদ্রণ পৃঃ ৭৯
(৮০) বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় : পথের পাঁচালী ,
নবম মুদ্রণ পৃঃ ৮৭
পেপার ব্যাক সংস্করণ
(৮১) বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় : পথের পাঁচালী ,
নবম মুদ্রণ পৃঃ ৪২
পেপার ব্যাক সংস্করণ
(৮২) বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় : পথের পাঁচালী ,
নবম মুদ্রণ পৃঃ ৪৮
পেপার ব্যাক সংস্করণ
(৮৩) বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়: অপরাজিত , পঞ্চদশ
মুদ্রণ ফাল্গুন ১৪০১, পৃ: ২৯১
(৮৪) রমেন্দ্রনাথ মল্লিক : বিভূতি সাহিত্য

পরিক্রমা পৃঃ ২২
প্রথম প্রকাশ

(৮৫) বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় : পথের পাঁচালী ,
নবম মুদ্রণ পৃঃ ৪৮
পেপার ব্যাক সংস্করণ

(৮৬) কালিদাস রায় , সম্পাদিত : বিভূতি বীথিকা ,
ভূমিকাংশ

(৮৭) বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়: স্মৃতির রেখা বিভূতি রচনাবলী, প্রথম খণ্ড, প্রথম প্রকাশ ২৮শে ভাদ্র ১৩৭৭, দ্বিতীয় মুদ্রণ অগ্রহায়ণ ১৩৭৮ পৃঃ ৪০৬

(৮৮) সুনীল কুমার চট্টোপাধ্যায় : বিভূতিভূষণ : দেশে
বিদেশে পথের পাঁচালী,
দিলীপ কুমার রায়
পৃঃ ৫৩ প্রথম প্রকাশ ,
জানুয়ারী ১৯৯১

(৮৯) তারক নাথ ঘোষ : জীবনের পাঁচালীকার
বিভূতিভূষণ ,
পৃঃ ১২৬-২৭ , প্রথম
প্রকাশ , চৈত্র ১৩৭৬

(৯০) কালিদাস রায় সম্পাদিত : বিভূতি বীথিকা
পৃঃ ২২৬

(৯১) চণ্ডীদাস চট্টোপাধ্যায় : মিলনী , বার্ষিক সংখ্যা, ১৯৮৭

(৯২) দ্বিজেন্দ্রনাথ রায় : সাহিত্য ও শিল্পলোক , পৃঃ ১৩১ প্রথম প্রকাশ, শ্রাবণ ১৩৩৮

(৯৩) চিত্তরঞ্জন ঘোষ : বিভূতিভূষণ পৃঃ ৩৭ দ্বিতীয় পরিবর্ধিত সংস্করণ , ১০ জুলাই ১৯৭২

(৯৪) বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় : পথের পাঁচালী , নবম মুদ্রণ পৃঃ ১৭১ পেপার ব্যাক সংস্করণ

(৯৫) বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় : পথের পাঁচালী , নবম মুদ্রণ পৃঃ ১৭১ পেপার ব্যাক সংস্করণ

(৯৬) বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় : পথের পাঁচালী , নবম মুদ্রণ পৃঃ ২১২ পেপার ব্যাক সংস্করণ

(৯৭) বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় : পথের পাঁচালী , নবম
মুদ্রণ পৃঃ ২১৩
পেপার ব্যাক সংস্করণ

(৯৮) বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় : পথের পাঁচালী , নবম
মুদ্রণ পৃঃ ২১৪
পেপার ব্যাক সংস্করণ

(৯৯) বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় : বিভূতি রচনাবলী ,
প্রথম খণ্ড , ভূমিকাংশ,
প্রমথ নাথ বিশী

(১০০) বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়: পথের পাঁচালী ,
পৃঃ ২১৫ নবম মুদ্রণ

(১০১) বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়: অপরাজিত , পঞ্চদশ
মুদ্রণ , ফাল্গুন ১৪০১
পৃঃ ২৭৮

(১০২) বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়: হে অরণ্য কথা কও

(১০৩) সুতপা ভট্টাচার্য : কথা সাহিত্যের একলা
পথিক প্রথম প্রকাশ ,
জানুয়ারী ১৯৫৫,পৃঃ১০

(১০৪) বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়: পথের পাঁচালী , নবম মুদ্রণ পৃঃ ১৪৫ পেপার ব্যাক সংস্করণ

(১০৫) বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়: অপরাজিত , পঞ্চদশ মুদ্রণ ফাল্গুন ১৪০১ পৃঃ ১১২

(১০৬) তিমির বরণ চক্রবর্তী : বিভূতিভূষণ ও আম আঁটির ভেঁপু , প্রথম প্রকাশ , ১৯৮৩ পৃঃ ২৩ - ২৪

(১০৭) যমুনা বন্দ্যোপাধ্যায় : উপলব্যথিত গতি , প্রথম মুদ্রণ , ডিসেম্বর ১৯৭১ , পৃঃ ৭৩

(১০৮) বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়: স্মৃতির রেখা

(১০৯) বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়: দৃষ্টি প্রদীপ, ১৪ সংখ্যক পরিচ্ছেদ

(১১০) বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়: আরণ্যক , প্রস্তাবনা পেপার ব্যাক সংস্করণ ,

প্রথম প্রকাশ , জৈষ্ঠ
১৩৮৩

(১১১) বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়: আরণ্যক , ছাত্রপাঠ্য ,
পেপার ব্যাক সংস্করণ ,
প্রথম প্রকাশ , জৈষ্ঠ
১৩৮৩ , পৃঃ ২৪০

(১১২) গোপিকানাথ রায় : বিভূতিভূষণ : মন ও
শিল্প , পরিমার্জিত ও
পরিবর্ধিত , তৃতীয়
সংস্করন , ১৯৯৬ পৃঃ ৮৫

(১১৩) বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়: স্মৃতির রেখা

(১১৪) তিমির বরণ চক্রবর্তী : বিভূতিভূষণ ও আম
আঁটির ভেঁপু , প্রথম
প্রকাশ , ১১ই জুলাই
১৯৮৩ পৃঃ ১৬

(১১৫) বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়: স্মৃতির রেখা, বিভূতিরচনাবলী, প্রথম খণ্ড, প্রথম প্রকাশ ২৮ শে ভাদ্র ১৩৭৭, দ্বিতীয় মুদ্রণ সত্যনারায়ণ ১৩৭৮ পৃঃ ৪৩৬

(১১৬) বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়: স্মৃতির রেখা, বিভূতিরচনাবলী, প্রথম খণ্ড, প্রথম প্রকাশ ২৮ শে ভাদ্র, ১৩৭৭, দ্বিতীয় মুদ্রণ সত্যনারায়ণ ১৩৭৮ পৃঃ ৪৩৬

(১১৭) বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়: পথের পাঁচালী , নবম মুদ্রণ পৃঃ ২৮ পেপার ব্যাক সংস্করণ

(১১৮) বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়: পথের পাঁচালী , নবম মুদ্রণ পৃঃ ১৭৫ পেপার ব্যাক সংস্করণ

(১১৯) বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়: পথের পাঁচালী , নবম মুদ্রণ পৃঃ ৭৯

(১২০) বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়: পথের পাঁচালী , নবম মুদ্রণ পৃঃ ৮০

(১২১) পার্থজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় সম্পাদিত : বিভূতিভূষণ : বিচার ও বিশ্লেষণ , বিভূতিভূষণ , দুটো একটা কথা , কৃষ্ণরূপ চক্রবর্তী, প্রকাশ কাল , জানুয়ারী ১৯৯২,পৃঃ৬৫

(১২২) রুশতী সেন : বিভূতিভূষণ : দ্বন্দ্বের বিন্যাস , প্রকাশ সেপ্টেম্বর, ৯৩, পৃঃ১৩

(১২৩) বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়: পথের পাঁচালী , নবম
মুদ্রণ পৃঃ ৬২
পেপার ব্যাক সংস্করণ

(১২৪) বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়: পথের পাঁচালী , নবম
মুদ্রণ পৃঃ ৬২
পেপার ব্যাক সংস্করণ

(১২৫) বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়: পথের পাঁচালী , নবম
মুদ্রণ পৃঃ ৬১
পেপার ব্যাক সংস্করণ

(১২৬) বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়: পথের পাঁচালী , নবম
মুদ্রণ পৃঃ ৬৭
পেপার ব্যাক সংস্করণ

(১২৭) বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়: পথের পাঁচালী , নবম
মুদ্রণ পৃঃ ১৪৮
পেপার ব্যাক সংস্করণ

(১২৮) বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়: পথের পাঁচালী , নবম
মুদ্রণ পৃঃ ২১১
পেপার ব্যাক সংস্করণ

(১২৯) বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়: অপরাজিত, পঞ্চদশ
মুদ্রণ পৃঃ ৪১
পেপার ব্যাক সংস্করণ

(১৩০) বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়: অপরাজিত , পঞ্চদশ
মুদ্রণ পৃঃ ৪৩

(১৩১) বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়: অপরাজিত , পঞ্চদশ
মুদ্রণ পৃঃ ৯৯

(১৩২) বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়: পথের পাঁচালী , নবম
মুদ্রণ পৃঃ ২১
পেপার ব্যাক সংস্করণ

(১৩৩) বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়: পথের পাঁচালী , নবম
মুদ্রণ পৃঃ ১৯
পেপার ব্যাক সংস্করণ

(১৩৪) বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়: পথের পাঁচালী , নবম
মুদ্রণ পৃঃ ১২
পেপার ব্যাক সংস্করণ

(১৩৫) বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়: পথের পাঁচালী , নবম
মুদ্রণ পৃঃ ৪০
পেপার ব্যাক সংস্করণ

(১৩৬) বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়: পথের পাঁচালী , নবম
মুদ্রণ পৃঃ ২১৫
পেপার ব্যাক সংস্করণ

(১৩৭) বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়: পথের পাঁচালী , নবম
মুদ্রণ পৃঃ ৪৮
পেপার ব্যাক সংস্করণ

(১৩৮) বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়: পথের পাঁচালী , নবম
মুদ্রণ পৃঃ ২১
পেপার ব্যাক সংস্করণ

(১৩৯) বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়: অপরাজিত , পঞ্চদশ
মুদ্রণ পৃঃ ৯৯

(১৪০) বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়: পথের পাঁচালী , নবম
মুদ্রণ পৃঃ ৬২
পেপার ব্যাক সংস্করণ

(১৪১) বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়: পথের পাঁচালী , নবম
মুদ্রণ পৃঃ ৪৫
পেপার ব্যাক সংস্করণ

(১৪২) বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়: পথের পাঁচালী , নবম
মুদ্রণ পৃঃ ৪৮
পেপার ব্যাক সংস্করণ

(১৪৩) বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়: পথের পাঁচালী , নবম
মুদ্রণ পৃঃ ১৪৫
পেপার ব্যাক সংস্করণ

(১৪৪) বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়: পথের পাঁচালী , নবম
মুদ্রণ পৃঃ ৩৫
পেপার ব্যাক সংস্করণ

(১৪৫) বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়: পথের পাঁচালী , নবম
মুদ্রণ পৃঃ ৩৬
পেপার ব্যাক সংস্করণ

(১৪৬) বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়: পথের পাঁচালী , নবম
মুদ্রণ পৃঃ ১০১
পেপার ব্যাক সংস্করণ

(১৪৭) বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়: পথের পাঁচালী , নবম
মুদ্রণ পৃঃ ৮০
পেপার ব্যাক সংস্করণ

(১৪৮) বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়: পথের পাঁচালী , নবম
মুদ্রণ পৃঃ ৪৪
পেপার ব্যাক সংস্করণ

(১৪৯) বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়: পথের পাঁচালী , নবম
মুদ্রণ পৃঃ ২১৫
পেপার ব্যাক সংস্করণ

(১৫০) বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়: অপরাজিত , পঞ্চদশ
মুদ্রণ পৃঃ ৯৯

(১৫১) বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়: পথের পাঁচালী , নবম
মুদ্রণ পৃঃ ৫৫
পেপার ব্যাক সংস্করণ

(১৫২) বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়: পথের পাঁচালী , নবম
মুদ্রণ পৃঃ ৫৭
পেপার ব্যাক সংস্করণ

(১৫৩) বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়: পথের পাঁচালী , নবম
মুদ্রণ পৃঃ ১৪৮
পেপার ব্যাক সংস্করণ

(১৫৪) বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়: পথের পাঁচালী , নবম
মুদ্রণ পৃঃ ২৬
পেপার ব্যাক সংস্করণ

(১৫৫) বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়: পথের পাঁচালী , নবম
মুদ্রণ পৃঃ ৫৪
পেপার ব্যাক সংস্করণ

(১৫৬) বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়: পথের পাঁচালী , নবম
মুদ্রণ পৃঃ ৫৫
পেপার ব্যাক সংস্করণ

(১৫৭) বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়: পথের পাঁচালী , নবম
মুদ্রণ পৃঃ ৫৬
পেপার ব্যাক সংস্করণ

(১৫৮) বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়: পথের পাঁচালী , নবম
মুদ্রণ পৃঃ ৫৭
পেপার ব্যাক সংস্করণ

(১৫৯) বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়: পথের পাঁচালী , নবম
মুদ্রণ পৃঃ ৮৭
পেপার ব্যাক সংস্করণ

(১৬০) বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়: পথের পাঁচালী , নবম
মুদ্রণ পৃঃ ৯৩
পেপার ব্যাক সংস্করণ

(১৬১) বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়: পথের পাঁচালী , নবম
মুদ্রণ পৃঃ ১৭০
পেপার ব্যাক সংস্করণ

(১৬২) বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়: পথের পাঁচালী , নবম
মুদ্রণ পৃঃ ১৭০
পেপার ব্যাক সংস্করণ

(১৬৩) বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়: পথের পাঁচালী , নবম
মুদ্রণ পৃঃ ১৭৫
পেপার ব্যাক সংস্করণ

(১৬৪) বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়: পথের পাঁচালী , নবম
মুদ্রণ পৃঃ ১৭৫-৭৬
পেপার ব্যাক সংস্করণ

(১৬৫) বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়: পথের পাঁচালী , নবম
মুদ্রণ পৃঃ ১০৪
পেপার ব্যাক সংস্করণ

(১৬৬) বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়: তৃণাঙ্কুর , তৃতীয় সংস্করণ পৃঃ ১১৯

(১৬৭) বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়: আরণ্যক , ছাত্রপাঠ্য , পেপার ব্যাক সংস্করণ , প্রথম প্রকাশ , জৈষ্ঠ ১৩৮৩ , পৃঃ ১৯৮

(১৬৮) হংসনারায়ন ভট্টাচার্য : হিন্দুদের দেবদেবী , দ্বিতীয় সংস্করন , পুনর্মুদ্রন, ১৯৯২ পৃঃ ৪৮

(১৬৯) Prof wintermit : History of Indian Literahare Vol I , Part I page 65

(১৭০) শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়: বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা অষ্টম পুনর্মুদ্রন , সংস্করন১৯৮৮ পৃঃ৬০৪

(১৭১) বিশ্বনাথ পাল : বিভূতিভূষণ : রূপে অরূপে প্রথম প্রকাশ , ১৪ই সেপ্টেম্বর ১৯৯৩ , পৃঃ ৯২

(১৭২) বিশ্বনাথ পাল : বিভূতিভূষণ : রূপে অরূপে প্রথম প্রকাশ , ১৪ই সেপ্টেম্বর ১৯৯৩ , পৃঃ ৯৪

(১৭৩) বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়: অপরাজিত , পঞ্চদশ মুদ্রণ পৃঃ ২৯৬ , ফাল্গুন ১৪০১

(১৭৪) বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়: অপরাজিত , পঞ্চদশ মুদ্রণ ফাল্গুন ১৪০১ পৃঃ ২৯৬-৯৭

(১৭৫) শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় : বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা অষ্টম পুনর্মুদ্রন , সংস্করন১৯৮৮ পৃঃ৬১৯

(১৭৬) বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়: অপরাজিত , পঞ্চদশ মুদ্রণ ফাল্গুন ১৪০১ পৃঃ ২৯৭-৯৮

(১৭৭) বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়: অপরাজিত , পঞ্চদশ মুদ্রণ ফাল্গুন ১৪০১ প্রচ্ছেদপটের শেষঅংশ

(১৭৮) বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়: পথের পাঁচালী ,
পেপার ব্যাক সংস্করণ
নবম মুদ্রণ পৃঃ ৩৯
(১৭৯) বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়: পথের পাঁচালী ,
পেপার ব্যাক সংস্করণ
নবম মুদ্রণ পৃঃ ২০
(১৮০) বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়: পথের পাঁচালী ,
পেপার ব্যাক সংস্করণ
নবম মুদ্রণ পৃঃ ৩৭
(১৮১) সুভাষ বন্দ্যোপাধ্যায়: বাংলা উপন্যাসের
লৌকিক উপাদান ,
প্রথম প্রকাশ পৃঃ১২২
(১৮২) বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়: পথের পাঁচালী ,
পেপার ব্যাক সংস্করণ
নবম মুদ্রণ পৃঃ ২২
(১৮৩) বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়: পথের পাঁচালী ,
পেপার ব্যাক সংস্করণ
নবম মুদ্রণ পৃঃ ৬২

(১৮৪) বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়: পথের পাঁচালী ,
পেপার ব্যাক সংস্করণ
নবম মুদ্রণ পৃঃ ৬৬
(১৮৫) বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়: পথের পাঁচালী ,
পেপার ব্যাক সংস্করণ
নবম মুদ্রণ পৃঃ ১২৮
(১৮৬) বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়: পথের পাঁচালী ,
পেপার ব্যাক সংস্করণ
নবম মুদ্রণ পৃঃ ৫৮
(১৮৭) কাঞ্চন বসু সম্পাদিত : বিষবৃক্ষ : বঙ্কিম
উপন্যাস সমগ্র রিফ্লেক্ট
পাবলিকেশন , প্রথম
প্রকাশ , ৫ জুলাই
১৯৯৩ , পৃঃ ১৮৫
(১৮৮) বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়: পথের পাঁচালী ,
নবম মুদ্রণ পৃঃ ৪৪
পেপার ব্যাক সংস্করণ

(১৮৯) বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়: পথের পাঁচালী ,
নবম মুদ্রণ পৃঃ ৭০
পেপার ব্যাক সংস্করণ
(১৯০) বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়: পথের পাঁচালী ,
নবম মুদ্রণ পৃঃ ৪০
পেপার ব্যাক সংস্করণ
(১৯১) বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়: পথের পাঁচালী ,
নবম মুদ্রণ পৃঃ ১১৯
পেপার ব্যাক সংস্করণ
(১৯২) বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়: অপরাজিত , পঞ্চদশ
মুদ্রণ ফাল্গুন ১৪০১
পৃঃ ২৪৯
(১৯৩) বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়: দৃষ্টিপ্রদীপ , বিভূতি
রচনাবলী , ভূমিকাংশ,
ডঃ সুকুমার সেন
৬ষ্ঠ খণ্ড
(১৯৪) বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়: দৃষ্টিপ্রদীপ , পৃঃ ১৩০

(১৯৫) বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়: অপরাজিত , পঞ্চদশ মুদ্রণ ফাল্গুন ১৪০১ পৃঃ ১৫২

(১৯৬) বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়: অপরাজিত , পঞ্চদশ মুদ্রণ ফাল্গুন ১৪০১ পৃঃ ১৫২

(১৯৭) বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়: দৃষ্টিপ্রদীপ , বিভূতি রচনাবলী পৃঃ ১৪২

(১৯৮) বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়: অপরাজিত , পঞ্চদশ মুদ্রণ ফাল্গুন ১৪০১ পৃঃ ১৫২

(১৯৯) বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়: দৃষ্টিপ্রদীপ , বিভূতি রচনাবলী প্রথম প্রকাশ, ১৫ই ফাল্গুন ১৩৩৭ , পৃঃ ১২৮

(২০০) বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়: দৃষ্টিপ্রদীপ , বিভূতি রচনাবলী প্রথম প্রকাশ, ১৫ই ফাল্গুন ১৩৩৭ , পৃঃ ১৪৪

(২১১) সুনীল কুমার চট্টোপাধ্যায় : বিভূতিভূষণ : জীবন ও সাহিত্য প্রথম প্রকাশ , সেপ্টেম্বর ১৯৯৫ , পৃঃ ৫১

(২১২) বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়: অপরাজিত , পঞ্চদশ মুদ্রণ ফাল্গুন ১৪০১ পৃঃ ২৯৬

(২১৩) বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়: অপরাজিত , পঞ্চদশ মুদ্রণ ফাল্গুন ১৪০১ পৃঃ ২৯৭

(২১৪) তিমির বরণ চক্রবর্তী : বিভূতিভূষণ ও আম আঁটির ভেঁপু , প্রথম প্রকাশ , ১২ই জুলাই ১৯৮৩

(১৯৫) বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়: অপরাজিত , পঞ্চদশ মুদ্রণ ফাল্গুন ১৪০১ পৃঃ ১৫২

(১৯৬) বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়: অপরাজিত , পঞ্চদশ মুদ্রণ ফাল্গুন ১৪০১ পৃঃ ১৫২

(১৯৭) বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়: দৃষ্টিপ্রদীপ , বিভূতি রচনাবলী পৃঃ ১৪২

(১৯৮) বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়: অপরাজিত , পঞ্চদশ মুদ্রণ ফাল্গুন ১৪০১ পৃঃ ১৫২

(১৯৯) বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়: দৃষ্টিপ্রদীপ , বিভূতি রচনাবলী প্রথম প্রকাশ, ১৫ই ফাল্গুন ১৩৩৭ , পৃঃ ১২৮

(২০০) বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়: দৃষ্টিপ্রদীপ , বিভূতি রচনাবলী প্রথম প্রকাশ, ১৫ই ফাল্গুন ১৩৩৭ , পৃঃ ১৪৪

(২০১) বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়: অপরাজিত , পঞ্চদশ
সংস্করন পৃঃ ১৭৮

(২০২) বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়: দৃষ্টিপ্রদীপ , বিভূতি
রচনাবলী প্রথম প্রকাশ,
১৫ই ফাল্গুন ১৩৩৭ ,
পৃঃ ১৫৪

(২০৩) বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়: দৃষ্টিপ্রদীপ , বিভূতি
রচনাবলী প্রথম প্রকাশ,
১৫ই ফাল্গুন ১৩৩৭

(২০৪) বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়: অপরাজিত , পঞ্চদশ
মুদ্রণ ফাল্গুন ১৪০১
পৃঃ ১৭৯

(২০৫) বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়: অপরাজিত , পঞ্চদশ
মুদ্রণ ফাল্গুন ১৪০১
পৃঃ ৬

(২০৬) শ্রী তিমির বরণ চক্রবর্তী : মালদহ মহিলা
মহাবিদ্যালয় পত্রিকা ,
রজত জয়ন্তী বর্ষ ,
'বিভূতিভূষণের একটি চরিত্রের সাহিত্য অপরেখা' পৃঃ ১৫

স্মারকসংখ্যা - ১৯৯৫,
পরিক্রমন পৃঃ ১৫

(২০৭) সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় : বাংলা উপন্যাসের
কালান্তর পরিবর্ধিত
প্রথম দেজ সংস্করন ,
জুন ১৯৮০

(২০৮) সুনীল কুমার চট্টপাধ্যায় : প্রসঙ্গ ও প্রসঙ্গত
বিভূতিভূষণ প্রথম
প্রকাশ , আষাঢ় ১৩১৮
পৃঃ ১

(২০৯) সুনীল কুমার চট্টপাধ্যায় : প্রসঙ্গ ও প্রসঙ্গত
বিভূতিভূষণ প্রথম
প্রকাশ , আষাঢ় ১৩১৮
পৃঃ ২

(২১০) বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়: পথের পাঁচালী ,
(মূলগ্রন্থ) পেপার ব্যাক
সংস্করণ , ভূমিকাংশ
জিতেন্দ্র নাথ চক্রবর্তী
পৃঃ ১৪

(২১১) সুনীল কুমার চট্টোপাধ্যায় : বিভূতিভূষণ : জীবন ও সাহিত্য প্রথম প্রকাশ , সেপ্টেম্বর ১৯৯৫ , পৃঃ ৫১

(২১২) বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়: অপরাজিত , পঞ্চদশ মুদ্রণ ফাল্গুন ১৪০১ পৃঃ ২৯৬

(২১৩) বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়: অপরাজিত , পঞ্চদশ মুদ্রণ ফাল্গুন ১৪০১ পৃঃ ২৯৭

(২১৪) তিমির বরণ চক্রবর্তী : বিভূতিভূষণ ও আম আঁটির ভেঁপু , প্রথম প্রকাশ , ১২ই জুলাই ১৯৮৩